হাজার রাজা ও রাষ্ট্রনায়ক



সুদীপ সেন

হাজার রাজা ও রাষ্ট্রনায়ক

সুদীপ সেন

মালা পাবলিকেশন্স
৫১, কালিনাথ মুন্সী লেন
কলিকাতা-৭০০০৩৬

Hazar Raja-O-Rastranayak
by Sudip Sen
An Encyclopaedia of Kings and Statesmen of the World
Price : Rs, 50·00 only

প্রকাশক :
আশিস্‌কুমার বর্দ্ধন
৫১, কালিনাথ মুন্সী লেন
কলিকাতা-৭০০০৩৬

প্রথম সংস্করণ :
ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া, ১৩৯৩
নভেম্বর, ১৯৮৬

ব্যবস্থাপনায় : সমর দে

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মুদ্রাকর :
পরেশনাথ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান

মালা পাবলিকেশন্‌স্
৪, নিমাই বোস লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

আই. পি. পি. কোং (প্রাঃ) লিঃ
৫৭/সি কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০৭৩

ভূমিকা

আমাদের ছেলেবেলায় অর্থাৎ আজ থেকে ৬০।৬৫ বছর আগে স্কুলের পাঠ্য বই ছাড়া অন্য কোন বই—অবশ্য রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, রূপকথা ছাড়া—তেমন জুটতো না। পরের যুগে পড়ুয়াদের উপযোগী বই যা লেখা হতো সেগুলো বেশীর ভাগই জীবন-চরিত। ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স এ বিষয়ে সব চাইতে বেশী উদ্যোগী ছিলেন। দু-আনা তিন-আনা থেকে শুরু করে আট-আনা ষোল-আনা দামের প্রচুর বই ছাপাতেন তারা। প্রথম যুদ্ধের পর থেকে আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্র যতো দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করছিল, কুতূহল যতো মাত্রায় বেড়ে চলছিল, তার সঙ্গে স্কুলের আওতার বাইরে বই-এর সংখ্যা এবং রকমারী তেমন বাড়েনি। কিন্তু আজ এ বিষয়ে প্রকাশকদের সচেতনতা অনেক বেড়েছে। এতোদিন 'রেফারেন্স' বই বলতে আমরা বুঝতাম বেশীর ভাগ ইংরেজী বই। অবশ্য সে সব বই-এর নাগাল সকলে পেতো না। পেলেও তা বুঝতে অসুবিধে হতো। আজকাল বাংলা ভাষায় ছোটদের রেফারেন্স-বই এর দৈন্য ঘুচেছে।

আলোচ্য বইটিতে রয়েছে বহুশত জন-নায়কের জীবনী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে যারা শাসক হিসেবে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করতেন—কেউ ছিলেন রাজা, কেউ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, কেউ ডিক্টেটার, কেউ রাজ-প্রতিনিধি—এদের কীর্তি বা অকীর্তির কাহিনী নিয়ে লেখা বইটি। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্রনায়কদের জীবন কাহিনী মোটামুটি ভাবে জানতে গেলে ইংরেজী এনসাইক্লোপেডিয়া খুঁজে বেড়ানো ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের কাছে এনসাইক্লোপেডিয়া ধরনের বই সহজলভ্য নয়। তাছাড়া ভাষার সমস্যাও রয়েছে। এই সব অসুবিধা দূর করার প্রতি লক্ষ্য রেখেই মালা পাবলিকেশন্স্ আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত করেছেন। একটি মাত্র বই-এ বহু বই-এর পরিবেশিত তথ্য সংগ্রহ করে তারা যেমন শিক্ষার্থীদের শ্রম লাঘব করেছেন, তেমনি এক জায়গায় প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য জানার সুযোগ করে দিয়েছেন। প্রকাশক সংস্থার এই উদ্যোগের প্রতি আমি জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। দুটি একটি জায়গায় অনবধানতার জন্য ভুলত্রুটি যদি থেকেও যায় তাহলে পরবর্তী সংস্করণে তার প্রতিকার করা হবে। শুধু ছোটরাই নয়, বড়োরাও এই বইটির সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে অনেকখানি মাত্রায় উপকৃত হবেন—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত আশ্বাস পোষণ করি।

নিশীথরঞ্জন রায়

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রাচীন ভারত, মিশর, চীন, কম্বোজ, কার্থেজ, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম, পারস্য প্রভৃতি দেশের রাজা ও শাসক থেকে শুরু ক'রে আধুনিক কালের বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইয়ে। এককথায় এটিকে 'Encyclopaedia of kings and Statesmen of the World' বলে অভিহিত করা চলে। বাংলায় ঠিক এ ধরনের কোনো বই আমার চোখে পড়েনি। অথচ হাতের কাছে এমন একটা বই থাকার আবশ্যকতা আমার মত অনেক পাঠকই অনুভব করে থাকেন। বইখানি একদিকে যেমন পাঠকের বিশ্বইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানান্বেষণে সাহায্য করবে, তেমনি আবার বিভিন্ন ধরনের পাঠকের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রশ্নের উত্তর লেখার ক্ষেত্রে এই বই থেকে বিশেষ সহায়তা লাভ করতে পারে কারণ বিখ্যাত ও স্মরণীয় শাসকদের অনেকের সম্পর্কেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অধিকন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক এবং সমাজের বিদগ্ধ পাঠকের কাছে ইতিহাসের একটি আকর গ্রন্থের প্রয়োজন মেটানো আমার এই প্রয়াসের লক্ষ্য।

হাজার রাজার কাহিনী লেখার সমস্যা কম নয়। রাজা বাছাইয়ের প্রশ্ন ছাড়াও আছে তথ্য সংগ্রহ ক'রে লেখার বিষয়টি। সুপ্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত যে সব দেশের ইতিহাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত সেইসব দেশের রাজরাজড়া ছাড়াও এমন বেশ কিছু রাজার কথা এতে স্থান পেয়েছে যাঁদের কথা কখনো আমাদের ইতিহাস বইয়ে পড়তে হয়নি। তবে বিশ্বের সেই সব দেশের রাজারাই এই বইটিতে প্রাধান্য পেয়েছেন যে সব দেশের ইতিহাসের সাথে আমরা কমবেশি পরিচিত। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইতিহাসের সাথে আমাদের পরিচিতি অধিক। তাই এই দুই দেশের রাজা ও রাষ্ট্রপ্রধানরা বইটিতে বেশি জায়গা জুড়ে রয়েছেন।

এই বইয়ে রাজার সংখ্যাই বেশি, রাষ্ট্রনায়ক কম। পরবর্তী বইয়ে স্বাভাবিকভাবেই রাজার সংখ্যা কমে আসবে—আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানরাই প্রাধান্য পাবেন। এই বইয়ে লিঙ্কন, লেনিন, স্ট্যালিন, রুজভেল্ট, চার্চিল, হিটলার, মুসোলিনি, ফ্রাঙ্কো, গ্ল্যাডস্টোন, ডিজরেলী, চিয়াং কাই শেক প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়করা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। পরবর্তী বইয়ে নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধী, হো চি মিন, ক্রুশ্চেভ, নাসের, টিটো, মাও-সে-তুঙ, দেং সিয়াও পিং, কেনেডি, নিক্সন, ব্রেজনেভ প্রভৃতি খ্যাতনামা ও

অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতনামা রাষ্ট্রপ্রধানদের পরিচয় তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে। সবই অবশ্য নির্ভর করবে পাঠকদের চাহিদার উপর।

ইংলণ্ড, আমেরিকা থেকে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের বিশ্বকোষ, অশোক, আকবর, নেপোলিয়ন প্রভৃতির মত বিশিষ্ট ও বিতর্কমূলক ঐতিহাসিক চরিত্রের উপর লিখিত জীবনীগ্রন্থ, স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত History of Bengal, রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস এমনকি স্কুল ও কলেজ পাঠ্য অনেক বই থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে—তবে অন্ধভাবে নয়। [যেমন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সম্পর্কে প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থ প্রসঙ্গে যে তথ্য প্রদত্ত হয়েছে তা লেখকের নিছক অনুমান নির্ভর নয়। কৌতূহলী পাঠক M. Lincoln Schuster সম্পাদিত 'A Treasury of the World's Great Letters—From Ancient days to our own Time', বইটি দেখতে পারেন]।

ইতিহাসে অবশ্য শেষ কথা বলে কিছু নেই। বাস্তবিকই 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে'? যত দিন যায়, নিত্যনতুন গবেষণা যতই চলতে থাকে, ততই বিদায় নেয় পুরনো প্রতিষ্ঠিত মত, ধারণা ও অনুমান। আজ যা সত্য বলে জানি প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে কাল তাই হয়তো প্রমাণিত হয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মিথ্যা হিসাবে। সেই কারণে যতদূর সম্ভব আধুনিক তথ্য এবং সিদ্ধান্তসমূহকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠক অশোক, আকবর, ঔরঙ্গজেব কিংবা হুসেন শাহ সম্পর্কে পড়লেই এ বিষয়ে অবহিত হবেন। আমার বক্তব্যের সূত্র ধরে আরও দু-একটি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই।

মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত নীচবংশজাত ছিলেন—এ মতটাই দীর্ঘদিন ধরে প্রাধান্য পেয়ে আসছে। মহাভামসা, দিব্যবদান প্রভৃতির মত বেশ কিছু প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে অবশ্য চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতরাও একমত নন এবং আজও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছিনো সম্ভব হয়নি।

স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইগুলোতে লেখা হয়ে থাকে যে পলাশীর যুদ্ধের আগে সিরাজ বিরোধী যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল সেই ষড়যন্ত্রে দেশের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তির মধ্যে জগৎ শেঠও জড়িত ছিলেন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই জানে না যে জগৎ শেঠ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। এটি একটি ব্যাঙ্কিং হাউস যা মুর্শিদ কুলির আমলে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই হাউসের প্রতিষ্ঠাতা মাণিকলাল সাহ মুর্শিদাবাদে মুর্শিদকুলিখানের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করেন। তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী ফতেচাঁদের আমলে এই ব্যাঙ্কিং হাউস বাংলার অর্থনীতিতে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। দিল্লীর মোগল বাদশাহ ফতেচাঁদকে ১৭২২ সালে 'জগৎ শেঠ' খেতাব প্রদান করেন।

সম্রাট নীরো রোম নগরে আগুন লাগিয়ে নির্জন পাহাড় চূড়ায় বসে খোশমেজাজে বেহালা বাজিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। রোমে নীরোর আমলে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল ঠিকই, তবে সেই অগ্নিকাণ্ডের স্রষ্টা নীরো কিনা, এমনকি সেইসময় নীরো রোমে অবস্থান করেছিলেন কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোম্পানী প্রকাশিত 'প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ' থেকে উদ্ধৃতি লক্ষণীয়: 'ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস (৫৫-১২০ খ্রীঃ) বলেন, অগ্নিকাণ্ডের সময়ে নীরো রোম থেকে বহুদূরে অ্যাণ্টিয়াম নামক স্থানে তাঁর নিজের বাড়ীতে ছিলেন।'

এই জাতীয় বইয়ে ভুলভ্রান্তি না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে বেশ কিছু দোষ-ত্রুটি, মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেল। পরবর্তী সংস্করণে বিশিষ্ট রাজা ও রাষ্ট্রনায়কদের সম্পর্কে আলাদাভাবে একটি গ্রন্থ নির্দেশিকা এবং পাদটীকা সংযোজনের ইচ্ছা রইল। বইটির মানোন্নয়নে পাঠকদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

এই পুস্তক রচনায় অম্লান ভট্টাচার্য, তরুণ রায়, গোবিন্দ পাল, সুযশ ভট্টাচার্য এবং জয়দেব সেনগুপ্ত আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তরুণ শিল্পী সুনির্মল দত্ত বইয়ের ভিতরকার ছবিগুলো স্কেচ করেছেন। প্রচ্ছদ এঁকেছেন বিশু দাস। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায় মহাশয় অজস্র কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অতীন্দ্রকিশোর হোমরায়, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস, ডঃ চিত্তব্রত পালিত এবং অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই কাজে আমাকে প্রথম থেকেই উৎসাহ দিয়ে আসছেন। আর প্রেরণা ও বিশেষ সহায়তা লাভ করেছি লেখক সুশীলকুমার দাশগুপ্তের কাছ থেকে।

পরিশেষে জানাই, প্রকাশক আশিস্ বর্দ্ধন এবং মুদ্রাকর পরেশনাথ পানের ঐকান্তিক প্রয়াস ব্যতীত এই বই এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হত না। এঁদের সকলের প্রতিই আমি কৃতজ্ঞ।

পাঠক মহলে বইটি সমাদৃত হলে শ্রম সার্থক মনে করব।

সুদীপ সেন

কার্তিক, ১৩৯৩

হাজার রাজা ও রাষ্ট্রনায়ক ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক ও গবেষকদের কাছে একটি অপরিহার্য রেফারেন্স গ্রন্থ তো বটেই মানবজাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী প্রতিটি মানুষের কাছে অপরিসীম আগ্রহের সঞ্চার করবে। মানবজাতির যাত্রাপথের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে যাঁদের ভূমিকা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাঁদের সম্বন্ধে জানার সুযোগ করে দিয়েছেন একই গ্রন্থের পরিসীমায় শ্রীসুদীপ সেন ইতিহাসে এম. এ. এই তরুণ লেখকের অমূল্য অবদান এই আকর গ্রন্থটি।

সম্ভবত এই জাতীয় গ্রন্থ বাংলা কেন, ইংরেজীসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাতেও সুদুর্লভ।

প্রকাশক

সূচীপত্র



অকল্যাণ্ড

[শাসনকাল ১৮৩৬-১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ব্রিটিশ ভারতে গভর্নর জেনারেল ছিলেন। লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববর্তী শাসক চার্লস মেটকাফের স্থলাভিষিক্ত হন এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ছয় বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। লর্ড অকল্যাণ্ড ইংলণ্ডের হুইগ দলের সমর্থক ছিলেন এবং এই দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁর ছয় বছরের শাসনকাল খুব শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়নি। এদেশে এসেই তিনি নানাবিধ শাসনসংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তিনি শিক্ষা বিভাগে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেন এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারী বৃত্তিদানের বিশেষ ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তীর্থ যাত্রীদের জন্য ধার্য কর তিনি রহিত করেন এবং সেচ বিভাগের উন্নতিকল্পে কতকগুলো নতুন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ যুগে ভারতবর্ষে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। ১৮৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারতে এক ব্যাপক ও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় প্রায় এক লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। লর্ড অকল্যাণ্ড এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে যে প্রয়াস চালান এবং সরকারী তহবিল থেকে যে পরিমাণ অর্থসাহায্য দেন তা ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অকল্যাণ্ডের লক্ষ্য ছিল আফগানিস্থানের উপর রুশ প্রভাব সম্পূর্ণ খর্ব করে সেখানে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু অকল্যাণ্ডের কূটনৈতিক বিচক্ষণতা বা রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বিশেষ ছিল না। তিনি তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা স্যার উইলিয়াম ম্যাকনটেনের পরামর্শে আফগানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনেন এবং শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত পরাজয়, বিপুল পরিমাণ সৈন্য ও অর্থক্ষয়ের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর আফগানিস্থান অভিযান শেষ হয়।

আফগান নীতির শোচনীয় ব্যর্থতার পরই লর্ড অকল্যাণ্ড ভগ্নহৃদয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (১৮৪২ খ্রীঃ)।

অক্টেভিয়াস

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী]

অক্টেভিয়াস ছিলেন জুলিয়াস সীজারের ভ্রাতুষ্পুত্র (মতান্তরে পোষ্যপুত্র) এবং প্রাচীন রোমের একজন শাসক। মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পূর্বে জুলিয়াস সীজার অক্টেভিয়াসকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। অক্টেভিয়াসের রাজত্বকালে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা সেনেটের অস্তিত্ব থাকলেও রোমের শাসনব্যবস্থা মূলত তাঁরই নির্দেশে পরিচালিত হত। অক্টেভিয়াস তরুণ বয়সে সিংহাসনে বসেন এবং তাঁর বিচক্ষণতা দিয়ে সাম্রাজ্য সুচারুভাবেই পরিচালনা করেন। তিনি 'ইম্পিরেটর' বা 'বিজয়ী সম্রাট' উপাধি ধারণ করেছিলেন। অক্টেভিয়াস সীজারকে রোমের প্রথম সম্রাট বলা চলে। তাঁর আমল থেকেই রোমে রাজতন্ত্রের সূচনা হয় এবং সম্রাটপদ বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে।

অক্টেভিয়াস প্রজাদরদী শাসক ছিলেন। জনগণ তাঁর সুশাসনে এত সন্তুষ্ট হয়েছিল যে রোমান সেনেট তাঁকে 'অগাস্টাস' বা 'মহান' আখ্যায় ভূষিত করে।

অগাস্টাস দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৬৯৭-১৭০৪, ১৭০৯-১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বিতীয় অগাস্টাস সপ্তদশ শতকের শেষভাগে পোল্যাণ্ডের রাজা হন এবং সর্বসমেত তিরিশ বছরেরও অধিককাল রাজকার্য পরিচালনা করেন। অগাস্টাস ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে ড্রেসডেন নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন যদিও সুরা নারীবিলাসের মত্ততার জন্য প্রজাসাধারণের চোখে তিনি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেননি।

দ্বিতীয় অগাস্টাস প্রথমে ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যাক্সনির ইলেক্টর নির্বাচিত হন এবং তিন বছর পর ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জন সোবিয়েস্কির পর পোল্যাণ্ডের রাজসিংহাসন শূন্য হলে তিনি ঐ পদ অধিকার করেন। সমসাময়িক রুশ সম্রাট পিটার দি গ্রেটের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ছিল তাঁর শাসনকালের এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা।

দ্বিতীয় অগাস্টাসের সময়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সুইডেনের সাথে পোল্যাণ্ডের তীব্র বিরোধ উপস্থিত হয়। পোলটাভা নামক স্থানে সুইডেনরাজ দ্বাদশ চার্লসের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত হতে হয়েছিল (১৭০৪)। এই ঘটনার পাঁচ বছর পর রাশিয়ার শক্তিশালী সম্রাট পিটার দি গ্রেটের কাছে চার্লস পরাজিত হওয়ায় পিটারের সাহায্যে অগাস্টাস আবার পোল্যাণ্ডের রাজা হন। তারপর দীর্ঘ চব্বিশ বছর একাদিক্রমে রাজত্ব করার পর ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অগাস্টাসের মৃত্যু হয়।

অগ্নিমিত্র

[শাসনকাল ১৫১-১৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ]

সুঙ্গ বংশের রাজা ছিলেন। অগ্নিমিত্র ছিলেন সুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রেষ্ঠ রাজা পুষ্যমিত্রের পুত্র। পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর ১৫১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি সুঙ্গ রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পরবর্তী আট বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন। দুঃখের বিষয় অগ্নিমিত্রের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা যায়না। পিতার আমলে তিনি বিদিশার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং বিদর্ভের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান পরিচালনা করে সাফল্য অর্জন করেন। আনুমানিক ১৪৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে অগ্নিমিত্র মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অচ্যুত রায়

[শাসনকাল ১৫৩০-১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দ]

বিজয়নগর রাজ্যের একজন রাজা ছিলেন অচ্যুত রায়। তিনি ছিলেন তুলুভ বংশোদ্ভূত। অচ্যুত রায় ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। বিদেশী পর্যটক নুনিজ তাঁকে একজন দুর্বলচিত্ত ও ভীরু শাসক বলে বর্ণনা করেছেন। সমসাময়িক শিলালেখ ও সাহিত্যিক উপাদানসমূহ থেকে অবশ্য জানা যায় তিনি মাদুরার বিদ্রোহী শাসনকর্তাকে দমন করেছিলেন এবং ত্রিবাঙ্কুরের রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। তবে অচ্যুত রায় শাসক হিসাবে আদৌ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁর দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা ও অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

মোট এগারো বছর রাজত্ব করার পর ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে অচ্যুত রায়ের মৃত্যু হয়।

অজয়দেব

[শাসনকাল ১১১০-১১৩৩ খ্রীষ্টাব্দ]

পিতা প্রথম পৃথিবরাজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অজয়দেব ১১১০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শকম্ভরীর চৌহান বংশের রাজা ছিলেন। অজয়দেব শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি এক সামরিক অভিযান পরিচালনা ক'রে মালব

অঞ্চলের পরমার রাজাকে পরাজিত করেছিলেন এবং তাঁর বিজয়ী বাহিনী উজ্জয়িনী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। পৃথিবরাজ বিজয় কাব্য থেকে অনুমান করা হয় তিনি গজনীর মুসলিমদের পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়নি। আজমীর শহরটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর নামানুসারে এর নাম হয় 'অজয়মের'।

অজয়দেবের আমলের বেশ কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে। এই সব মুদ্রায় শিবের মূর্তি দেখে মনে হয় তিনি শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মোট তেইশ বছর রাজকার্য পরিচালনা করার পর তিনি পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ ক'রে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন।

অজাতশত্রু

[শাসনকাল ৪৯৩-৪৬২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু। পিতার মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ ৪৯৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বৌদ্ধগ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী অজাতশত্রু সিংহাসন লোভে পিতৃহত্যা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে বুদ্ধদেবের শরণ নিয়েছিলেন। তবে জৈন গ্রন্থে এর কোনো সমর্থন না মেলায় এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়নি।

রাজত্বকালের সূচনা থেকেই অজাতশত্রু পিতার সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেন। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। এটি ছিল চারপাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা একটা সুন্দর শহর। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে অজাতশত্রু রাজগৃহকে রীতিমত সুরক্ষিত করে তোলেন এবং গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলীগ্রামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এই পাটলীগ্রাম পরবর্তীকালে মৌর্য যুগে বিখ্যাত রাজধানী শহর পাটলীপুত্রে পরিণত হয়।

নাম অজাতশত্রু হলেও অদৃষ্টের পরিহাসে এই নৃপতির শত্রুর অভাব ছিল না। প্রথমে অজাতশত্রু কোশলরাজ প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। যুদ্ধে কোশলরাজ পর্যুদস্ত হয়ে অজাতশত্রুকে কাশী নামক অঞ্চল প্রদান করেন এবং স্বীয় কন্যার সঙ্গে অজাতশত্রুর বিবাহ দেন। এরপর অজাতশত্রু বৈশালীর লিচ্ছবীদের সাথে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েন। লিচ্ছবীরা আশেপাশের অবন্তী, বৎস, সিন্ধু-সৌবীর প্রভৃতি অনেকগুলো রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করে অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। লিচ্ছবীরাজ চেতকের নেতৃত্বে পূর্বভারতের তিরিশটিরও অধিক গণরাজ্য তাঁর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল বলে জানা যায়। অজাতশত্রু কূটকৌশলের সাহায্যে এই শক্তি জোট

ভেঙ্গে ফেলতে অনেকটা সফল হন। দীর্ঘ ষোল বছর যুদ্ধের পর লিচ্ছবীরা পরাজিত হয় এবং বৈশালী রাজ্যটি মগধের অধীনে আসে।

প্রকৃতপক্ষে অজাতশত্রুর আমলেই মগধের হর্ষঙ্ক বংশ ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিল। অজাতশত্রুর অসামান্য সামরিক সাফল্যের মূলে ছিল প্রতিপক্ষের চেয়ে উন্নততর কূটনীতি এবং 'মহাশিলাকণ্টক' ও 'রথমুসল' নামক সে যুগের বিস্ময় দুটি শক্তিশালী অস্ত্রের ব্যবহার।

মৃত্যুর পূর্বে (৪৬২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) অজাতশত্রু যে পিতা বিম্বিসারের আমলের সাম্রাজ্যকে আরও অনেক বিস্তৃত করতে সমর্থ হয়েছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

অজিত সিংহ রাঠোর

[শাসনকাল ১৭০৯—১৭২১ খ্রীষ্টাব্দ]

অজিত সিংহ ছিলেন যোধপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহের পুত্র। তিনি ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে যোধপুরের সিংহাসন অজিত সিংহেরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজেব ইসলামধর্ম গ্রহণ না করলে তাঁকে এই পদাধিকার দেওয়া হবে না বলে জানালে রাঠোররা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। তাঁরা ঔরঙ্গজেবের প্রতি তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করলে সম্রাট ক্ষিপ্ত হয়ে স্বয়ং সসৈন্যে যোধপুর অভিযান করেন। অজিত সিংহ মেবারের রানা রাজসিংহের সহায়তা লাভ করে মোগলদের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন। ঔরঙ্গজেব অজিত সিংহ ও তাঁর অধীনস্থ রাজপুতদের দমন করতে ব্যর্থ হন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর পরবর্তী মোগল সম্রাট প্রথম বাহাদুর শাহ অজিত সিংহকে যোধপুরের রানা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর ফারুখশিয়রের আমলে মোগল শাসনের শিথিলতা লক্ষ্য করে অজিত সিংহ মোগলদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধাভিযান করেন। শেষ পর্যন্ত ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধির মাধ্যমে এই বিরোধের অবসান হয়। অজিত সিং তাঁর কন্যাকে মোগল সম্রাট ফারুখশিয়রের সাথে বিবাহ দিয়ে নিজের ক্ষমতা ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করেন। স্বীয় পুত্রের হাতে ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে জানা যায়।

অটো প্রথম

[শাসনকাল ৯৩৬-৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রথম অটো ছিলেন একজন বিখ্যাত জার্মান রাজা। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে (৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) জার্মানীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়।

প্রকৃতপক্ষে শার্লেমানের মৃত্যুর পরবর্তীকালে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় রাজনীতিতে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিমান ব্যক্তিত্ব। আকেনে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে তাঁর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং বহু বড় বড় ডিউক এতে অংশগ্রহণ করেন। এটা ছিল বিশপগণ কর্তৃক সমর্থিত ক্যারোলিঞ্জিয় রাজতন্ত্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর প্রতীক।

অটো ছিলেন একজন ক্ষমতাবান দূরদর্শী পুরুষ। তিনি সমগ্র জার্মানীতে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। বড় বড় ডিউকদের তিনি তাঁর অধীনস্থ বশংবদ ব্যক্তিতে পরিণত করেন। অটো সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃংখলা স্থাপন করেন ও এক উন্নত, দক্ষ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। বিচার ব্যবস্থার ও সংস্কার সাধন করা হয়। তিনি চার্চের আনুগত্য দাবি করলেও এর আদর্শ ও ভাবধারার প্রসারে যথেষ্ট প্রয়াস চালান। বাস্তবিকই অটো ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী রাজা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় রাজগণের নেতা এবং খ্রীষ্টীয় জগতের প্রধান হওয়া। এই লক্ষ্যসাধনের পথে প্রতিবন্ধকগুলো দূর করতে তিনি অগ্রসর হন।

অটো দুর্ধর্ষ,লুণ্ঠনকারী ওয়েন্ডদের দমনের উদ্দেশ্যে একাধিক অভিযান প্রেরণ করেন এবং বোহেমিয়া জয় করেন। তিনি মডেয়ারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে লীচ্‌ফীল্ডের যুদ্ধে শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করেন এবং মডেয়ার আক্রমণের ভীতি থেকে জার্মানীকে রক্ষা করেন। পূর্বদিকে ব্যস্ত থাকলেও শার্লেমানের সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রথম অটো বিস্মৃত হননি। তিনি তাঁর বিখ্যাত পূর্বসূরী শার্লেমানের মতই ইতালীর শত্রুদের বিরুদ্ধে পোপের সমর্থন লাভ করলেন এবং রোমান সম্রাট হিসাবে ভূষিত হলেন। এরপর অটো স্বীয় ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে একাধিক সম্মেলন আহবান করে নিজের ইচ্ছামত পোপ নির্বাচন ও পদচ্যুত করতে লাগলেন।

প্রথম অটোর সামরিক কৃতিত্বের জন্য শার্লেমানের আমলের সাম্রাজ্যই যেন ফিরে এসেছে বলে মনে হতে থাকে। জনগণ ভাবে ইউরোপীয় রাজাদের মধ্যে শার্লেমানের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। সাম্রাজ্যবিস্তার অভিযান কিংবা চার্চ সংক্রান্ত নীতি উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম অটো শার্লেমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন।

সাঁইত্রিশ বছর বীরবিক্রমে রাজত্ব চালাবার পর ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অটোর মৃত্যু হয়।

অটো দ্বিতীয়

[শাসনকাল ৯৭৩-৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রথম অটোর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় অটো ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার মত অসাধারণ যোগ্যতা ও প্রতিভার অধিকারী না

হ'লেও তিনি একজন সমর্থ শাসক ছিলেন। তাঁর পিতা এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে গেলেও সেই সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি। প্রথম অটোর মৃত্যুর পর থেকেই সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ নানা দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকে। সামন্ত প্রভুদের উচ্চাভিলাষের দরুণ লোথারিঞ্জিয়ায় অশান্তি শুরু হয়েছিল। ব্যাভারিয়ায় সম্রাটের ভ্রাতা হেনরী স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। রোমেও বিক্ষোভ দানা বাঁধছিল। দ্বিতীয় অটো ব্যাভারিয়ার হেনরী র‍্যাংগলারকে দমন করেন এবং ব্যাভারিয়ার পুনর্গঠন করে উত্তর ও পূর্বাঞ্চল দু'জন পৃথক শাসকের অধীনে রাখেন। তিনি উত্তরদিকে ডেনদের অভিযান সফলভাবে প্রতিহত করেন। এরপর অটো ফরাসীরাজ লোথারের সাথে এক তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েন। জার্মানীর আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা কিছু পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত করে দ্বিতীয় অটো ইতালীর দিকে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তাঁর দক্ষিণ ইতালী জয় এবং স্যারাসেনদের সিসিলিতে বিতাড়নের পরিকল্পনা সফল হয়নি। তিনি স্টিলো নামক স্থানে সম্পূর্ণ পরাজিত হন (৯৮২ খ্রীঃ)। এই পরাজয়ে শুধু তাঁর ইতালী অভিযানই ব্যর্থ হয়নি, তাঁর সাম্রাজ্যের ভিত্তিও কেঁপে ওঠে। স্যারাসেনদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে তাঁর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাঁর দুর্বলতার সুযোগে ডেনরা জার্মানীর সীমান্তপ্রদেশগুলো আক্রমণ করে এবং স্লাভরাও বিদ্রোহী হয়। পোপের প্রতি অটোর নীতিও খুব সফল হতে পারেনি। তিনি চতুর্দশ জনকে পোপ মনোনীত করায় রোমানদের মানসিকতায় আঘাত লাগে।

দশবছর রাজত্ব করার পর ৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় অটো মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অটো তৃতীয়

[শাসনকাল ৯৮৩-১০০২ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বিতীয় অটোর মৃত্যুর পর তৃতীয় অটো ৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর সম্রাটপদ লাভ করেন। তৃতীয় অটো ছিলেন একজন ভাববাদী, স্বপ্নবিলাসী সম্রাট। তিনি পৃথিবীতে এক স্বর্গরাজ্য স্থাপনের কল্পনা করতেন। তিনি মনে করতেন পোপ ও সম্রাট সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধভাবে এমন এক পৃথিবী শাসন করবে যা হবে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর। কিন্তু সমসাময়িক পৃথিবী ছিল তাঁর কল্পনার ঠিক বিপরীতভাবে পরিপূর্ণ। তাই বাস্তববুদ্ধির অভাববশতঃ তৃতীয় অটোর আদর্শবাদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। বাইজানসিও সাম্রাজ্য সম্পর্কে অত্যধিক উচ্চধারণা পোষণ করার ফলে তিনি স্যাক্সন জীবনযাত্রাপ্রণালী পরিত্যাগ ক'রে বাইজানসিও রীতিনীতি, জীবনযাত্রাপ্রণালী প্রভৃতি সমস্তই অনুসরণ করেন। এমনকি টিউটনিক পদবী ও খেতাবগুলোর পরিবর্তে বাইজানটাইন ধরনে নতুন পদবী তিনি চালু করেন। পোপ ও সম্রাটের মধ্যে নিবিড়

সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি সাতজন পেশাদার পাদ্রীকে নিয়ে একটি পৃথক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয় অটো শার্লেমানের মত একাধিক পোপকে মনোনীত করেন।

তৃতীয় অটোকে কোনোমতেই একজন সফল রাজা হিসাবে অভিহিত করা চলেনা। তাঁর নীতিগুলো জার্মান ডিউকদের এবং জার্মান চার্চকে ক্ষুব্ধ করেছিল। জার্মানী ও ইতালী উভয় স্থানেই তাঁর নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। দক্ষিণ ইতালী বিদ্রোহ করলে তিনি সে বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হন। শীঘ্রই রোমে বিদ্রোহ ঘটে। তৃতীয় অটো বাধ্য হয়ে জার্মানী থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইতালীকে বশীভূত করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু জার্মানরা তাঁর সাথে সহায়তা করেনি। এই সময় মানসিক হতাশা ও উদ্বেগে ভুগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অপরিণত বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন (১০০২ খৃীঃ)। শুভ মানসিকতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বাস্তববুদ্ধির অভাবই তৃতীয় অটোর ব্যর্থতার জন্য দায়ী।

অনন্তবর্মণ

[শাসনকাল ১০৭৮–১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ]

উড়িষ্যার গঙ্গবংশের একজন বিশিষ্ট নরপতি ছিলেন অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গ। তাঁকে এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার আসন দেওয়া যেতে পারে। তিনি ১০৭৮ থেকে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়। অনন্ত বর্মণের মত এত অধিককাল আর কোনো রাজা রাজত্ব করেছিলেন বলে শোনা যায়না। তিনি মোট বাহাত্তর বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন। উড়িষ্যার কলিঙ্গ নগর ছিল তাঁর রাজধানী। তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি বহু সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন এবং গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন।

অনন্তবর্মণ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মাণ তাঁর রাজত্বকালের এক স্মরণীয় ঘটনা।

অনিরুদ্ধ

[শাসনকাল ১০৪৪–১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দ]

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশের একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন অনিরুদ্ধ। তিনি ছিলেন একজন হিন্দুবংশীয় নরপতি। তাঁর রাজত্বকাল তিরিশ বছরেরও বেশি

স্থায়ী হয়েছিল। অনিরুদ্ধ ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজকার্য পরিচালনা করেন। অনিরুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং বর্মায় বহু বৌদ্ধ মঠ, স্তূপ ও প্যাগোডা নির্মাণ করেন। যুদ্ধবিগ্রহেও তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং নিম্ন বর্মা ও আরাকানের রাজা তাঁর কাছে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হন। রাজ্যজয়ের মাধ্যমে বর্মার অনেকটা অংশ তিনি তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন।

অনিরুদ্ধ একজন সংস্কৃতিবান রাজা ছিলেন এবং প্রাচীন বর্মার ইতিহাসে বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর রাজত্বকালের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

অমর সিংহ

[শাসনকাল ১৫৯৭-১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক বীর রাণা প্রতাপ সিংহের পুত্র ছিলেন অমর সিংহ। প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর পর তিনি ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে বসার পূর্বে তিনি পিতার কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে প্রাণ থাকতে মোগল শাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না—আজীবন পিতার পদাঙ্কই অনুসরণ করে চলবেন। সিংহাসনে বসার পর অমর সিংহ পিতার নিকট পূর্ব প্রতিশ্রুতির মত মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। কিন্তু পিতার মত অদম্য মনোবল ও দেশপ্রেম তাঁর ছিল না। তবে তিনি সহজে মোগল বশ্যতা স্বীকার করেননি। মোগল সম্রাট আকবর মহারাজা মানসিংহকে এক বিশাল সৈন্যদলসহ অমর সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে অমর সিংহ কোণঠাসা হয়ে পড়লেও আত্মসমর্পণে রাজী হননি। এমন সময় বাংলায় ওসমান খানের বিদ্রোহ দমন করার জন্য মানসিংহের ডাক পড়ায় এই অভিযান অসমাপ্ত থেকে যায়।

আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর সম্রাট হয়ে মেবারে একাধিক যুদ্ধাভিযান চালান। কিন্তু অমরসিংহ আত্মসমর্পণ না করায় পুনরায় অভিযান প্রেরণ করতে হয়। জাহাঙ্গীর যুবরাজ খুররমকে (পরবর্তীকালে শাহজাহান) এক বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে মেবার আক্রমণে পাঠান (১৬১৫ খ্রীঃ)। খুররম নিপুণ কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে মেবার রাজপ্রাসাদের সঙ্গে অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে অবরুদ্ধ থাকার ফলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। অমরসিংহ বাধ্য হয়ে সন্ধি করেন (১৬১৫)। অমর সিংহকে সশরীরে মোগল দরবারে উপস্থিত হওয়ার এবং মোগল হারেমে মেবারের রাজকন্যা প্রেরণের অসম্মান থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। অমর সিংহের পুত্র করণ সিংহ মোগল দরবারে গমন করলে জাহাঙ্গীর

তাঁকে নানা মূল্যবান উপহার দিয়ে আপ্যায়ন করেন এবং তাঁকে পাঁচহাজারী মনসবদারের পদাধিকার প্রদান করেন। অমরসিংহকে একহাজার অশ্বারোহী সৈন্যের এক বাহিনী মোগল দুর্গে প্রেরণ করতে বলা হয়।

বলা বাহুল্য, এই সন্ধির ফলে শাসক হিসাবে অমর সিংহের স্বাধীন অস্তিত্বের অবসান ঘটে।

অমোঘবর্ষ

[শাসনকাল ৮১৪-৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন রাষ্ট্রকূটবংশের একজন বিশিষ্ট রাজা ছিলেন অমোঘবর্ষ। তিনি দীর্ঘ ষাট বছরেরও অধিককাল রাজত্ব করেন। অমোঘবর্ষের রাজত্বকাল সামরিক বিজয়ের দিক থেকে খুব কৃতিত্বপূর্ণ না হলেও জৈনধর্মের প্রসার এবং স্থানীয় সাহিত্যের বিকাশের জন্য স্মরণীয়। অমোঘবর্ষ নিজে সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং কানাড়া ভাষায় 'কবিরাজমার্গ' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। জীনসেন, মহাবীরাচার্য প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে একজন নিষ্ঠাবান জৈন হলেও কোনোরকম ধর্মীয় সংকীর্ণতা তাঁর ছিলনা। অমোঘবর্ষ হিন্দু দেবদেবীর উপাসনাও করতেন বলে জানা যায়।

অম্ভি

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক]

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতের একজন রাজা ছিলেন অম্ভি। তিনি ছিলেন বিশ্ববিজয়ী গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক। আলেকজাণ্ডার ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের বিবরণ এবং সমসাময়িক ভারতীয় রাজ্য ও রাজাদের কথা আরিয়ান প্রভৃতি গ্রীক লেখকদের লেখা থেকে জানা যায়। আলেকজাণ্ডারের উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণের সময় ঐ অঞ্চল অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত ছিল। আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদ অতিক্রম করে তক্ষশীলায় প্রবেশ করেন। সেই সময়, এখানকার রাজা ছিলেন অম্ভি। তক্ষশিলা রাজ্যটি ছিল বৃহৎ ও সমৃদ্ধশালী। সিন্ধুনদ ও ঝিলাম নদীর মাঝখানে ছিল এর অবস্থান। আলেকজাণ্ডারের আগমন সংবাদ অম্ভি

পূর্বেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। গ্রীকরাজ তাঁর রাজ্যে পৌঁছলে অম্ভি তাঁকে নিজ রাজধানীতে সাদর অভ্যর্থনা জানান। আলেকজাণ্ডার অম্ভির আনুগত্য প্রদানে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তাঁর রাজ্যের রাজা বলে স্বীকার করে নেন। প্রতিদানে অম্ভি গ্রীকবীরকে বহু মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন ও পাঁচহাজার রণনিপুণ যোদ্ধা দিয়ে সাহায্য করেন।

সেইসময় তক্ষশিলা ভারতের অন্যতম প্রধান রাজ্য বলে বিবেচিত হত। ভারতবর্ষ অভিযানে এসে আলেকজাণ্ডারকে অনেক স্থানেই প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভারতীয়দের বীরত্বের প্রশংসা গ্রীক লেখকরাও না করে থাকতে পারেননি। সে ক্ষেত্রে অম্ভির ভূমিকা ছিল নিতান্তই লজ্জাজনক। আলেকজাণ্ডারের সাথে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে তিনি একদিকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে বিদেশী শক্তির সাহায্যে তাঁর দুই প্রতিবেশী রাজা পুরু ও অভিসার নৃপতির বিনষ্টি সাধনের পরিকল্পনা করেছিলেন।



অশোক

[শাসনকাল ২৭৩-২৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ]

পিতা বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করলে (২৭৩-খ্রীঃ পূর্বাব্দ) ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। অশোককে বিশ্ব ইতিহাসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

অশোকের শিলালিপিগুলো তাঁর প্রথম দিককার জীবন সম্পর্কে কোনোরকম আলোকপাত না করার জন্য বাধ্য হয়ে পরবর্তীকালে রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থগুলোর উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। তবে সমস্যা হল, এদের বিবরণ সব ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই অশোকের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সত্যতা সম্পর্কে আজও সংশয় কাটেনি।

মহাভামসা ও দিব্যবদান থেকে জানা যায় যে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়। এতে অশোক বিজয়ী হন এবং অন্যান্য ভ্রাতাদের নিধন করে মগধের সিংহাসন দখল করেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায়

অশোক অল্পবয়সে অত্যন্ত অশান্ত চিত্ত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর ভয়ংকর স্বভাবের জন্য লোকে তাঁকে 'চণ্ডাশোক' আখ্যা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোকের মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন ঘটলে তাঁকে 'ধর্ম্মাশোক' বলা হত। অশোক তাঁর ভাইদের হত্যা করে সিংহাসনে বসেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে অন্য কোনো সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং বৌদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের বক্তব্য নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া কঠিন। তবে যে কোনো কারণেই হোক্ সিংহাসনে আরোহণের চার বছর পর অশোকের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল (২৬৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)।

যুবরাজ থাকাকালীনই অশোক উজ্জয়িনীর প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় রাখেন। এরপর তক্ষশীলায় এক বিদ্রোহ ঘটলে তিনি তা দমন করেন ও সেখানকার শাসক নিযুক্ত হন। অশোকের আমলে মৌর্য সাম্রাজ্য হিন্দুকুশ থেকে মহীশূর পর্যন্ত এক সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং এর খ্যাতি ভারতবর্ষের বাইরেও প্রসারিত হয়েছিল। অশোকের আমলে প্রাপ্ত শিলালিপিগুলো থেকে অশোকের শাসনব্যবস্থা, ধর্মনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে নানা কথা জানা যায়। শিলালেখগুলোতে অশোক নিজেকে 'দেবানম পিয় পিয়দশি' অর্থাৎ 'দেবতাদের প্রিয়' বলে উল্লেখ করেছেন।

কলিঙ্গযুদ্ধ হ'ল অশোকের রাজত্বকালের একমাত্র রাজনৈতিক ঘটনা। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী কলিঙ্গ রাজ্যটি (বর্তমান উড়িষ্যা) ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। অভিষেকের আট বছর পর ২৬১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অশোক কলিঙ্গ অভিযান ও জয় করেন। ত্রয়োদশ শিলালেখতে অশোক এই যুদ্ধের এক করুণ ও মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন। লেখ অনুযায়ী এই যুদ্ধে দেড় লক্ষ মানুষ বন্দী হয়েছিল এবং লক্ষাধিক মানুষ হতাহত, গৃহহীন ও নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধের অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্লিনি কলিঙ্গের সামরিক শক্তির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সত্য হলে শিলালেখর এই পরিসংখ্যান অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়। অবশ্য ডঃ হেমচন্দ্র রাচচৌধুরী এবং ডঃ ভাণ্ডারকর এই ক্ষয়ক্ষতির অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছে। যাই হোক, কলিঙ্গ বিজয় ছিল ভৌগোলিক ও ব্যবসায়িক কারণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিজয় মৌর্য সাম্রাজ্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছিল।

কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী রূপ অশোকের মানসিক পরিবর্তন ঘটায় বলে ধরে নেওয়া হয় এবং এই যুদ্ধের পর থেকে অশোক পিতৃপিতামহের যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্যজয় নীতি পরিত্যাগ করে শান্তি ও অহিংসনীতি অবলম্বন করেন বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।

সম্প্রতি রোমিলা থাপারের মত কিছু কিছু গবেষক অশোকের বৈদেশিক নীতির পশ্চাতে দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাষ্ট্রশাসনে ধর্মনীতির উদ্দেশ্য ও প্রভাব নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা-

ভাবনা শুরু করেছেন। এঁদের বক্তব্য হ'ল অশোক আদৌ পূর্বপুরুষদের অনুসৃত বৈদেশিক নীতি পরিত্যাগ করেননি···তিনি শুধুমাত্র ধারাটিকে বদলে দেন। বিশেষ রাজকর্মচারী নিয়োগ এবং কূটনৈতিক দৌত্য প্রেরণের মাধ্যমে অশোক অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ-ভাবে তাঁর সাম্রাজ্যকে পরিচালনা করেছেন এবং যে সব দেশ তখনো জয় করা বাকী ছিল (দক্ষিণভারতের চোল, চের, পাণ্ড প্রভৃতি) সেইসব দেশের জনসাধারণকে সম্রাটের স্নেহ-প্রীতি-শুভেচ্ছা এবং সবরকমের আশ্বাস প্রদান করেছেন। এঁদের মতে অশোক রাজনীতির মাধ্যম হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করেন এবং ধর্ম প্রচারের সাহায্যে মৌর্য শাসনকে জনপ্রিয় করে তুলে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখেন। সুতরাং এই সব দিক বিবেচনা করে দেখলে তাঁকে নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ্ হিসাবে স্বীকার করে নিতে হয়।

অশোক বহু দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। তাঁর শিলালেখতে গ্রীকরাজ দ্বিতীয় অ্যাণ্টিওকাস, মিশরের রাজা দ্বিতীয় টলেমি ফিলাডেলফাস, ম্যাসিডনের রাজা অ্যাণ্টিগোনাস, সিরেনির রাজা ম্যাগাস, এপিরাসের রাজা আলেক-জাণ্ডার প্রভৃতির নাম উল্লিখিত আছে। অশোক বিশেষভাবে সিংহলরাজের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। অশোক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর পুত্র মহেন্দ্রের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। সিংহলরাজ তিষ্যও পাটলিপুত্রে একজন দূতকে প্রেরণ করেছিলেন।

অশোকের শিলালিপিগুলো থেকে জানা যায় কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হয়ে পড়েন। কল্হনের মতে, কলিঙ্গ যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন প্রধানতঃ শিবের উপাসক। এরপর থেকে অশোক ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্মের অহিংস, মানবিক দিকের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করতে থাকেন। সম্ভবতঃ তাঁর রাজত্বের দশম বছরে অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। অশোক ঘোষণা করেন, "সমগ্র জগতের কল্যাণ করা অপেক্ষা বড় কর্তব্য কিছু নেই এবং আমি যা সামান্য কিছু করার প্রয়াস চালাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল জীবগণের কাছ থেকে যাতে আমি ঋণমুক্ত হতে পারি, যাতে আমি তাদের ইহলোক ও পরলোকে সুখবিধান করতে পারি।"

অশোকের ধর্মপ্রচারের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেই নয়, এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তাঁর ধর্মপ্রচারের প্রভাব পড়েছিল। ত্রয়োদশ শিলালেখতে অশোক তাঁর রাজধানী থেকে ছয়শো যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ধর্মবিজয়ের দাবি করেছেন। গ্রীক রাজ্যগুলোতে এই প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী না হলেও ভারতবর্ষ ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলো যে তাঁর ধর্মপ্রচারে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনীষী এইচ. জি. ওয়েলস অশোক সম্পর্কে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন, ইতিহাসে হাজার হাজার রাজার নামের ভিড়ে সম্রাট অশোকের নামটি যেন এক-

উজ্জ্বল তারকার মত জ্বলজ্বল করছে। ভলগা থেকে জাপান পর্যন্ত অশোক আজও সম্মানিত হচ্ছেন। চীন, তিব্বত, এমনকি ভারতবর্ষেও যেখানে তাঁর ধর্মকে গ্রহণ করা হয়নি সেই দেশেও তাঁর মহত্ত্বের ঐতিহ্য রক্ষিত হচ্ছে। কনস্টানটাইন ও শার্লেমানের নাম কখনো শোনেননি এরকম বহু মানুষ আছেন যাঁরা অশোকের স্মৃতিকে অন্তরে লালন করে চলেছেন।

দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর রাজত্ব করার পর ২৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট অশোকের জীবনাবসান হয়।

অসুরনাসিরপাল দ্বিতীয়

[শাসনকাল ৮৮৩-৮৫৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে প্রাচীন আসিরিয়ার অসুর বংশের রাজা ছিলেন। দ্বিতীয় অসুরনাসিরপাল ৮৮৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আসিরিয় সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় পঁচিশ বছর সিংহাসনে আসীন থাকেন। তিনি টাইগ্রীস নদীর তীরে নিমরুদ নামক স্থানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন এবং চারপাশে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর উপর অভিযান চালিয়ে নিজ রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। তিনি এক সুদক্ষ অশ্বারোহী বাহিনীর সৃষ্টি করেছিলেন।

আনুমানিক ৮৫৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে অসুরনাসিরপাল মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অসুরবনিপাল

[শাসনকাল ৬৬৮-৬২৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচীন আসিরিয়ার একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন অসুরবনিপাল। তিনি ৬৬৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে চল্লিশ বছরের অধিককাল প্রবল পরাক্রমের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অসুরবনিপাল তাঁর সামরিক শক্তির জোরে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। তিনি ব্যাবিলন, সুমের, মিশর, মিডিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি বহুস্থানে সমরাভিযান চালিয়ে তাঁর সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করেন।

অসুরবনিপাল শিকার করতে খুব ভালবাসতেন। আসিরিয়ায় প্রাপ্ত তাঁর সময়ের ফলকচিত্রে তাঁকে সিংহের সাথে যুদ্ধরত দেখা যায়। অসুরবনিপাল এক বিশাল ও সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী গড়েছিলেন। তাঁর ভয়ে চারপাশের রাজ্যগুলো সর্বদা তটস্থ থাকত। অসুরবনিপাল নিষ্ঠুরতায় অ্যাটিলা কিংবা চেঙ্গিসের চেয়ে কম ছিলেন না। শত্রু এবং যুদ্ধবন্দীদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল চরম অমানুষিক। তিনি হাজার হাজার

মানুষকে অগ্নিদগ্ধ করে এবং আরও নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেন। কিন্তু অসুরবানিপাল শাসক হিসাবে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি বিদ্বান ব্যক্তিদের সমাদর করতেন এবং শিল্প সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সেই সময় শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অনেক প্রসার ঘটেছিল। তিনি তাঁর রাজপ্রাসাদকে বহু সুন্দর চিত্রদ্বারা সুশোভিত করেছিলেন।

৬২৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে অসুরবানিপালের মৃত্যু হয়।

অহল্যাবাঈ

[শাসনকাল ১৭৬৭-১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ]

অহল্যাবাঈ ইন্দোরের রাণী ছিলেন। তাঁর স্বামী ইন্দোরের শাসক খণ্ডেরাও হোলকার ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্রের অবর্তমানে খণ্ডেরাও এর পিতা মলহর রাও রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। মলহর রাও ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে ইন্দোরের রাজাসিংহাসন পুনরায় শূন্য হয়ে পড়ে। অগত্যা খণ্ডেরাও এর পত্নী অহল্যাবাঈকেই শাসনকার্য পরিচালনার সকল দায়দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে বহন করতে হয়।

অহল্যাবাঈ একজন তেজস্বী রমণী ছিলেন এবং শাসনকার্যে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুদক্ষ শাসনের মাধ্যমে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইন্দোরের প্রজা-সাধারণের জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি একজন ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন এবং অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে জীবনযাপন করতেন। তীর্থক্ষেত্রগুলোতেও তিনি প্রচুর অর্থ দান করতেন। ইন্দোরের উন্নতিবিধানই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। তাঁর সময়ে ইন্দোরের আভ্যন্তরীণ অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল এবং তাঁর সুশাসন ও বদান্যতার কথা ইন্দোরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রায় কুড়ি বছর শাসনকার্য পরিচালনা করার পর ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মহীয়সী রমণী পরলোক গমন করেন।

অ্যাগামেমনন

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী]

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাচীন গ্রীসের অন্তর্গত মাইসিনির অধিপতি ছিলেন। অ্যাগমেমননের আমলে মাইসিনির সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক

প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি ছিলেন তদানীন্তন স্পার্টার রাজা মেনেলাসের ভ্রাতা।

ট্রয় নগরের রাজা প্রিয়ামের পুত্র প্যারিস মেনেলাসের অসাধারণ রূপসী পত্নী হেলেনকে অপহরণ করে স্বদেশে নিয়ে গেলে অ্যাগামেমনন অন্যান্য গ্রীক রাজাদের তাঁর নেতৃত্ব একত্রিত করে এক বিশাল নৌবাহিনী নিয়ে ট্রয় অভিমুখে অভিযান করেন। এই অভিযানে গ্রীকদের শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন অ্যাকিলিস। দশ বছর ধরে ট্রয় নগর অবরোধ করে রেখেও গ্রীকবাহিনী ট্রোজানদের পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে বিখ্যাত গ্রীক বীর ওডিসিয়াস বা ইউলিসিস শত্রুকে পরাস্ত করার এক নিপুণ পরিকল্পনা করেন। তিনি এক বিশাল কাঠের ঘোড়া নির্মাণ করে তাঁর মধ্যে বহু গ্রীক সৈন্যকে লুকিয়ে রাখেন। ট্রোজানরা এই অদ্ভুত বস্তু দেখে প্রলুব্ধ হয়ে ঘোড়াটিকে তাদের দুর্গের মধ্যে নিয়ে যায়। রাতের বেলা সবাই যখন নিদ্রামগ্ন, সেইসময় গ্রীক সৈন্যরা কাঠের ঘোড়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে অসহায় ট্রোজানদের সহজেই পরাজিত করতে সমর্থ হয়। ট্রয় অবরোধের কাহিনীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে হোমার রচিত বিখ্যাত মহাকাব্য 'ইলিয়াড'। আর ট্রয় যুদ্ধের অন্যতম প্রধান বীর গ্রীক সেনাপতি ইউলিসিসের কাহিনী হ'ল 'ওডিসির' বিষয়বস্তু।

ট্রয় যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত প্রাচীন উপাখ্যানগুলোর মধ্য থেকে যথার্থ ইতিহাস খুঁজে নেওয়া প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। তবে ঐতিহাসিকদের অভিমত হল, একদল গ্রীক ঔপনিবেশিক এশিয়া মাইনর অঞ্চলে বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সময় যাত্রা করেছিল এবং ট্রোজান যুদ্ধে ট্রয় নগরী তাদের হাতে ধ্বংস হয়েছিল। ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ার পর তা পরীক্ষা করে গবেষক-পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

অ্যাগিস

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী]

প্রাচীন স্পার্টার রাজা ছিলেন।

নিকিয়াসের চুক্তি এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হয়। পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের সময় স্পার্টার পক্ষে যে সব ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল সেগুলো নিকিয়াসের চুক্তির পর স্পার্টার বিরুদ্ধে আর্গসের নেতৃত্বে একটি শক্তিজোট গঠন করে। আলকিবিয়াডিসের প্ররোচনায় এথেন্সও এই শক্তিসঙ্ঘে যোগদান করলে স্পার্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু অ্যাগিস ছিলেন একজন শক্তিশালী

রাজা। তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী এবং যুদ্ধ পরিচালনায় রীতিমত পারদর্শী। সম্মিলিত বাহিনীর রণসজ্জা দেখে বিচলিত না হয়ে তিনি স্পার্টার সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিজের শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। মণ্টিনের যুদ্ধক্ষেত্রে স্পার্টার রাজা আর্গস ও তাঁর সম্মিলিত বাহিনী অ্যাগিসের কাছে চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করে (৪১৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)।

এই যুদ্ধ নিঃসন্দেহে ছিল পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ফল। এতে জয়লাভের ফলে স্পার্টা ও তার রাজা অ্যাগিসের মর্যাদা সমগ্র গ্রীসে অনেক বৃদ্ধি পায় এবং এরপর থেকে অন্যান্য গ্রীক রাজ্যগুলো স্পার্টার সামরিক শক্তিকে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি সমীহ করতে থাকে। আর্গসের নেতৃত্বাধীন শক্তিজোট ভেঙ্গে যায় এবং এথেন্সও অন্যান্য গ্রীক রাজ্যগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্পার্টার হৃতমর্যাদা ও গৌরব পুনরুদ্ধার করা এবং স্পার্টাকে গ্রীক দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ছিল অ্যাগিসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

অ্যাগেসিলাস

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী]

প্রাচীন স্পার্টার একজন রাজা ছিলেন অ্যাগেসিলাস। বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ ৩৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি স্পার্টার রাজা মনোনীত হয়েছিলেন। অ্যাগেসিলাস কত বছর রাজত্ব করেছিলেন সঠিকভাবে জানা যায়নি। রাজা হবার পর একজন সাহসী ও কর্মোদ্যোগী পুরুষ হিসাবে তিনি নিজ যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর রাজত্বকালে স্পার্টা পারস্যের সাথে এক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। পারস্য আইওনিয়ার স্পার্টার আশ্রিত শহরগুলো আক্রমণ করলে অ্যাগেসিলাস সেগুলোর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তিনি অসাধারণ রণনৈপুন্য দেখিয়ে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পারসীক সৈন্যদের পরাজিত করেন। তিনি এক শক্তিশালী নৌবহরও গঠন করেন এবং পারস্য সাম্রাজ্য জয়ের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু ইতিমধ্যে স্পার্টার বিরুদ্ধে কতকগুলি গ্রীক রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হলে তাঁকে পারস্য অভিযানের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়। অ্যাগেসিলাস করোনিয়ার যুদ্ধে সম্মিলিত শত্রুবাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। তবে এই যুদ্ধে জয়লাভ করলেও তিনি বিশেষ লাভবান হননি কারণ তাঁকেও যথেষ্ট ক্ষতিস্বীকার করতে হয়েছিল। থিবদের আধিপত্যের যুগে তিনি এপামিনোনডাসের আক্রমণ থেকে স্পার্টাকে রক্ষা করেন। পারস্য মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করলে অ্যাগেসিলাস মিশরবাসীর সাহায্যার্থে সসৈন্যে অগ্রসর হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পথিমধ্যে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।



অ্যাটিলা

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী]

দুর্ধর্ষ হুনজাতির সবচেয়ে পরাক্রমশালী ও সর্বশেষ সম্রাট ছিলেন অ্যাটিলা। তিনি ছিলেন এক অসামান্য সমরনায়ক, যোদ্ধা ও সাম্রাজ্যজয়ী পুরুষ। তাঁর ভয়ংকর প্রকৃতি এবং অভিযানকারী এলাকার উপর নৃশংস আচরণের জন্য তাঁকে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়ে থাকে। অ্যাটিলা হুনদের রাজা হিসাবে জীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে বহু এলাকা জয় করেন। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য রাইন থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়ার সমতলভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমসাময়িক জার্মান গোষ্ঠীগুলোর উপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চীনের সাথে অ্যাটিলা দূত বিনিময় করেন। ড্যানিয়ুবের পূর্বদিকে হাঙ্গেরীর সমতলভূমি ছিল তাঁর মূল ঘাঁটি। সেখানে অবস্থানকালে কনস্টান্টিনোপল থেকে প্রিসকাস নামক একজন দূত তাঁর রাজসভায় প্রেরিত হয়েছিল প্রিসকাসের লেখা থেকে অ্যাটিলার রাজত্বকালের বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। অত্যন্ত কুৎসিত দর্শন এই সম্রাটের আমলে হুনরা ছিল আধা-বর্বর গোছের মানুষ। তাদের কাজই ছিল উন্নত সমৃদ্ধশালী শহর-জনপদের ধ্বংসসাধন। অ্যাটিলার নেতৃত্বে হুনরা পৃথিবীর মানুষের কাছে ত্রাসসৃষ্টিকারী এক ভয়ানক জাতি বলে পরিগণিত হত। অ্যাটিলার সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ আশংকায় পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের কনস্টান্টিনোপল সম্রাট থিয়োডোসিয়াস বহুমূল্য উপহার ও উপঢৌকন দিয়ে তাঁর সাথে মৈত্রীস্থাপন করেন ও তাঁকে করপ্রদানে স্বীকৃত হন। ঐতিহাসিক গিবনের লেখা থেকে জানা যায় যে অ্যাটিলা বলকান অঞ্চলে অন্ততঃপক্ষে সত্তরটি শহর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলেন। অ্যাটিলা ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে গলদেশ (বর্তমান ফ্রান্স) আক্রমণ করেন এবং উত্তরাংশের প্রায় সব কটি শহরই লুণ্ঠিত হয়। ফ্রাংক, ভিসিগথ, বার্গান্ডী ও রোমের অধিবাসীরা আত্মরক্ষার তাগিদে সম্মিলিতভাবে এই দুর্ধর্ষ অভিযানকারীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। যুদ্ধে অ্যাটিলা পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হলেও পরের বছর তিনি ইতালি আক্রমণ করে বেশ কয়েকটি শহরের উপর লুণ্ঠন ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালান।

অ্যাটিলা ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে একজন অল্পবয়স্কা মহিলাকে বিবাহ উপলক্ষ্যে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করেন। ভোজপর্ব সমাধা হবার পর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অ্যাডাম

[শাসনকাল ১৮ ৩ খ্রীষ্টাব্দ]

লর্ড হেস্টিংসের পদত্যাগের পর জন অ্যাডাম ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে গভর্ণর জেনারেলের কার্যভার গ্রহণ করেন (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ)। সেই সময় তিনি ছিলেন কলকাতা কাউন্সিলের একজন প্রবীণ সদস্য। মিঃ অ্যাডাম অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল হিসাবে মাত্র সাত মাস এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারকে সংকুচিত করার জন্য তিনি এক আইন জারি করেন। অ্যাডামের আমলে ক্যালকাটা জার্নালের বিশিষ্ট সম্পাদক বাকিংহামকে তাঁর নির্ভীক সরকারী সমালোচনার জন্য ভারতবর্ষ ত্যাগে বাধ্য করা হয়।

রামমোহন রায় এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

সাত মাস শাসনকার্য পরিচালনা করার পর লর্ড আমহার্স্ট এ্যাডামের স্থলাভিষিক্ত হন।

অ্যান্টিপেটার

[শাসনকাল ৩২৩-৩১৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ]

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীসের রাজা ছিলেন অ্যান্টিপেটার। তিনি ৩২৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর ম্যাসিডনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর এথেন্সে ম্যাসিডন বিরোধী গোষ্ঠী হাইপেরিডিসের নেতৃত্বে ম্যাসিডনের প্রভাব থেকে গ্রীসের অন্যান্য অঞ্চল মুক্ত করার প্রয়াস চালায়। এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলো গ্রীক রাষ্ট্রকে নিয়ে এক শক্তিজোট গঠন করা হয়। অ্যান্টিপেটার প্রথমে এই সম্মিলিত বাহিনীর হাতে পরাজয় স্বীকার করলেও ৩২২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ক্রেননের যুদ্ধে প্রবল প্রতিপক্ষকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলো পুনরায় তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে।

অ্যান্টিপেটার মাত্র পাঁচ ছয় বছর রাজত্ব করেন এবং তাঁর জীবিতকালে ম্যাসিডন গ্রীসের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব পূর্বের মতই বজায় রাখতে সমর্থ হয়। অ্যান্টিপেটার ৩১৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

অ্যান্টিয়োকাস প্রথম

[শাসনকাল ২৮০-২৬১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি সেলুকাস নিকেটরের পুত্র। সেলুকাস আততায়ীর হস্তে নিহত হবার পর ২৮০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে প্রথম

অ্যান্টিয়োকাস সেল্যুসিড বংশের রাজা হন   সেল্যুসিড সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং প্রতিবেশী শক্তিগুলোর আক্রমণ থেকে এর নিরপত্তাবিধান করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। উত্তরদিকে গলদের আক্রমণ তিনি সফলভাবে প্রতিহত করেন এবং দক্ষিণে মিশরীয়দের বিরুদ্ধেও তাঁকে এক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়তে হয়।

প্রথম অ্যান্টিয়োকাস একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল ২৬১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত মোট কুড়ি বছর স্থায়ী হয়েছিল।

অ্যান্টিয়োকাস দ্বিতীয়

[শাসনকাল ২৬১-২৪৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

সেল্যুসিড বংশের একজন রাজা। ইনি প্রথম অ্যান্টিয়োকাসের পরবর্তী শাসক হিসাবে ২৬১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং চোদ্দ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর পিতার আমলে সেল্যুসিড সাম্রাজ্যের সাথে মিশরের এক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় অ্যান্টিয়োকাস সিংহাসনে বসার পর মিশরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। অবশেষে মিশরীয় সম্রাট টলেমি ফিলাডেলফাসের সাথে এক শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় অ্যান্টিয়োকাস মিশরের রাজকন্যা বেরেনিসকে বিবাহ করে মিশরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি ২৪৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

অ্যান্টিয়োকাস তৃতীয়

[শাসনকাল ২২৩-১৮৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

সেল্যুসিড বংশীয় রাজা তৃতীয় অ্যান্টিয়োকাস ২২৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে রাজা হন। তিনি একাধিক বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে সমর্থ হন এবং এশিয়া মাইনরকে পুনরায় সেল্যুসিড সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু মিশরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (২১৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) তিনি পরাজিত হন। তাঁকে ২১৫ থেকে ২০১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত পার্থিয়ান ও ব্যাকট্রিয়ানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয় এবং যুদ্ধের ফলাফল শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতই থেকে যায়। এরপর তৃতীয় অ্যান্টিয়োকাস মিশর অভিযানের জন্য পুনরায় প্রস্তুতি চালান এবং ২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মিশরীয়দের যুদ্ধে পরাস্ত করে প্যালেস্টাইন ও আরও দু-একটি স্থান জয় করেন। তিনি ১৯৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে সেল্যুসিড সাম্রাজ্যের সমস্ত হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তবে তৃতীয় অ্যান্টিয়োকাস এশিয়া মাইনরের নিকট এক যুদ্ধে রোমান সেনাপতি সিপিওর

হস্তে পরাস্ত হয়ে অত্যন্ত অসম্মানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হন। তাঁকে তাঁর সাম্রাজ্যের অনেকগুলি স্থান হারাতে এবং প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ দেবার অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হয়।

তৃতীয় অ্যান্টিয়োকাস ১৮৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আততায়ী হস্তে নিহত হন। তাঁর আমলে সেলুসিড বংশ একদিকে যেমন বিস্তৃতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল তেমনি অপরদিকে তাঁর সময়েই এই সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়।

অ্যান্টিয়োকাস চতুর্থ

[শাসনকাল ১৭৫-১৬৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

সেলুসিড বংশের একজন রাজা চতুর্থ অ্যান্টিয়োকাস ১৭৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সেলুসিড বংশের সিংহাসনে বসেন এবং মোট বারো বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন। তিনি ১৭১ থেকে ১৬৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে মিশরের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং মিশরীয়দের প্যালেস্টাইন ও অন্যান্য স্থান (যে গুলো তাঁর পূর্বপুরুষের আমলে মিশরীয়দের কাছ থেকে জয় করা হয়েছিল) পুনর্দখলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে সমর্থ হন। তিনি বিখ্যাত বন্দর আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করেন এবং সমগ্র মিশর জয়ের জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু এই সময় রোমানদের চাপে পড়ে তাঁকে মিশর জয়ের বাসনা পরিত্যাগ করতে হয়।

চতুর্থ অ্যান্টিয়োকাস তাঁর সাম্রাজ্যে বসবাসকারী ইহুদিদের উপর নির্মম অত্যাচার চালান যার ফলস্বরূপ তাঁকে এক ব্যাপক বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়।

পারস্য অভিযানে গিয়ে ১৬৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অ্যান্টোনিনাস পায়াস

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী]

একজন প্রাচীন রোমান সম্রাট অ্যান্টোনিনাস পায়াস কত খ্রীষ্টাব্দে রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সঠিক কতবছর রাজকার্য পরিচালনা করেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। তিনি ১২০ খ্রীষ্টাব্দে কনসাল পদ লাভ করেন এবং তদানীন্তন রোমান সম্রাট হাড্রিয়ানের একান্ত বিশ্বস্ত ও স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন। হাড্রিয়ান ১৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন।

অ্যান্টোনিনাস শাসক হিসাবে খুব প্রসিদ্ধি অর্জন না করলেও মোটের উপর একজন সমর্থ রাজা ছিলেন। হাড্রিয়ানের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগের জন্য তিনি

'পায়াস' উপাধিলাভ করেন। ইংলন্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে একটি দীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণ তাঁর রাজত্বকালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পরবর্তী বিখ্যাত রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসকে তিনি হাড্রিয়ানের নির্দেশে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন।

অ্যাণ্টোনিনাস পায়াস ১৬১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

অ্যান

[শাসনকাল ১৭০২-১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ]

নিঃসন্তান উইলিয়ামের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জেমসের কন্যা অ্যান ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি উইলিয়ামের মৃতা-স্ত্রী মেরীর ভগিনী ছিলেন এবং ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত 'অ্যাক্ট অব সেটেলমেণ্ট' এর বিধান অনুযায়ী ইংলণ্ডের কর্তৃত্বভার লাভ করেন। অ্যান প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

সিংহাসনে বসেই অ্যানকে স্পেনের উত্তরাধিকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। মার্লবরোর চমৎকার যুদ্ধবিজয়গুলো বহির্বিশ্বে ইংলণ্ডের গৌরব ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করেছিল। তাঁর সময়ে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত 'ইউট্রেক্টের শান্তিচুক্তি' সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী জিব্রাল্টার, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, নোভাস্কোসিয়া, হাডসন উপসাগরীয় এলাকাসমূহ প্রভৃতি ইংলণ্ডের অধিকারে আসে। রাণী অ্যানের শক্তিশালী বৈদেশিক নীতির সুফল হিসাবে ইউট্রেক্টের সন্ধির পরে নৌশক্তিতে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া স্পেনের সাথে এক আলাদা চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকায় স্পেনীয় উপনিবেশগুলোতে বাণিজ্যের অধিকারও ইংলণ্ড লাভ করে।

রাণী অ্যানের রাজত্বকালে হুইগ ও টোরী দলের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। টোরী দল এই যুদ্ধনীতির বিরোধিতা করে এবং ইংরাজ জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ ও যুদ্ধ করের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে টোরী দলকে সমর্থন জানায়। টোরী দল ক্ষমতায় আসার পরই মার্লবরোকে হেনস্থা করে এবং ইউট্রেক্টের সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত যুদ্ধের অবসান ঘটায়।

অ্যানের রাজত্বকালের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে পার্লামেণ্টিয় ঐক্যসাধন। 'অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন' নামক আইন পাশের মাধ্যমে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যেকার দীর্ঘকালীন রেষারেষি ও বিবাদ মিটিয়ে ফেলে শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হল। প্রকৃতপক্ষে এই আইনবলে দুই দেশের পার্লামেণ্ট মিলেমিশে একটি পার্লামেণ্টে পরিণত হয়, ইংলণ্ডের ইতিহাসে যার ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের

অধিকার স্কচরা লাভ করে এবং এরপর থেকে ইংলন্ড 'গ্রেট ব্রিটেন' বা 'ইউনাইটেড কিংডম' নামে পরিচিত হয়।

বারো বছর রাজত্ব করার পর ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাণী অ্যান শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

অ্যারিস্টাগোরাস

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দী]

অ্যারিস্টাগোরাস মাইলেটাস-এর 'টাইর‍্যান্ট' বা স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত পারস্য সম্রাট দরায়ুসের সমসাময়িক। আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ন্যাক্সোস উপদ্বীপে একটি গণ অভ্যুত্থান ঘটলে অভিজাতরা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়। তারা মাইলেটাসের শাসক অ্যারিস্টাগোরাসের সাহায্য প্রার্থনা করে। অ্যারিস্টাগোরাস পারস্যের একজন 'স্যাট্রাপ' বা প্রাদেশিক শাসকের সহায়তায় ন্যাক্সোস অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু পারসীক নৌসেনাধ্যক্ষ মেগাবেটসের সাথে তাঁর স্বার্থের সংঘাত লাগায় এই অভিযান ব্যর্থ হয়। পারস্যের প্রাদেশিক শাসক এতে ক্ষিপ্ত হন কারণ ন্যাক্সোস জয়ের বাসনা তাঁর এই অভিযানের পশ্চাতে কাজ করেছিল। তিনি অ্যারিস্টাগোরাসের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করায় অ্যারিস্টাগোরাস বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং আইওনিয়ার অন্যান্য গ্রীক রাজ্যগুলোকেও পারস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচিত করেন। এইভাবে আইওনিয়ার বিদ্রোহ শুরু হয় (৪৯৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)।

এরপর অ্যারিস্টাগোরাস সরাসরি গ্রীস থেকে সাহায্যলাভের চেষ্টা করেন। স্পার্টা সাহায্য দিতে নারাজ হলেও এথেন্স ও ইরিট্রিয়া তাঁর আবেদনে সাড়া দেয়। আইওনিয় গ্রীকেরা এথেন্স ও ইরিট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীর সাথে সম্মিলিতভাবে পারস্যের প্রাদেশিক শাসকের রাজধানী সার্ডিস আক্রমণ করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনায় পারস্য সম্রাট দরায়ুস রীতিমত ক্রুদ্ধ হন এবং একের পর এক ঝটিকা অভিযান চালিয়ে গ্রীক রাজ্যগুলোর বিদ্রোহ দমন করে ফেলেন। অ্যারিস্টাগোরাস ভীত হয়ে থ্রেসে পলায়ন করলে একটি সংঘর্ষে তাঁর মৃত্যু হয়।

আইভান চতুর্থ

[শাসনকাল ১৫৩৩-১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দ]

ষোড়শ শতাব্দীতে রাশিয়ার একজন রাজা ছিলেন। চতুর্থ আইভান পূর্ববর্তী শাসক তৃতীয় বেসিলের মৃত্যুর পর ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর

নিষ্ঠুর স্বভাবের জন্য তিনি ইতিহাসে 'আইভান দি টেরিবল' বা 'ভয়ঙ্কর আইভান' নামেও পরিচিত।

চতুর্থ আইভান একজন হীন চরিত্রের মানুষ ছিলেন এবং শঠতা, নির্মমতা, লাম্পট্য প্রভৃতি তাঁর চরিত্রে অত্যধিক মাত্রায় বজায় ছিল। তাঁর রাজত্বকালের প্রথমদিকে তাঁর অল্পবয়স ও অনভিজ্ঞতার সুযোগে সামন্তপ্রভুরা বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠলে সাম্রাজ্য মধ্যে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে পারেনি। আইভান শাসনকার্যে কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেই বিরোধী শক্তিকে নির্মমভাবে দমন করেন।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে আইভান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি নার্ভা বন্দর জয় করে বাল্টিক এলাকাকে রাশিয়ার সামনে উন্মুক্ত করেন। তিনি কাজান ও অস্ত্রাখান অঞ্চল থেকে তাতারদের উৎখাত করে সেগুলি স্বীয় হস্তগত করেন। এইভাবে পূর্বদিকের পথও তিনি উন্মুক্ত করেন। আইভান পশ্চিমী দেশগুলোর সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন এবং শ্বেত সাগরীয় এলাকায় একটি বন্দর নির্মাণ করেন। তিনি রাশিয়ার বাণিজ্যিক উন্নতির জন্য বিদেশী বণিকদের রাশিয়ায় আসতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আইভানের ভূমিকা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে এমন কথা বলা চলে না। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ আইভানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এক সুদীর্ঘকালীন স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে

আইভান দি গ্রেট

[শাসনকাল ১৪৬২-১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে রাশিয়ার মাসকোভি অঞ্চলের রাজা ছিলেন। আইভান দি গ্রেট ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দে মাসকোভির প্রধান শহর ও রাজধানী মস্কোর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন। আইভান যে একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাজা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একজন নিপুণ রাজনীতিবিদ্ হিসাবে তিনি ছলে বলে কৌশলে তাঁর সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি চালিয়ে যান। আইভানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তাতারদের হাত থেকে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলকে মুক্ত করে সেগুলোকে একই কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে ঐক্যবদ্ধ করা। সুতরাং মধ্যযুগে রাশিয়ার ইতিহাসে তিনিই প্রথম রাজা যিনি খণ্ড, বিচ্ছিন্ন রুশ এলাকাগুলোকে একই শাসনাধীনে এনে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

আইভানের আমলে রুশ সমাজ ছিল পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক। সমাজের সর্বোচ্চ

স্তরে বসে অভিজাতরা সবরকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন আর সমাজের সর্বনিম্ন-স্তরের ভূমিদাসরা এইসব উপরতলার মানুষের দ্বারা নিরন্তর শোষিত হত। তা সত্ত্বেও বলা যায় আইভান ছিলেন দৃঢ়চেতা ও দক্ষশাসক এবং একজন সাম্রাজ্য নির্মাতা। রুশদেশের মুক্তিদাতা ও ঐক্যবিধানকারী হিসাবে এবং ইউরোপে রুশ মর্যাদাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আইভানের অবদান ছিল যথেষ্ট।

আইভান দি গ্রেট বা 'মহান আইভান' ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।



আকবর

[শাসনকাল ১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ]

ভারতবর্ষের সর্বকালের ইতিহাসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট। পিতা হুমায়ুনের মৃত্যুর পর ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে আকবরের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং তারপর থেকে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সফল ও সুচারুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করেন। এক অত্যন্ত সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে আকবর মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন। শের শাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা পুনরায় অধিকার করলেও ভারতে মোগল শাসনের ভিত্তিকে দৃঢ় করে যেতে পারেননি। আফগান শক্তি তখন রীতিমত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং ভারতে কর্তৃত্ব স্থাপনের আশা পোষণ করছে। এ ছাড়া সাম্রাজ্য পরিচালনার উপযোগী কোনো শাসনব্যবস্থাও তখন গড়ে ওঠেনি। আকবরের প্রধান কৃতিত্ব হ'ল তিনি সারাজীবন ধরে বহু সামরিক অভিযান পরিচালনা করে মোগল সাম্রাজ্যের সীমা রীতিমত বিস্তৃত করেন এবং এক উন্নত, সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ক'রে মোগল শাসনকে স্থায়ী করেন।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধকে আকবরের গৌরবময় শাসনকালের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান বলা চলে। এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে তিনি আফগান শক্তির ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের আশার মূলে কুঠারাঘাত করলেন। মোগল শাসনকে সমগ্র ভারতব্যাপী বিস্তৃত করার জন্য আকবর একের পর এক অভিযান চালিয়ে মেবার, গণ্ডোয়ানা, বাংলা, গুজরাট,

উড়িষ্যা, কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর, মালব, সিন্ধু বেলুচিস্তান, আহমদনগর, খান্দেশ, বেরার প্রভৃতি বহুস্থান জয় করেন। তাঁর সামরিক শক্তির জোরে অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারত এবং দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ মোগল শাসনাধীনে আসে।

দূরদর্শী আকবর বুঝেছিলেন যে হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে মোগল শাসনকে স্থায়ী করতে গেলে হিন্দুদের সহায়তা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বিশেষ করে তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর জাতি রাজপুতদের স্ববশে আনতে না পারলে মোগল সাম্রাজ্যের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হবে না। তাই তাঁর হিন্দু-রাজপুত নীতির মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ প্রচেষ্টায় এদেশে এক "জাতীয় রাজতন্ত্র" গড়ে তোলা।

সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে আকবর মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে নিরবচ্ছিন্ন, বহুমুখী প্রয়াস চালান তাতে একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সম্রাট হিসাবে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হতে হয়। বাস্তবিকই আকবর ছিলেন এক অসাধারণ সাম্রাজ্যবাদী পুরুষ। তাঁর সম্বন্ধে কৌটিল্যের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায় যে সার্থক সম্রাট তাঁকেই বলা চলে যিনি রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেন। আকবরের সাম্রাজ্যবাদী নীতি সফল হবার মূলে ছিল হিন্দুদের প্রতি উদার ও সহযোগিতাপূর্ণ মানসিকতা। মানসিংহ, বীরবল, টোডরমল প্রভৃতি বিশিষ্ট হিন্দুদের তিনি শুধু রাজপদই দেননি, তাঁদের উপর রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বও দিয়েছিলেন। আকবরের এই হিন্দুনীতি স্বল্পকালের মধ্যেই মোগল সাম্রাজ্যকে বিদেশী শাসন থেকে এক জাতীয় রাষ্ট্রে পরিবর্তিত করেছিল। মোগল রাজত্বে হিন্দুরা তাদের যোগ্যতা ও বংশগৌরবের জন্য সমাদর লাভ করবেন এটা ছিল অকল্পনীয়। তাই আকবরের ঔদার্যে মুগ্ধ হয়ে রাজপুতরা হয়ে দাঁড়াল মোগল শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। আকবরের সময় মোগল শাসন আর এদেশের মানুষের চোখে "বিদেশী ও বিজাতীয়" বলে মনে হয়নি।

আকবর হিন্দুদের শুধুমাত্র উচ্চপদ দান করেই তাঁর কাজ শেষ করেন নি। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর থেকে কুখ্যাত জিজিয়া করের বোঝা তুলে দিয়ে এবং নিজে অম্বররাজ বিহারীমলের কন্যাকে বিবাহ করে সেই ধর্মীয় সংকীর্ণতার যুগে আকবর যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে, একজন দূরদর্শী সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবে আকবরের পাশে এমনকি লর্ড ডালহৌসীর কৃতিত্বকেও নিষ্প্রভ বলে মনে হয়।

সম্রাট আকবর সব ধর্মের সার সংগ্রহ করে "দীন-ই-ইলাহি" নামে এক নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে এই ধর্ম আদৌ প্রসারলাভ করেনি। রাজদরবারের কিছু মানুষের মধ্যেই এর প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই ধর্ম আকবরকে অ-মুসলিম

প্রজাদের চোখে যথেষ্ট শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। হিন্দু প্রজারাও তাঁকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলে সম্বোধন করত। ফতেপুর-সিক্রিতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের স্বাধীনভাবে উপাসনা করার জন্য তিনি একটি 'ইবাদৎখানা' বা 'উপাসনা গৃহ' নির্মাণ করান। আকবর সকল ধর্মের মানুষের সাথে ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হতেন এবং শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা সহকারে তাঁদের সকলের বক্তব্য শুনতেন। একজন জেসুইট পর্যটক তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছেন যে তিনি মহতের কাছে মহৎ আবার ক্ষুদ্রের সামনে ক্ষুদ্র হয়ে যান।

আকবর বুঝেছিলেন যে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব এর শাসনব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। তাই রাজ্যজয়ের মাধ্যমে যে বিশাল সাম্রাজ্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাকে স্থায়ী করবার জন্য এক সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত শাসনব্যবস্থারও তিনি প্রবর্তন করেন যার মধ্যে আকবরের প্রতিভার বিশেষ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ফলে আকবর প্রবর্তিত শাসনকাঠামোর উপর মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে পরবর্তী আরও আড়াইশো বছর টিকে থাকা সম্ভব হয়। এদেশে ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে ইংরেজশাসকরা আকবরের শাসন পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা তাঁকেই বলা হয়। তাঁর মত এরকম বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সম্রাট বাস্তবিকই ইতিহাসে বিরল। শুধুমাত্র ভারতের ইতিহাসেই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও সম্রাট আকবর এক বিশিষ্ট স্থান লাভের অধিকারী।

আকবর দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৮০৬-১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বিতীয় শাহ আমলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আকবর ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল মসনদে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় আকবর পিতার মতই নামেমাত্র ভারত সম্রাট ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। তিনিও পিতার মতই ইংরাজদের আশ্রিত ও বৃত্তিভোগী হিসাবে তাদের ছত্রছায়ায় তাঁর বাদশাহী জীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আকবরের মৃত্যু হয়।



আখনাটন

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দী]

প্রাচীন যুগে মিশরের একজন ফারাও ছিলেন আখনাটন। তাঁর আসল নাম চতুর্থ আমেনোফিস। তিনি ছিলেন প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী এবং অতিরিক্তমাত্রায় ধর্মান্ধ। যদিও দীর্ঘকাল ধরে সূর্যদেবতা 'রা' ফারাওদের দেবতা হিসাবে পূজিত হয়ে আসছিলেন, আখনাটন এই দেবতা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে নতুন ধারণা প্রচার করে এঁকে এক বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মতে নতুন দেবতা 'আটন' হ'ল আলোক ও উত্তাপের উৎস এবং সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি এত ধর্মান্ধ ছিলেন যে এই দেবতা ছাড়া আর সব দেবতার উপাসনা নিষিদ্ধ করে দেন। থিবসের বিশিষ্ট দেবতা আমেনের প্রতি তাঁর বিদ্বেষভাব এতই প্রবল ছিল যে তিনি নিজের নাম পর্যন্ত পাল্টে ফেলেন।

এই 'হেরেটিক' ফারাও ১৩৬৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে থিবস থেকে রাজধানী সরিয়ে আনেন এবং নীলনদের উত্তরাংশে এক নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা ক'রে এর নামকরণ করেন 'আখেটাটন' (বর্তমান টেল-এল-আমার্না)। নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী শহরকে তিনি প্রাসাদ, উদ্যান, রাজপথ এবং সূর্যদেবতার মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে সুন্দর ও সুশোভিত করে তোলেন। খননকার্যের ফলে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আখনাটনের আমলের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষ ক'রে প্যাপিরাসে লেখা বহু চিঠিপত্রের সন্ধান মিলেছে যেগুলো তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে ধারণা করার পক্ষে একান্ত মূল্যবান।

এতদিন পর্যন্ত আমন ছিলেন মিশরীয়দের প্রধান দেবতা। আমনের মন্দির থেকে যা আয় হ'ত তা থেকে পুরোহিত সম্প্রদায় প্রভূত ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে উঠেছিলেন। এইসব পুরোহিত রাজনৈতিক দিক দিয়েও ফারাওদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতেন। আখনাটন আমনের উপাসনা নিষিদ্ধ করে দেওয়ায় পুরোহিত সম্প্রদায়ের

সাথে তাঁর তীব্র বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রাচীন মিশরে বহু দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। কিন্তু আখনাটনের নির্দেশে 'আটন' ছাড়া অন্যসব দেবতার মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হলে জনসাধারণও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রভাবশালী পুরোহিতগোষ্ঠী এই সুযোগ কাজে লাগান। ফলে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

শাসক হিসাবে আখনাটন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁর কার্যকলাপ প্রজাদের উপর কোনো অনুকূল প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাঁর পরবর্তী সময়ে মিশরের রাজধানী পুনরায় থিবসে রূপান্তরিত হয় এবং আমন ও অন্যান্য দেবতা স্ব স্ব মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন।

আজম শাহ

[শাসনকাল ১৩৮৯-১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দ]

সুলতান সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সামরিক এবং প্রশাসনিক দিক থেকে পিতা কিংবা পিতামহের মত যোগ্যতাসম্পন্ন না হলেও তৎকালীন সুলতানদের মধ্যে তিনি ছিলেন এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। আজম শাহের রাজত্বকাল সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা না গেলেও দুটি উপভোগ্য ঘটনার কথা জানা গেছে। একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় শাসক হিসাবে তিনি কতখানি ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং অপরটি তাঁর কবি প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। সিরাজের বিখ্যাত মুসলিম কবি হাফেজের সঙ্গে তাঁর পত্র বিনিময় হয়েছিল বলে জানা যায়। তাঁর আমলের রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে আজমের অহোম রাজার কামতা রাজ্য আক্রমণ উল্লেখযোগ্য। ফিরিস্তার লেখা থেকে জানা যায় সুলতান আজম জৌনপুরের শাসক খাজা জাহানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং হস্তী ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী উপহার হিসাবে প্রেরণ করেন। সমসাময়িক চৈনিক সম্রাটের সাথেও আজমের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং দূত বিমিনয় চলত। সমসাময়িক বিদেশী পর্যটক মাহুয়ানের বিবরণ থেকে আজম শাহের রাজত্বকালে বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে আজম শাহের মৃত্যু হয়।

আদিল শাহ

[শাসনকাল ১৪৮৯-১৫১০ খ্রীষ্টাব্দ]

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বিজাপুরের শাসক ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে বাহমনী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে বিজাপুরের শাসনকর্তা ইউসুফ আদিল শাহ বিজাপুরে একটি স্বাধীন সুলতানীর প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশকে আদিল শাহী বংশ বলা হয়ে থাকে। পরবর্তী দু'শ বছর দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে বিজাপুর তার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। আদিল শাহ একজন কর্তব্য পরায়ণ, প্রজাদরদী ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। একজন বিদ্যোৎসাহী সুলতান হিসাবেও তিনি সুনামের অধিকারী ছিলেন। আদিল শাহ পারস্য, তুর্কীস্থান, রুম প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ও শিল্পীকে তাঁর দরবারে নিয়ে আসেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁর বিশেষ ছিলনা এবং রাজকার্যে তিনি হিন্দুদেরও নিয়োগ করতেন। তাঁর আমলে বিজাপুর দুর্গটিকে প্রস্তর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল।

একুশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করার পর ইউসুফ আদিল শাহ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আদিল শাহ

[শাসনকাল ১৫৫৪-১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ]

শের শাহ প্রতিষ্ঠিত আফগান বংশের শেষ সুলতান। আদিল শাহের আসল নাম মুবারিজ খান। ইসলাম শাহের অকালমৃত্যু ঘটলে তাঁর নাবালক পুত্র ফিরোজ খানকে হত্যা করে তাঁর মাতুল মুবারিজ খান মহম্মদ আদিল শাহ নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন (১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)। আদিল শাহ ছিলেন একজন বিলাসী, অলস ও অকর্মণ্য শাসক। হিমু নামক একজন বিচক্ষণ হিন্দু তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং শাসনকার্য প্রকৃতপক্ষে তিনিই পরিচালনা করতেন। আদিল শাহের আমলে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং এই দুর্বলতার সুযোগে বাংলা ও মালব আফগান অধীনতা পাশ ছিন্ন করে। তাঁর আত্মীয়বর্গও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং সিংহাসন দাবি করতে থাকে। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর মোগল সিংহাসনে বসলে পাণিপথের প্রান্তরে এক ঐতিহাসিক যুদ্ধে (পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৫৫৬ খ্রীঃ) আদিল শাহের পরাজয় ঘটে। হিমু বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে আহত অবস্থায় বন্দী হন এবং পরে শত্রুহস্তে মৃত্যুবরণ করেন।

এই যুদ্ধ ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে ভারতে মোগল শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং আফগান শক্তির সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হবার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা চিরতরে বিনষ্ট হয়।

আবদুল হামিদ দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৮৭৬ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ]

তুরস্কের একজন স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। দ্বিতীয় আবদুল হামিদ চতুর্থ মুরাদের সিংহাসনচ্যুতির পর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সুলতান পদে অভিষিক্ত হন।

সম্পর্কে তিনি ছিলেন মুরাদের ভ্রাতা। দ্বিতীয় আবদুল হামিদের রাজত্বকাল ছিল তুরস্কের ইতিহাসের এক অন্ধকার পর্ব। সিংহাসনে আরোহণের সময় দ্বিতীয় হামিদ বিভিন্ন প্রকার শাসন সংস্কারের আশ্বাস দেন। কিন্তু তুর্ক-রুশ যুদ্ধের পর থেকে তিনি চূড়ান্ত স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেন।

হামিদ ছিলেন একজন ধুরন্ধর ও দৃঢ়চেতা সুলতান। তিনি দেশের অভ্যন্তরে সকল প্রকার উদারনৈতিক ভাবধারার কণ্ঠরোধ ক'রে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে চূড়ান্ত স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। তিনি রাষ্ট্রশাসনের সকল ক্ষমতা নিজের হাতে নেন এবং নির্মমভাবে সকল প্রকার প্রগতিশীল ভাবধারা দমন করতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতঃই তুরস্ক এক 'পুলিশী' রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং কুশাসন ও অত্যাচারে প্রজাসাধারণের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। হামিদ বলকান অঞ্চলের খ্রীষ্টান প্রজাদের নিষ্ঠুরভাবে উচ্ছেদ শুরু করলে ঐ এলাকায় এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয় রাশিয়া এই সুযোগে বলকান অঞ্চলে স্বীয় প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। হামিদ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে জয়লাভ করেন। পরের বছর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জনগণের দাবির কাছে নতিস্বীকার ক'রে এক নতুন সংবিধান কার্যকরী করার আশ্বাস দেন। এ ছাড়া তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সকল প্রজার সমানাধিকার স্বীকার করে নেন। সংবাদপত্রের উপর থেকে সব ধরনের নিয়ন্ত্রণাদেশও তিনি প্রত্যাহার করেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই আবদুল হামিদ পুনরায় স্বৈরাচারী ও দমনমূলক শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে সচেষ্ট হন।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই তুরস্কের অভ্যন্তরে হামিদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রবলাকার ধারণ করতে থাকে। এই সময় তরুণ তুর্কী দল তুরস্কে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই দল ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এক সুসংগঠিত বিপ্লবের মাধ্যমে দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তাঁর ভাই পঞ্চম মহম্মদকে তুরস্কের সুলতান হিসাবে স্বীকৃতি জানায়।

আবুবকর

[শাসনকাল ৬৩২-৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ]

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর মুসলিম জগতের নেতৃত্বপদ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। মহম্মদ তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। মহম্মদের অধিকাংশ অনুচর তাঁর শ্বশুর ও বয়সে প্রবীণ ব্যক্তি আবুবকরকে নেতা হিসাবে নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু মহম্মদের অপর একদল সমর্থক আবুবকরের নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। শেষ পর্যন্ত বেশি সমর্থন পেয়ে আবুবকর খলিফা মনোনীত হন। মুসলিম

জগতের ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক গুরুকে বলা হত খলিফা। তিনি ছিলেন মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রধান পুরুষ।

আবুবকর মাত্র দু'বছর খলিফাপদে থাকার সুযোগ পান। বৃদ্ধ বয়সে তিনি এই পদ লাভ করেন (৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং মাত্র দুবছর পর ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তিনি একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ধার্মিক জীবন যাপন করতেন। তাঁর সময়ে মুসলিম সৈন্যবাহিনী মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়া জয় করেছিল। এই জয়ের সুবাদে সিরিয়ার বহু মানুষকে ইসলামধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়।

আমহার্স্ট

[শাসনকাল ১৮২৩-১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ]

অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল অ্যাডামের স্থলাভিষিক্ত হয়ে লর্ড আমহার্স্ট ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর কার্যকাল মোট পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল। লর্ড আমহার্স্টের আমলে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ শুরু হয় (১৮২৪—১৮২৬ খ্রীঃ)। যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে ইংরাজরা ইয়ান্দাবু'র সন্ধির মাধ্যমে তেনাসেরিম, আরাকান প্রদেশ ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করে। বিলাতীয় কর্তৃপক্ষ খুশি হয়ে আমহার্স্টকে 'আর্ল অব আরাকান' খেতাব দ্বারা সম্মানিত করে। এছাড়া বাংলার পূর্ব সীমান্তবর্তী আসাম, মণিপুর, কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চলও একে একে ইংরাজ কোম্পানীর অধীনে আসে। লর্ড আমহার্স্ট ভরতপুরের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ নিয়ে অন্যায়ভাবে রাজ্যটি দখল করেন। আমহার্স্টের আমলে ব্যারাকপুরে এক সিপাহী বিদ্রোহ ঘটলে এই বিদ্রোহ অত্যন্ত নির্মমভাবে দমন করা হয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্ট পদত্যাগ করলে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক তাঁর স্থান গ্রহণ করেন।

আরম শাহ

[শাসনকাল ১২১০-১২১১ খ্রীষ্টাব্দ]

দাস বংশের একজন শাসক। আরম শাহ ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম মুসলমান শাসক কুতুবউদ্দিন আইবকের মৃত্যুর পর দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন। আরম শাহ লাহোরের প্রভাবশালী আমীর ও মালিকদের সহায়তায় সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল আরম বক্স। তিনি সুলতান আরম শাহ নামধারণ করে সিংহাসনে বসেন। কুতুবউদ্দিনের সাথে আরম শাহের কি সম্পর্ক ছিল

তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে এবং সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আসা আজও সম্ভব হয়নি। ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁকে কুতুবউদ্দিনের ভাই বলে অভিহিত করেছেন, কেউ কেউ পুত্র বলে অভিহিত করেছেন অথচ সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজের লেখা থেকে এটা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে কুতুবের তিনটি কন্যা ছিল, কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। আবার একজন আধুনিক লেখক এমন মন্তব্যও করেছেন যে কুতুবউদ্দিনের সাথে আরম শাহের কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না।

আরম ছিলেন একজন দুর্বল ও অযোগ্য ব্যক্তি। সিংহাসনে বসার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। সুতরাং কুতুবউদ্দিনের আকস্মিক মৃত্যুতে যে ফাঁক সৃষ্টি হয়েছিল তা পূর্ণ করা ছিল তাঁর সাধ্যাতীত। তাঁর সিংহাসনে বসার কিছুদিনের মধ্যেই নব প্রতিষ্ঠিত মুসলমান রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে এবং পরিস্থিতি উত্তরোত্তর জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লীর অভিজাতগণ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং বদায়ুনের শাসক শ্যামসুদ্দিন ইলতুৎমিসকে দিল্লীর সিংহাসনে বসার অনুরোধ জানায়। ইলতুৎমিস তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিলে আরম শাহের এক বছরেরও অনূর্দ্ধকাল স্থায়ী দুর্বল শাসনের অবসান ঘটে।

আর্কিলাস

[শাসনকাল ৪১৩-৩৯৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন ম্যাসিডনের একজন রাজা ছিলেন। আর্কিলাস ৪১৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর সময় থেকেই ম্যাসিডোনিয়ার উত্থান শুরু হয়। তিনি তাঁর রাজ্যকে গ্রীক সভ্যতার আলোকে আলোকিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। আর্কিলাস তাঁর রাজপ্রাসাদে বহু জ্ঞানী ব্যক্তিকে আহ্বান ক'রে তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। মূলতঃ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর রাজধানী পেল্লা কবি ও শিল্পীদের প্রধান আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে এবং অল্পকালের মধ্যে স্থানটির খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আর্কিলাস চোদ্দ বছর রাজত্ব করার পর ৩৯৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আততায়ী হস্তে নিহত হন।

আর্থার

[শাসনকাল পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দী]

আর্থার পঞ্চম শতাব্দীর শেষ অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রাচীন ব্রিটনদের রাজা ছিলেন। তিনি ঠিক কত বছর রাজত্ব করেছিলেন তা জানা যায়নি এবং উপযুক্ত ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে তাঁর জীবনকাহিনী আজও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। তিনি

স্যাক্সন জাতির পুনঃ পুনঃ আক্রমণ থেকে ব্রিটেনকে রক্ষা করার জন্য বহু যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে জানা যায় এবং তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ববলে ব্রিটনগণ নাকি ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মাউন্ট ব্যাডোন নামক স্থানে এক তীব্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্যাক্সনদের পরাজিত করতে সমর্থ হয়। আর্থারের জয়গৌরব ও বীরত্বের কাহিনী ব্রিটনদের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। পরবর্তীকালে রাজা আর্থার ইংরেজী, ফরাসী ও আরও কিছু কিছু ইউরোপীয় সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান লাভ করেন এবং মধ্যযুগের 'ট্রুব্যাডুর' বা চারণ-কবিরা তাঁর বীরত্ব ও নানা অলৌকিক কীর্তিকাহিনীকে বিষয়বস্তু করে গান রচনা করতেন। এইভাবে তাঁকে নিয়ে ক্রমশঃ অজস্র গল্প-কিংবদন্তী-উপাখ্যান প্রভৃতি গড়ে ওঠে।

রাজা আর্থারের জীবনকে কেন্দ্র ক'রে ইংরাজ কবি লর্ড টেনিসন তাঁর বিখ্যাত 'ইডিল্‌স্ অব দি কিং' রচনা করেন।

আলপ্তগীন

[শাসনকাল ৯৬২-৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ]

আলপ্তগীন ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর শাসক হন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আরব খলিফাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পারসীক, তুর্কী, কুর্দ প্রভৃতি অঞ্চলের শাসকরা বিভিন্ন স্থানে স্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করে। আলপ্তগীন এই ধরনের একজন দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গজনীতে একটি স্বাধীন সুলতানীর প্রতিষ্ঠা ক'রে সেখানকার শাসক হয়ে বসেন। গজনী শহরের প্রতিষ্ঠাতা তাঁকেই বলা হয়। ঐ এলাকায় সামানিডদের অধীনস্থ গভর্ণর ছিলেন তাঁর পিতা।

আলপ্তগীন বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেননি। মাত্র একবছর রাজত্ব করার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।



আলফ্রেড দি গ্রেট

[শাসনকাল ৮৭১-৯০০ খ্রীষ্টাব্দ]

আলফ্রেড দি গ্রেট বা মহামতি আলফ্রেড ৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা হন এবং প্রায় তিরিশ বছর রাজত্ব করেন। ডেন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম

তাঁর রাজত্বকালের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আলফ্রেড এথেনডানের যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে ডেনদের সাথে ওয়েডমোরের শান্তিচুক্তি স্থাপন করেন। এই চুক্তির ফলে ডেনদের ঘন ঘন আক্রমণ থেকে ইংলণ্ড রক্ষা পায়। ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে আলফ্রেড সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করেন এবং এক শক্তিশালী নৌবহর নির্মাণে প্রয়াসী হন।

আলফ্রেড শুধুমাত্র তাঁর সামরিক কৃতিত্বের জন্যই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করেননি, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নানাপ্রকার প্রজাদরদী, জনহিতকর শাসন সংস্কারের জন্য তিনি 'গ্রেট' বা 'মহান' আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন। আলফ্রেড যথার্থই একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন এবং দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সম্ভবতঃ ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বাহান্ন বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

আলমগীর দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৭৫৪-১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ]

আহমদ শাহের পরবর্তী শাসক হিসাবে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সিংহাসনে বসেন জাহান্দার শাহের পুত্র আজিজউদ্দিন। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তিনি কারাগারে ছিলেন। 'সম্রাট সৃষ্টিকারী' গাজীউদ্দিন নিজাম-উল-মুলক-এর সমর্থনপুষ্ট হয়ে তিনি দ্বিতীয় আলমগীর নাম ধারণ করে সম্রাট হন। নতুন সম্রাট সহজেই নিজাম-উল-মুলক-এর হাতের পুতুলে পরিণত হন। তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু ছিলনা, সবকিছুই চলত নিজামের নির্দেশমত। দ্বিতীয় আলমগীর নামেই শাসক হয়ে থাকেন। ক্রমে এই অবস্থা অসহ্য হয়ে ওঠায় তিনি তাঁর প্রবল প্রতাপশালী উজীর নিজামের প্রভাবমুক্ত হবার প্রচেষ্টা চালান, কিন্তু তার পরিণতি হয় মৃত্যু। নিজামের আদেশে তাঁকে হত্যা করা হলে (১৭৫৯ খ্রীঃ) দ্বিতীয় আলমগীরের পাঁচ বছর স্থায়ী দুঃখময় রাজত্বকালের অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বকালেই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে ইংরাজ শক্তি ভারতে তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে।

আলম শাহ

[শাসনকাল ১৪৪৫-১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দ]

মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীর ওমরাহরা তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন আলম শাহকে সিংহাসনে বসান। আলম শাহ ছিলেন সৈয়দ বংশের শেষ শাসক। তাঁর আমলে

সৈয়দ শাসন দিল্লী ও তার চতুঃপার্শ্বস্থ কয়েকটি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। পতনোন্মুখ সৈয়দ শাসনকে পুনরায় শক্তিশালী করার জন্য সেই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছিল একজন শক্তিশালী শাসকের। কিন্তু আলম শাহ ছিলেন দুর্বল ও অপদার্থ। তিনি পিতার চেয়েও বেশি অযোগ্য ছিলেন। আলম শাহ ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাহলুল লোদীকে দিল্লীর সিংহাসনের কর্তৃত্বভার অর্পণ করে তাঁর প্রিয় জায়গা বদায়ুনে ফিরে যান এবং অবশিষ্ট জীবন লঘু আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করেন।



আলাউদ্দীন খলজী

[শাসনকাল ১২৯৬-১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দ]

খলজী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন। শুধু খলজী বংশ কেন, মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসাবে তাঁকে অভিহিত করা চলে। আলাউদ্দিন তাঁর খুল্লতাত বৃদ্ধ জালালউদ্দিনকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। একজন অসাধারণ সাম্রাজ্যজয়ী বীর এবং শাসক হিসাবে আলাউদ্দিন যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র মোটেই ভাল ছিল না। তিনি ছিলেন স্বার্থপর, নির্দয়, নীতিহীন এবং অত্যন্ত কুটিল স্বভাবের মানুষ। আলাউদ্দিন ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মোট কুড়ি বছর রাজত্ব করেন।

আলাউদ্দিনের রাজত্বকাল সাম্রাজ্য বিস্তার এবং নানা প্রকার শাসন সংস্কারের জন্য ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। আলাউদ্দিন সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে বহু সামরিক অভিযান পরিচালনা করে সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অধীশ্বর হন। সিংহাসনে বসার কিছুকাল পরই আলাউদ্দিনের সৈন্যবাহিনী উলুগ খাঁ ও নসরৎ খাঁর নেতৃত্বে গুজরাট আক্রমণ করে রাজা কর্ণদেবকে পরাজিত করে। মুসলমানদের হস্তে রানী কমলাদেবী বন্দী হন। তারপর আলাউদ্দিন রনথম্ভোর, চিতোর, মালব, মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, ধারা, চান্দেরী প্রভৃতি স্থান জয় করে ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত তার শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। আলাউদ্দিনের চিতোর অভিযান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে কারণ চিতোরের রাণা রতনসিংহের অসামান্য রূপসী রাণী পদ্মিনী

ও আলাউদ্দিনকে কেন্দ্র করে নানা উপকথা-উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ ভারত অভিযানে নেতৃত্ব দেন আলাউদ্দিনের প্রিয় অনুচর ও সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি মালিক কাফুর। মালিক কাফুর এক বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অভিযান চালিয়ে একে একে দেবগিরি, ওয়ারঙ্গল, হোয়সল ও পাণ্ড্যরাজ্য অধিকার করে নেন। ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন ভারতবর্ষের উত্তরাংশ থেকে সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি। তাই তাঁর মৃত্যুর পর দুর্বল ও অযোগ্য বংশধরের আমলে খলজী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অতি দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করা ছিল আলাউদ্দিনের রাজত্বকালের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইলতুৎমিসের সময় থেকে ভারতবর্ষে মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময় ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে তা চরমে ওঠে। দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতারা এই সময় বারবার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু আলাউদ্দিন অসামান্য সাহস, বীরত্ব ও কৌশলে যুদ্ধ পরিচালনার সাহায্যে প্রতিবারই মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম হন। উপরন্তু তিনি যুদ্ধবন্দী মোঙ্গলদের উপর এমন নৃশংস অত্যাচার চালান যাতে ভবিষ্যতে তারা আর ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে সাহসী না হয়। আলাউদ্দিনের পরবর্তীকালে মোঙ্গল আক্রমণ সম্পূর্ণ স্তব্ধ না হলেও এই আক্রমণের তীব্রতা অনেক হ্রাস পায়। আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন বিরাট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে সেই মধ্যযুগের পরিস্থিতি অনুযায়ী বিচার করলে তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কারগুলো এবং বাজারে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর মুদ্রামূল্য নিয়ন্ত্রণ তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় বহন করে। অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকার দরুণ আলাউদ্দিনকে বাধ্য হয়ে এইসব সংস্কারের মাধ্যমে ব্যয়সংকোচ করতে হয়েছিল। তা না হলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

আলাউদ্দিন ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহ

[শাসনকাল ১৫৩২-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে বাংলায় হুসেন শাহ প্রতিষ্ঠিত বংশের তৃতীয় সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহ। নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরুজ ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে বসেন। দুঃখের বিষয় তাঁর স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশেষ

জানা যায়না। বিছু মুদ্রা ও কালনায় প্রাপ্ত একটি শিলালেখ থেকে তাঁর রাজত্বকালের যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। আলাউদ্দিনের স্বল্পমেয়াদী রাজত্বকাল বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যানুশীলনের জন্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বিদ্যোৎসাহী শাসক ছিলেন এবং অল্পবয়স থেকেই তাঁর মধ্যে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। মূলতঃ তাঁরই উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবি শ্রীধর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন।

মাত্র একবছর রাজত্ব করার পর ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফিরুজের পদচ্যুতি ও অকালমৃত্যু একটি সম্ভাবনাপূর্ণ রাজত্বের অবসান ঘটায়।

আলাউদ্দিন শাহ দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৪৩৫-১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দ]

পঞ্চদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত বাহমনী রাজ্যের শাসক ছিলেন। দ্বিতীয় আলাউদ্দিন শাহ পিতা আহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনী রাজ্যের সুলতান হন এবং বাইশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের সাথে তিনি এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তিনি ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিজয়নগর রাজ্য আক্রমণ করলে বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায় তাঁর হাতে পরাজয় বরণ করেন এবং সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হন। সন্ধির শর্তস্বরূপ দ্বিতীয় দেবরায় আলাউদ্দিন শাহকে বাৎসরিক করপ্রদানে প্রতিশ্রুতিবন্ধ হন। বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্যলাভ দ্বিতীয় আলাউদ্দিন শাহের রাজত্বকালের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

আলি

[শাসনকাল ৬৫৬-৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ]

মুসলিম দুনিয়ার তৃতীয় খলিফা ওসমানের মৃত্যুর পর ৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদের পোষ্যপুত্র ও জামাতা আলি খলিফার পদ লাভ করেন। কিন্তু আলি বেশিদিন স্বস্তিতে তাঁর ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারেননি। কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে একদল মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং তাঁর নেতৃত্বপদ মানতে অস্বীকৃত হয়। এই সময় সিরিয়ার শাসনকর্তা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হন এবং আলির মনোনয়নকে অবৈধ ও অযৌক্তিক বলে ঘোষণা করেন। ইসলাম ধর্মের সমর্থকদের মধ্যে এক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে আলি শত্রু হস্তে নিহত হন (৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ)। আলির মৃত্যুর সাথে সাথে খলিফার পদকে সর্বসম্মতিক্রমে বংশানুক্রমিক বলে ঘোষণা করা হয়।

আলিবর্দী খান

[শাসনকাল ১৭৪০-১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ]

আরবদেশীয় মুসলমান আলিবর্দী খানের নাম ছিল মির্জা বন্দে বা মির্জা মহম্মদ আলি। মধ্যযুগের বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার তিনি ছিলেন মাতামহ। উচ্চাশাপ্রবণ আলিবর্দী অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে ধাপে ধাপে ক্ষমতার শীর্ষে উঠেছিলেন। মুর্শীদকুলি খানের পরবর্তী নবাব সুজা উদ্দিনের আমলে আলিবর্দী খান ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আমেদ সরকারী পদে আসীন হন। সুজাউদ্দিনের আমলেই আলিবর্দী বিহারের বিদ্রোহী জমিদারদের শায়েস্তা করে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। আলিবর্দী মোট ষোল বছর রাজত্ব করেন। সিংহাসনে বসার পূর্বে তিনি বাংলার নবাব সরফরাজ খানের অধীনে বিহারের প্রাদেশিক শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সরফরাজের দুর্বল শাসনে বাংলায় আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দিলে চতুর আলিবর্দী গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে (৯ই এপ্রিল, ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলার সিংহাসন অধিকার করে বসেন।

আলিবর্দী একজন দৃঢ়চেতা ও দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ হন। তাঁর আমলে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বাংলার আভ্যন্তরীণ উন্নতি যে অনেকাংশে দেশের বহির্বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল একথা হৃদয়ঙ্গম ক'রে আলিবর্দী বিদেশী বণিকদের বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেন। স্ক্রাফটন নামক একজন লেখক মন্তব্য করেছেন যে আলিবর্দী ইউরোপীয় বণিকদের মৌচাকের সাথে তুলনা দিয়ে বলতেন এদের মধু থেকে লাভবান হওয়া যায়, তবে মৌচাকে খোঁচা মারলেই বিপদ—তারা হুল বিঁধিয়ে শেষ করে ফেলবে। ইউরোপীয় কোম্পানীগুলোর আচরণ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের কোনোরকম বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করতেন না। তিনি ইংরাজ ও ফরাসীদের কলিকাতা ও চন্দননগরে দুর্গ নির্মাণ করতে দেননি।

মারাঠাদের পুনঃ পুনঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ (১৭৪২-৫১ খ্রীষ্টাব্দ) আলিবর্দীর রাজত্বকালের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বর্গী হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে আলিবর্দীকে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেই সময় তিনি ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেছিলেন। ঘন ঘন মারাঠা আক্রমণে বিব্রত আলিবর্দী শেষ পর্যন্ত ১৭৫১ সালে এক সন্ধির মাধ্যমে এই প্রবল প্রতিপক্ষের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। উড়িষ্যা প্রদেশ সমর্পণ করে তাঁকে এই সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করতে

হলেও বর্গী হামলা মোকাবিলায় আলিবর্দী তাঁর যোগ্যতার পরিচয় রেখেছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল কোন শাসক বাংলার সিংহাসনে থাকলে এর স্বাধীন অস্তিত্ব বিপন্ন হত।

আলিবর্দীর স্বপক্ষে অন্তত এইটুকু বলা চলে যে তিনি মোটামুটিভাবে শক্ত হাতে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ইংরাজ কোম্পানী বেশি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে সাহস করেনি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনে আরোহণের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আকার ধারণ করে।

আলিবর্দী খান ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।



আলেকজাণ্ডার প্রথম

[শাসনকাল ১৮০১-১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাশিয়ার জার বা সম্রাট ছিলেন। তিনি মোট পঁচিশ বছর রাজত্ব করেন। পিতা পল আততায়ী হস্তে নিহত হ'লে প্রথম আলেকজান্ডার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। হৃদয়বান, বাস্তবজ্ঞানহীন, অস্থিরচিত্ত, কল্পনাবিলাসী ও আদর্শবাদী প্রথম জার সহজেই অন্যের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হতেন। বিশাল বপুযুক্ত আলেকজান্ডার ছিলেন সমসাময়িক ব্যক্তিদের চোখে এক মস্ত প্রহেলিকা। মেটারনিক তাঁকে একজন উপহাসযোগ্য উন্মাদ ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মধ্যে একাধারে উদারনৈতিক ভাবধারা ও চরম স্বৈরাচারী মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টান ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শের প্রতি তিনি গভীরভাবে অনুরাগী ছিলেন; সেইসঙ্গে আবার সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধাও তাঁর মধ্যে কোনো অংশে কম ছিলনা।

প্রথম আলেকজান্ডারের রাজত্বকাল ছিল ঘটনাবহুল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের সময় তাঁর আভ্যন্তরীণ শাসন-সংস্কারের প্রবণতা দেখে মনে হতে পারে তিনি ছিলেন সমসাময়িক ইউরোপীয় রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে সবচেয়ে উদারপন্থী। তিনি রাশিয়ায় বহু

উদারনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি বিদেশ ভ্রমণের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন এবং বিদেশী পুস্তক রাশিয়ায় প্রবেশের অনুমতি দেন। তিনি শাসন কাঠামোর বিভিন্ন স্তর থেকে দুর্নীতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি কারাগার,হাসপাতাল প্রভৃতির উন্নতিসাধন করেন, বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং মস্কো, ভিল্না প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরও উন্নত করতে প্রয়াসী হন। সেণ্ট পিটার্সবার্গ, কাজান প্রভৃতি শহরে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ও তিনি স্থাপন করেন। তিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা নেন এবং সার্ফ প্রথার উচ্ছেদ সাধনের কথাও চিন্তা করেন। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল বিবেচনা ক'রে তাঁকে এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়। সার্ফপ্রথা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে না পারলেও তিনি সার্ফদের অবস্থার উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেন। আলেকজাণ্ডার বেশ কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনেও সচেষ্ট হন এবং পোল্যাণ্ড ও ফিন্ল্যাণ্ডের জন্য সংবিধানের ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে আলেকজাণ্ডারের উদার মনোবৃত্তি উবে যেতে থাকে। মেটারনিকের প্রভাবে পড়ে শেষ পর্যন্ত তিনি চূড়ান্ত স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন। এদিকে আবার পাদ্রীদের প্রভাবে পড়ে তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে পড়েন এবং নিজেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র মাত্র মনে করতে থাকেন। তিনি দেশবাসীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে রীতিমত স্বৈরাচারী মনোভাব প্রদর্শন করেন এবং পোলিশদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে পোলিশ সংবিধানের পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পোলিশ জনগণের অনেক অধিকারকে সঙ্কুচিত করেন।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে প্রথম আলেকজাণ্ডার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাশিয়াকে ইউরোপের এক অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রে পরিণত করেন। বিশেষ ক'রে রাশিয়া অভিযানে নেপোলিয়নের শোচনীয় ব্যর্থতার পর সমগ্র ইউরোপে তাঁর মান-মর্যাদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। সিংহাসনে বসার পর কয়েক বছর তিনি বৈদেশিক ব্যাপারে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন ক'রে চলেন। কিন্তু ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে গঠিত তৃতীয় শক্তিজোটে যোগদান করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সাথে যুগ্মভাবে ফ্রিডল্যাণ্ডের যুদ্ধে নেপোলিয়নের হস্তে পরাজিত হয়ে তিনি শক্তিজোট পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং নেপোলিয়নের সাথে টিলজিটের সন্ধিস্বাক্ষর করেন (১৮০৭)। কিন্তু পরবর্তীকালে নেপোলিয়নের 'কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম' বা 'মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা'কে কেন্দ্র করে জার এই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করায় নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন। মস্কো অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় নেপোলিয়নের পতনের পথ অনেকখানি প্রস্তুত হয়। নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা

সম্মেলনে প্রথম আলেকজাণ্ডার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ভিয়েনা সম্মেলনের পর তিনি ইউরোপের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে খ্রীষ্টীয় আদর্শের ভিত্তিতে 'হোলি এ্যালায়েন্স' বা 'পবিত্রমৈত্রীসংঘ' স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তা স্থায়ীত্বলাভ করেনি। জার 'কনসার্ট অব্ ইউরোপ' বা 'ইউরোপীয় শক্তি সমবায়'তেও যোগদান করেছিলেন। কিন্তু মেটারনিকের প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অতিরিক্ত আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তিনি ইউরোপবাসীর চোখে তাঁর পূর্ব মর্যাদা অনেকখানি হারিয়ে ফেলেন।

জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আলেকজাণ্ডার দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৮৫৫-১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ]

জার প্রথম নিকোলাসের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার জার বা সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন (১৮৫৫ খ্রীঃ)। তিনি উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং রাশিয়াকে দ্রুত আধুনিক রাষ্ট্রে পরিবর্তিত করার জন্য বহু শাসন সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি সংবাদপত্রের উপর 'নিয়ন্ত্রণ' উঠিয়ে দেন এবং প্রথম নিকোলাসের আমলের 'জনস্বার্থবিরোধী, কঠোর দমনমূলক আইনগুলো অনেক শিথিল করেন। বেশ কিছু পীড়নমূলক ব্যবস্থার তিনি উচ্ছেদ ঘটান এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে উৎসাহ দেখান। তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটান এবং জেমেষ্টভো বা প্রাদেশিক সভাগুলোর হাতে জনকল্যাণমূলক নানা কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বিচার ব্যবস্থায়ও নানা রদবদল ঘটান, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে প্রয়াসী হন এবং রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হল সার্ফ বা ভূমিদাসপ্রথার অবলোপ সাধন (১৮৬১ খ্রীঃ)। এই কাজের মাধ্যমে তিনি "মুক্তিদাতা জার" (জার দি লিবারেটর) উপাধি লাভ করেন।

কিন্তু দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সংস্কারগুলো শেষ পর্যন্ত খুব তেমন সফল হতে পারেনি। তাঁর কারণ তিনি তাঁর স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে পুরোপুরি বজায় রেখে এইসব সংস্কার প্রবর্তন করায় এগুলো বাস্তবক্ষেত্রে অকার্যকর ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কোনো প্রকার গণতান্ত্রিক ভাবধারা যাতে রাশিয়ায় প্রবেশ না করে সেদিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসনের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠলে তিনি দমন নীতির আশ্রয় নেন।

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকালে পোল বিদ্রোহ (১৮৬৩ খ্রীঃ) ছিল এক

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি অবলম্বন ক'রে দূরপ্রাচ্যে মঙ্গোলিয়া এবং মধ্য এশিয়ায় খিভা, বোখারা, সমরখন্দ, তাসখন্দ প্রভৃতি অঞ্চল রুশ অধিকারভুক্ত করেন।

নিহিলিষ্ট দলের আক্রমণের শিকার হয়ে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট পিটার্সবার্গের রাস্তায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

আলেকজাণ্ডার তৃতীয়

[শাসনকাল ১৮৮১-১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ]

পিতা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকাল তের বছর স্থায়ী হয়েছিল। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ছিলেন অত্যন্ত উগ্র ও সংকীর্ণ প্রকৃতির মানুষ। তিনি চূড়ান্ত স্বৈরাচারী ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করার পরই সব ক্ষমতা নিজের কুক্ষিগত করার প্রয়াস চালান। পিতার আমলের উদারনৈতিক সংস্কারগুলো তিনি বাতিল করেন। তাঁর আমলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রদ করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে কোনোরকম প্রগতিশীল ভাবধারা প্রচারিত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ভূমিদাস প্রথাকে পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টাও চালান। তিনি কঠোর পুলিশী ব্যবস্থা প্রবর্তন ক'রে সাময়িকভাবে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপনে সক্ষম হন। তাঁর আমলে রাশিয়ায় শিল্প-বাণিজ্যের বেশ উন্নতি ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ফ্রান্সের সাথে এক সামরিক চুক্তি সম্পাদন করেন।

জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।



আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট

[৩৩৬—৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ]

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে প্রাচীন গ্রীসের রাজা ছিলেন। আলেকজাণ্ডারকে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী বীরদের একজন হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বিশ্বের

বিভিন্ন প্রান্তে তিনি তাঁর সফল বিজয় অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ইতিহাস 'বিশ্ববিজয়ী' এবং 'গ্রেট' বা 'মহান' আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন।

আলেকজাণ্ডার ৩৫৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। লিওনিডাস হলেন তাঁর প্রথম শিক্ষাগুরু যিনি তাঁকে স্পার্টার প্রথায় কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা অর্জনের শিক্ষা দেন। আর একটু পরিণত বয়সে বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল হন তাঁর গৃহশিক্ষক। আঠারো বছর বয়সে জীবনের প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণ ক'রে আলেকজাণ্ডার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পিতা দ্বিতীয় ফিলিপের মৃত্যুর পর মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি উত্তর গ্রীসের এক ক্ষুদ্র রাজ্য ম্যাসিডনের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁর তের বছর স্থায়ী রাজত্বকালের মধ্যে ম্যাসিডোনিয়াকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করতে সক্ষম হন। অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী আলেকজাণ্ডারকে কেন্দ্র করে একান্ত স্বাভাবিকভাবেই অনেক কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে এবং প্রাচীন গ্রীসের মানুষ যথার্থই বিশ্বাস করত যে আলেক-জাণ্ডারের পক্ষে এই দিগ্বিজয় সম্ভব হয়েছিল কারণ তিনি ছিলেন দেবতাদের আশীর্বাদধন্য।

অল্পবয়স থেকেই আলেকজাণ্ডার ছিলেন উচ্চাশাপ্রবণ। তিনি হোমার বর্ণিত ট্রোজান যুদ্ধের বীর নায়ক অ্যাকিলিসের বীরত্ব ও খ্যাতিকেও ম্লান করে দেবার স্বপ্ন দেখতেন। সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথেই তাঁকে প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ম্যাসিডন রাজ্যটি ক্ষুদ্র হলেও গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চল ছিল ফিলিপের প্রভাবাধীন। ফিলিপের মৃত্যু সংবাদে উৎসাহিত হয়ে তাঁর অধীনস্থ রাজ্যগুলো ম্যাসিডনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এথেন্সে এই বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয়ে ইলিরিয়া, থ্রেস, থিবস প্রভৃতি স্থানে দ্রুত প্রসারলাভ করে। তরুণ আলেকজাণ্ডার দৃঢ় হস্তে অত্যন্ত সফলভাবে এইসব বিদ্রোহ দমন করেন।

সমগ্র গ্রীসকে অধীনস্থ করার পর আলেকজাণ্ডার বিশ্ববিজয়ে বার হন। তিনি তাঁর সুশিক্ষিত, বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ৩৩৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে হেলেসপণ্ট অতিক্রম করেন। পারসীক সৈন্যদের যুদ্ধে পরাজিত ক'রে তিনি একে একে সার্ডিস, ইফেসাস, মিলিটাস, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থানের উপর স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ফ্রিজিয়ার গর্ডিয়াম নামক স্থানে পৌঁছে তিনি বিখ্যাত 'গর্ডিয়ান নট' ছিন্ন করেন। প্রাচীনকালে এরকম একটা জনশ্রুতি ছিল যে যিনি 'গর্ডিয়ান নট'কে বিযুক্ত করতে পারবেন তিনি সমগ্র এশিয়ার অধীশ্বর হবেন। একমাত্র আলেকজাণ্ডারই তাঁর তরবারির সাহায্যে এই 'নট' কাটতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতঃপর আলেকজাণ্ডার পারস্যরাজ তৃতীয় দরায়ুসের সঙ্গে ইসাস নদীর তীরে এক সম্মুখ সমরে লিপ্ত হন। দরায়ুস পরাজিত হয়ে রাজধানী

ছেড়ে পলায়ন করেন। তাঁর স্ত্রী, মাতা ও পরিবারের অন্যান্য লোকজন আলেকজাণ্ডারের হাতে বন্দী হন। আলেকজাণ্ডার এঁদের প্রতি শোভন ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার প্রদর্শন করেন। দরায়ুস সন্ধির প্রস্তাব করলে আলেকজাণ্ডার তা প্রত্যাখ্যান করেন। দরায়ুসকে পরাজিত করে আলেকজাণ্ডার সিরিয়া ও প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থান মিশর জয় করেন। এই সময় আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি নীলনদের তীরে তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে জ্ঞানচর্চা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এক অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

আলেকজাণ্ডার ৩৩১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মিশর থেকে ব্যাবিলনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে পারস্যরাজ দরায়ুসের সাথে পুনরায় তাঁর যুদ্ধ হয়। আরবেলার যুদ্ধ নামে পরিচিত এই যুদ্ধেও তিনি দরায়ুসের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন। এই জয়লাভের ফলে পারসীক রাজার সুরম্য প্রাসাদ ও রাজধানী শহর ছাড়াও এশিয়ার এক সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আলেকজাণ্ডারের অধিকারে আসে কারণ এশিয়ার এক বিশাল অংশ জুড়ে সেই সময় পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং পারস্য সম্রাট ছিলেন এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। আলেকজাণ্ডার পারস্যের অন্তর্গত ব্যাবিলন, সুসা, পার্সেপোলিস, ইকবাটানা প্রভৃতি স্থান জয় করেন এবং দরায়ুসের অগাধ সম্পত্তি ও ধন-দৌলতের অধিকারী হন। দরায়ুস পলাতক অবস্থায় তাঁরই অধীনস্থ ব্যাকট্রিয়ার প্রাদেশিক শাসক বেসাসের হস্তে নিহত হলে আলেকজাণ্ডার ব্যাকট্রিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন এবং বেসাসকে হত্যা করেন। তিনি জাক্সার্টেস অতিক্রম ক'রে সিথিয়ানদের পরাস্ত করেন এবং সোগডিয়ানা (বর্তমান সমরখন্দ) জয় করেন। বিজিত দেশগুলোতে বেশ কিছু শহর স্থাপন করে তিনি ব্যাকট্রিয়ায় ফিরে যান এবং সেখান থেকে হিন্দুস্থান অভিযানের জন্য প্রস্তুত হন।

আলেকজাণ্ডার ৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে কাবুলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে সিন্ধুনদের তীরে এসে উপস্থিত হন। তারপর নৌকার সেতুর সাহায্যে সিন্ধু অতিক্রম ক'রে তক্ষশীলায় পৌঁছান। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলেও ঝিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিপতি পুরুর (গ্রীকদের পোরাস) সাথে আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনীর এক তুমুল যুদ্ধ হয় (হাইডাসপিস বা ঝিলামের যুদ্ধ)। এই যুদ্ধ পুরুর বীরত্ব ও আলেকজাণ্ডারের মহানুভবতার জন্য ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। পুরুকে পরাস্ত করে তিনি শতদ্রু নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে বহু স্থান জয় করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর রণক্লান্ত সৈন্যদল আর অধিক অগ্রসর না হতে চাওয়ায় তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীর একাংশ অ্যাডমিরাল নিয়ারকাসের অধীনে জলপথে প্রেরণ করে নিজে বাদবাকি সৈন্যসহ বালুচিস্তানের ভিতর দিয়ে ৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে

স্থলপথে সুসা পৌঁছান। তিনি সুসা থেকে ব্যাবিলনে গমন করেন এবং আরবদেশ জয়ের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু ব্যাবিলনে থাকাকালীন আলেকজাণ্ডার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৩২৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

শুধুমাত্র একজন দিগ্বিজয়ী বীর হিসাবেই যে আলেকজাণ্ডার ইতিহাসে বিশেষ স্থানলাভের অধিকারী একথা মনে করলে ভুল হবে। আলেকজাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে বহুধাবিভক্ত হয়ে যায়। সুতরাং আলেকজাণ্ডারের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সামরিক ফল ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এর সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। অধিকৃত দেশগুলোতে তিনি এক উন্নত মানের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটান। আলেকজাণ্ডারই প্রথম রাজা যিনি দিগ্বিজয়ের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংযোগস্থাপন এবং সমন্বয় সাধন করেন। ফলে উভয় মহাদেশের মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হয় এবং উভয় মহাদেশের মানুষই বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে লাভবান হয়। বিভিন্ন বিজিত স্থানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শহরগুলো এশিয়ায় গ্রীক ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে বড় বড় চিন্তাবিদ, মনীষী, স্থপতি, শিল্পী প্রভৃতির অভাব ছিল না। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল তিনি তাঁর অভিযানে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের। ফলস্বরূপ সমগ্র পশ্চিম এশিয়া জুড়ে একটি সর্বজনীন সভ্যতা গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলেই ইউরোপ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও সেখানকার মানুষজন, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতি সম্পর্কে জানবার সুযোগ পায়। তাই আলেকজাণ্ডারের অভিযান শুধু এশিয়াকে নয়, ইউরোপকেও নানাভাবে সমৃদ্ধ করে। এইভাবে তিনি ইউরোপ ও এশিয়াকে পরস্পরের অনেক নিকটবর্তী করেন। সত্যি বলতে, তিনি শুধু এশিয়ার সামরিক বিজয়লাভেই পরিতৃপ্ত থাকতে চাননি, সাংস্কৃতিক বিজয়লাভও তাঁর কাম্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যে গ্রীক সংস্কৃতিকে তিনি তাঁর বিজিত দেশগুলোতে ছড়িয়ে দেন। এইসব কারণে আলেকজাণ্ডার শুধু দিগ্বিজয়ী বীর হিসাবেই নয়, একজন সংস্কৃতিবান মানুষ হিসাবেও বিশ্ব ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে আলেকজাণ্ডার তাঁর দিগ্বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্বের সভ্যতাকে কয়েকশো বছর অগ্রসর করেন।

আসফউদ্দৌলা

[শাসনকাল ১৭৭৫-১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ]

পিতা সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আসফউদ্দৌলা অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত শাসক ছিলেন। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাথে ফৈজাবাদের চুক্তি মারফৎ তিনি ইংরাজদের আনুগত্য স্বীকার করে নেন এবং তাঁর রাজ্যে বেশকিছু ইংরাজ সৈন্য মোতায়েন রাখা হয়। তাদের ব্যয়ভার আসফউদ্দৌলাকেই বহন করতে হত।

আসফউদ্দৌলা শাসক হিসাবে অযোগ্য ও অকর্মণ্য প্রকৃতির হলেও শিল্প-সংগীতের অনুরাগী ছিলেন এবং লঘু আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাতে ভালবাসতেন। তিনি ফৈজাবাদ থেকে তাঁর রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরে পরিবর্তন করেন। তাঁর আমলে লক্ষ্ণৌর শ্রী ও সমৃদ্ধির কথা চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাস্তবিকই নির্মাতা হিসাবে আসফউদ্দৌলা লক্ষ্ণৌর ইতিহাসে এক স্মরণীয় নবাব। তিনি বহু বড় বড় অট্টালিকা, মসজিদ, রাস্তাঘাট, উদ্যান নির্মাণ করে লক্ষ্ণৌ শহরটিকে সুন্দর ও সুশোভিত করে তোলেন। আসাফি (বড়) ইমামবাড়া তাঁর আমলেই নির্মিত হয়েছিল (১৭৮৪ খৃীঃ)। মৃত্যুর পর এই প্রসিদ্ধ ইমামবাড়ায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় (১৭৯৭ খৃীঃ)।

আহমদ শাহ

[শাসনকাল ১৭৪৮-১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ]

আহমদ শাহ ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহের পরবর্তী শাসক হিসাবে মোগল সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকাল ছয় বছর স্থায়ী হয়েছিল। বাস্তবিকই আহমদ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে সম্রাট হন। সেই সময় মোগল শাসনতান্ত্রিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল এবং অধীনস্থ প্রদেশগুলোর উপর সম্রাটের নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা দেখা দিয়েছিল। বহু প্রদেশ ইতিমধ্যেই মোগলদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতি দৃঢ়ভাবে সামাল দেবার মত মানসিকতা দুর্বল আহমদ শাহের ছিল না। ফলে সাম্রাজ্যের সীমা সংকুচিত হতে হতে দিল্লী ও তার আশপাশ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আহমদ শাহের অযোগ্যতার সুযোগে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ও অন্ধ করে গাজীউদ্দিন নিজাম-উল-মুলক দরবারী রাজনীতিতে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

আহমদ শাহ আবদালী

[শাসনকাল ১৭৪৭-১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ]

আফগানিস্থানের শাসক ছিলেন। আহমদ শাহ আবদালী ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্থান জয় করেন এবং পঁচিশ বছরেরও অধিককাল প্রবল বিক্রমে রাজকার্য পরিচালনা করেন। আহমদ শাহ ছিলেন এক উপজাতি সর্দারের পুত্র এবং সম্ভবতঃ ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল। আফগানিস্থানের শাসক হবার পূর্বে তিনি পারস্যরাজ নাদির শাহের একজন সেনাপতি ছিলেন। নাদির শাহের মৃত্যুর পর তিনি আফগানিস্থানের সম্রাট হিসাবে তাঁর নতুন জীবন শুরু করেন। তিনি 'দুর-ই-দুর্‌রান' বা 'যুগের মুক্তা' উপাধি ধারণ ক'রে সিংহাসনে বসেন। সেই থেকে তাঁর বংশ দুররানী বংশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ভারতবর্ষের ধনসম্পদে আকৃষ্ট হয়ে আহমদ শাহ অন্তত পক্ষে সাত-আটবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং এদেশ থেকে বহু মূল্যবান সামগ্রী স্বদেশে নিয়ে যান। সম্ভবতঃ এদেশে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হতে পারেননি।

আবদালী একজন প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট ছিলেন এবং নাদির শাহের ভারত অভিযান তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি এক সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষ অভিযানে আসেন। সেই সময় মোগল শক্তির দুর্বলতার সুযোগে মারাঠারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। আহমদ শাহ পঞ্চমবার ভারত অভিযানে বার হলে পানিপথের প্রান্তরে মারাঠাদের সঙ্গে তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয় (১৭৬১ খ্রীঃ) যা ইতিহাসে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠাদের সর্বভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মারাঠা সৈন্যবাহিনীর এক বিশাল অংশ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়ায় মারাঠাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। দুর্বল মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম বিনাযুদ্ধে আবদালীর আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তাঁকে বার্ষিক চল্লিশ লক্ষ টাকা করপ্রদানে স্বীকৃত হন। অতঃপর আবদালী লাহোর অধিকার করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর আফগানিস্থানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রতিবারের ভারত অভিযানেই তিনি কিছু কিছু অঞ্চল জয় করেন কিন্তু এদেশে বেশিদিন অবস্থান না করার ফলে কোনো অঞ্চলের উপরই তিনি স্থায়ী অধিকার স্থাপন করতে পারেননি।

ভারতবর্ষে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনে ব্যর্থ হলেও আবদালীর পুনঃপুনঃ ভারত অভিযান একাধিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, তাঁর আক্রমণ পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে। দ্বিতীয়ত, মারাঠা শক্তির ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য

স্থাপনের আশা হতাশায় পরিণত হয়। ফলে সুবিধা হয় ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর। ভারতে আধিপত্য বিস্তারের পথে মারাঠা শক্তি ছিল ইংরাজদের এক প্রবল বাধা। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সে বাধা অপসারিত করে। আবদালীর ভারতবর্ষ আক্রমণে ইংরাজ শক্তি কিছুটা উদ্বিগ্নবোধ করলেও সে উদ্বেগ ছিল সাময়িক।

আহমদ শাহ আবদালী ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

ইব্রাহিম পাশা

[শাসনকাল ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মিশরের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, জেনারেল ও শাসনকর্তা ছিলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব শুরু হওয়ার বছরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে ধাপে ধাপে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন। মিশরের বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়ক মহম্মদ আলি তাঁকে পোষ্যপুত্র হিসাবে, গ্রহণ করেন। ইব্রাহিম পাশা একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন এবং দীর্ঘকাল অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে মিশরীয় রাজনীতির অন্যতম প্রধান পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সিরিয়া জয়ের মাধ্যমে সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবেও তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিশরের শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র কয়েক মাস পরেই উনষাট বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

ইব্রাহিম লোদী

[শাসনকাল ১৫১৭-১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ]

ইব্রাহিম লোদী ছিলেন ভারতবর্ষে লোদী বংশের তথা আফগান রাজত্বের শেষ সুলতান। পিতা সিকান্দারের মৃত্যুর পর ইব্রাহিম সিংহাসনে বসেন (১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ)। কয়েকবছর রাজত্ব করার পরই তিনি তাঁর আচার-আচরণের দ্বারা জনপ্রিয়তা হারান। তিনি ছিলেন অদূরদর্শী শাসক। রাজ্যপরিচালনা কিংবা যুদ্ধ পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় তিনি রাখতে পারেন নি। পীড়নমূলক ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের ফলে তিনি দেশের উচ্চপদস্থ অফিসার ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হন। অভিজাত গোষ্ঠীর সাথে তাঁর বিরোধ চরমে ওঠে যখন দৌলত খান লোদীর পুত্র দিলওয়ার খানের প্রতি তিনি কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেন। দৌলত খান লোদী ছিলেন লাহোরের সর্বময় কর্তা। তিনি সুলতান ইব্রাহিমের পিতৃব্য আলম খানের সাথে এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আলম খানের উদ্দেশ্য ছিল ইব্রাহিমকে উচ্ছেদ

করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করা। তাঁরা তৈমুর বংশীয় তদানীন্তন কাবুলের শাসক বাবরকে হিন্দুস্থান আক্রমণের জন্য উৎসাহিত করেন। বাবরও এই সুযোগ গ্রহণ করেন এবং পানিপথ প্রান্তরে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক যুদ্ধে বাবরের হাতে ইব্রাহিম লোদীর শোচনীয় পরাজয় হয়। ইব্রাহিম যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন। এই যুদ্ধ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হিসাবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই যুদ্ধের ফলে ভারতে তুর্ক-আফগান শাসনের অবসান ঘটে এবং নতুন মোগল শাসনের সূত্রপাত হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাও এই সময় থেকে এক নতুন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে।

ইয়ুং-লো

[শাসনকাল ১৪০৩-১৪২৪ খ্রীষ্টাব্দ]

চীনের মিঙ বংশের একজন রাজা ছিলেন। মিঙ বংশের প্রতিষ্ঠাতা চু য়ুয়ান চ্যাঙ-এর মৃত্যুর পর ১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র চু-তি ইয়ুং লো নামধারণ ক'রে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে বসেই তাঁকে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয়ক্ষেত্রেই নানা প্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। একশ্রেণীর জনগণ তাঁর সিংহাসন লাভের তীব্র বিরোধিতা করতে থাকে। অধিকন্তু বহির্মঙ্গোলিয়া ও জাপানের দিক থেকে তাঁর সাম্রাজ্য আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। রাজত্বকালের প্রথম দিকে ইয়ুং লো-কে ক্রমাগত ঘর ও বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। এইসব প্রতিকূল শক্তিগুলোকে তিনি শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। পিতার মত তিনিও চীনের নৌশক্তি বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেন এবং আন্নাম, সিংহল, নিকট প্রাচ্য, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে বেশ কয়েকটি সামুদ্রিক অভিযান চালান। তিনি সুমাত্রার যুবরাজ ও সিংহলের রাজাকে বন্দী করে নিজ রাজধানীতে নিয়ে আসেন। এশিয়ার অনেকগুলো দেশ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এইসময় চীনের বৈদেশিক বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসারলাভ করে এবং চীন সম্রাট পরাজিত দেশগুলো থেকে নিয়মিত কর ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী আদায় করতেন। ভাল জাতের ঘোড়া, সালফার, কাঠ, মশলা প্রভৃতি চীন এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্বদেশে আমদানী করত। চীনের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ছিল সিল্ক ও পোর্সেলিন। ইয়ুং-লো'র আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হ'ল তিনি পিকিংএ তাঁর রাজধানী পরিবর্তন (১৪২১) ক'রে শহরটিকে নতুনভাবে গড়ে তোলেন। একুশ বছর রাজত্ব করার পর ইয়ুংলো ১৪২৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

ইলতুৎমিস

[শাসনকাল ১২১১-১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ]

শামসউদ্দিন ইলতুৎমিস জাতিতে ছিলেন ইলবারি তুর্কী। তাঁকে বিভিন্ন প্রকার প্রতিকূল অবস্থার সাথে অল্পবয়স থেকেই সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তাঁর যোগ্যতা ও গুণাবলী দিল্লীর শাসক কুতুবউদ্দীনকে মুগ্ধ করেছিল। একজন সামান্য ক্রীতদাস হিসাবে জীবন শুরু করে নিজ প্রতিভাবলে ধাপে ধাপে ইলতুৎমিস ক্ষমতার উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করেন। দিল্লীর মসনদে বসার আগে তিনি বদাউনের শাসক হয়েছিলেন এবং কুতুবউদ্দিনের কন্যাকে বিবাহ করেন। কুতুবউদ্দিনের আকস্মিক মৃত্যুতে দিল্লীর ওমরাহগণ ইলতুৎমিসকে যোগ্য ব্যক্তি বিবেচিত করে তাঁকে সিংহাসনে বসান (১২১১)। সিংহাসনে বসেই ইলতুৎমিসকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সিন্ধুতে নাসিরউদ্দিন কুবাচা তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে অস্বীকৃত হন। গজনীর শাসক তাজউদ্দিন ইলদুজ হিন্দুস্থানের সিংহাসন দাবি করেন। বাংলার শাসক আলি মর্দন নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন। গোয়ালিয়র, রণথম্বর প্রভৃতি স্থানের হিন্দুরাজারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করতে থাকেন। এমনকি দিল্লীর কয়েকজন প্রভাবশালী আমীরও তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকেন। ইলতুৎমিস ছিলেন একজন সাহসী ও দক্ষ শাসক। তিনি শক্ত হাতে একে একে সব বিরোধী শক্তিকে দমন করেন,সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে দ্রুত শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং নব প্রতিষ্ঠিত তুর্কী সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। এছাড়া তিনি সামরিক অভিযান চালিয়ে নতুন রাজ্যজয়ের মাধ্যমে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমাও বেশ কিছুটা বিস্তৃত করেন। তিনি বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে তাঁর রাজত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ 'সুলতান-ই-আজম' (মহাসুলতান) উপাধি লাভ করেন। খলিফার স্বীকৃতি লাভের ফলে মুসলিম দুনিয়ায় তাঁর সম্মান ও মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে খিভার শাসক জালালউদ্দিন কুখ্যাত মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিসের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে তাঁর দরবারে আশ্রয় চান। কিন্তু দূরদর্শী ইলতুৎমিস এই ঝুঁকি না নিয়ে দেশকে মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত করেন। অত্যন্ত সফলভাবে পঁচিশ বছর রাজত্ব করার পর ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিস মৃত্যুমুখে পতিত হন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক গোলাম বংশের সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিসকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। সম্ভবতঃ তাঁর আমলেই দিল্লীর বিখ্যাত কুতুবমিনারের নির্মাণকার্য শেষ হয়।

ইলিয়াস শাহ

[শাসনকাল ১৩৪২-১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দ]

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার শাসক ছিলেন। তিনি লখনৌতির সিংহাসন দখল করে বাংলায় এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইলিয়াস শাহ একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি ত্রিহুত থেকে চম্পারণ, গোরক্ষপুর এবং উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত সমরাভিযান প্রেরণ করেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী নেপালেও অভিযান করেছিল বলে জানা যায়। ইলিয়াস শাহের আমলে সামরিক দিক দিয়ে বাংলার গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই সময় মহম্মদ তুঘলক ছিলেন দিল্লীর সুলতান। মহম্মদের সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি এই অভিযানগুলো প্রেরণ করেছিল। মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ফিরুজ শাহ সুলতান ইলিয়াসের কর্তৃত্ব খর্ব করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে অভিযান করেন। কিন্তু ইলিয়াস তাঁর সুরক্ষিত একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মরক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত ফিরুজ শাহ দুর্গ দখল না করে দিল্লী ফিরে যেতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে ফিরুজের সাথে ইলিয়াসের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। পনের বছর রাজত্ব করার পর ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হয় (১৩৫৭)।

ইসমাইল পাশা

[শাসনকাল ১৮৭৩-১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মিশরের সুলতান ছিলেন। বিখ্যাত মহম্মদ আলির দৌহিত্র ইসমাইল ছিলেন উদারচেতা ও জনদরদী শাসক। তিনি মিশরের আধুনিকীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। মূলতঃ তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াসের ফলেই মিশর তুরস্কের অধীনতাপাশ থেকে মুক্তি লাভ করে। ইসমাইল পাশা ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'খেদিভ' উপাধি লাভ করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সুয়েজ খাল খননের কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন অমিতব্যয়ী ও অপরিণামদর্শী। বেহিসাবী অর্থব্যয়ের ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ায় তিনি তাঁর সুয়েজ খালের শেয়ার ইংলণ্ডের কাছে বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হন। ফলে ইংলণ্ড বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক উভয় দিক দিয়েই যথেষ্ট লাভবান হয়। সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণভার ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের হাতে চলে যাওয়ায় তিনি জনপ্রিয়তা হারান এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ইসমাইল পাশা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬৫ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

ইসলাম শাহ

[শাসনকাল ১৫৪৫-১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ]

বিখ্যাত পাঠান শাসক শের শাহের দ্বিতীয় পুত্র। শের শাহের মৃত্যুর পর ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম শাহ দিল্লীর আফগান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল জালাল খান। সুলতান ইসলাম শাহ নাম ধারণ করে তিনি সিংহাসনে বসেন। শের শাহের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে আফগান অভিজাতদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ও পারস্পরিক বিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ইসলাম শাহ সিংহাসন লাভ করলে তাঁর অন্যান্য ভ্রাতাগণও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। ইসলাম শাহ কঠোর হস্তে তাঁর ভ্রাতা ও বিরোধী অভিজাতদের উচ্ছৃংখল আচরণ দমন করেন। পিতার মত প্রতিভাবান ও যোগ্যতাসম্পন্ন না হলেও তিনি অপদার্থ ছিলেন না। তিনি সৈন্য-বাহিনীর পূর্বদক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন এবং মোটামুটিভাবে পিতার আমলের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর অনুসরণ করে চলেন। তাঁর আভ্যন্তরীণ শাসন প্রশংসনীয় ছিল বলা যায়। কিন্তু ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অল্পবয়সে তিনি অকালমৃত্যু বরণ করেন।



উড্রো উইলসন

[শাসনকাল ১৯১৩-১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। উইলসন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হবার পূর্বে তিনি নিউ জার্সির গভর্নর হিসাবে (১৯১২ – ১৩) কার্য করেন। ১৯১৩ থেকে '২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদে আসীন থাকেন। তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের কাছ থেকে যুদ্ধকে খুব বেশি নৃশংস ও অমানবিক না ক'রে তোলার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। কিন্তু ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কাইজার এই শর্ত ভাঙলে জার্মানীকে পরাস্ত করবার জন্য তিনি মিত্রবাহিনীর পক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেন এবং আমেরিকার পূর্ণ

সামরিক শক্তিকে এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর জয়লাভে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই বেশী। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর জার্মানী মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করার পর প্যারিসে এক শান্তি সম্মেলন আহবান করা হ'লে প্রেসিডেণ্ট উইলসন-এর অন্যতম কর্ণধার হন। তিনি বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর বিখ্যাত 'ফরটিন পয়েণ্টস্' বা 'চৌদ্দ দফা' প্রস্তাব দেন। শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাব যথাযথভাবে কার্যকর না হলেও উইলসনের মহৎ প্রচেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসার দাবি রাখে। এই সব প্রস্তাবের মধ্যে 'লীগ্ অব্ নেশন্স্' স্থাপনের কথাও ছিল। বিশ্বশান্তির জন্য উইলসনের প্রয়াসের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আটষট্টি বছর বয়সে এই আদর্শবাদী রাষ্ট্রনেতা পরলোকগমন করেন।



উইলিয়াম প্রথম

[শাসনকাল ১৮৭১-১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রাশিয়ার রাজা ছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয় যুদ্ধের পর প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান রাজ্যগুলো ঐক্যবদ্ধ হলে তিনি সমগ্র জার্মানীর সম্রাট হন। এই সময় তিনি কাইজার প্রথম উইলিয়াম নাম ধারণ করেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেন্টের ব্যর্থতার পর প্রাশিয় পার্লামেণ্টে উদারপন্থী সদস্যদের সাথে প্রথম উইলিয়ামের মতবিরোধ ঘটায় দেশে এক সংকটময় পরিস্থিতি দেখা দেয়। প্রথম উইলিয়াম এই সংকট থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে অটো ফন বিসমার্ককে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার অর্পণ করলে জার্মানীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এর পরবর্তী ইতিহাস হল বিসমার্কের দক্ষ ও কৌশলী পরিচালনায় খণ্ড-বিচ্ছিন্ন দুর্বল জার্মানীর ঐক্যসাধন ও অগ্রগতির ইতিহাস। কাইজার প্রথম উইলিয়াম দীর্ঘজীবী ছিলেন। আঠারো বছর একাদিক্রমে সমগ্র জার্মানীর রাজপদে আসীন থাকার পর একানব্বই বছর বয়সে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন (১৮৮৮)।



উইলিয়াম দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৮৯০-১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ]

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর রাজা হন। তিনি ছিলেন প্রথম উইলিয়ামের পৌত্র। তিনি প্রথম উইলিয়ামের সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের কাছে রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। তিনি উদ্যমী ও বিচক্ষণ ছিলেন। কিন্তু তাঁর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও আত্মম্ভরী স্বভাবের জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁর পতন হয়েছিল। মাঝে মাঝে তিনি হঠকারীর মত আচরণ করতেন এবং সেই সব সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা তাঁর থাকত না। প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতাকে তিনি খুব একটা সুনজরে দেখতেন না। তাই তিনি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ককে পদচ্যুত করেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উইলিয়াম কয়েকটি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফ্রান্সকে মিত্রহীন করার জন্য বিসমার্ক রাশিয়ার সাথে যে নিরপেক্ষতার চুক্তি করেছিলেন কাইজার তা নাকচ করে দেন। ফলে রাশিয়া ফ্রান্সের সাথে এক সামরিক চুক্তি করার সুযোগ পায়। এর পর তিনি ইংলণ্ডের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস চালান এবং জাঞ্জিবার দ্বীপ ও আরও দু'একটি স্থানের উপর জার্মানীর দাবিকে প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু বুয়র যুদ্ধের সময় কাইজার বুয়রদের সমর্থন করায় ইংলণ্ড ক্ষিপ্ত হয়। এছাড়া জার্মানী তুরস্ক সরকারের অনুমতি নিয়ে বার্লিন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত রেলপথ চালু করার পরিকল্পনা করলে ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে ভেবে ইংলণ্ড আশঙ্কিত হয়। অবশেষে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এক নৌ-আইন প্রবর্তনের দ্বারা কাইজার জার্মানীর নৌশক্তিকে জোরদার করার পরিকল্পনা করলে ইংলণ্ড তার উপনিবেশগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবনায় পড়ে। এইসব কারণে ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাথে ত্রিশক্তি আঁতাত গঠন করে। এরপর মরক্কোকে কেন্দ্র করে জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। বিসমার্ক জার্মানীকে 'একটি পরিতৃপ্ত দেশ' হিসাবে ঘোষণা করে ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের শত্রুতাচরণের পথ বন্ধ করতে

সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম সরবে ঘোষণা করেন যে জার্মানীর পক্ষে আর কোনো মতেই পরিতৃপ্ত দেশ হিসাবে বিরাজ করা সম্ভব নয় এবং পৃথিবীর সর্বত্র উপনিবেশ স্থাপনের অধিকার শুধু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ভোগ করবে এ হতে পারে না। তিনি স্পর্দ্ধাভরে বলেন, জার্মানী হ'ল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি, সুতরাং তাকে বাদ দিয়ে কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যার নিষ্পত্তি করা বরদাস্ত করা হবে না। শেষ পর্যন্ত সেরাজেভো হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে জার্মানী চরম পরাজয় বরণ করে এবং কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের রাজত্ব-কালেরও অবসান ঘটে। বহু ঐতিহাসিক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটনের জন্য কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের ঔদ্ধত্য ও হঠকারী নীতিকেই প্রধানতঃ দায়ী করেছেন।

উইলিয়াম দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১০৮৭-১১০০ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রথম উইলিয়ামের পুত্র। তাঁর আসল নাম উইলিয়াম রুফাস্। তিনি ১০৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় উইলিয়াম নাম ধারণ করে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসেই তাঁকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী ভুস্বামী তাঁর কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করলে উইলিয়াম কঠোর হস্তে তাদেরকে দমন করেন। এরপর ওয়েল্‌স্‌ এর জনগণ ইংলণ্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় উইলিয়াম দক্ষতার সাথে তাদের আক্রমণের মোকাবিলা করেন। ওয়েল্‌স্‌বাসীরা পরাজিত হয়ে স্বদেশে ফিরে যায়। স্কটল্যাণ্ডের দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করে তিনি বিশেষ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং স্কটল্যাণ্ডের রাজার আক্রমণও তিনি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেন। দ্বিতীয় উইলিয়ামের খ্রীষ্টান ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ বিশ্বাস বা আস্থা ছিল না। ১০৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপের মৃত্যু হলে তিনি কয়েক বছরের জন্য সেই পদে নতুন কোনো আর্চবিশপ নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেই ধর্মাধিষ্ঠানের আয়ে রাজকোষকে আরও পূর্ণ করা। তের বছর রাজত্ব করার পর দ্বিতীয় উইলিয়াম মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উইলিয়াম তৃতীয়

[শাসনকাল ১৬৮৯-১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ]

কনভেনশন পার্লামেণ্টের সম্মতিক্রমে মেরি ও তাঁর স্বামী উইলিয়াম ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যুগ্মভাবে গৌরবময় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ক্যাথালিক ধর্মকে ইংলণ্ডের মাটিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে পূর্ববর্তী রাজা দ্বিতীয় জেমসকে সিংহাসন হারাতে হয়েছিল। মেরি ছিলেন দ্বিতীয় জেমসের প্রটেস্টাণ্ট মতাবলম্বী কন্যা। তৃতীয় উইলিয়ামের সিংহাসন লাভ ইংলণ্ডের ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। এই সময় থেকেই ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থায় উদারনৈতিক ভাবধারা কার্যকরী হবার সুযোগ দেখা যায় এবং সুদীর্ঘকালের স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসনের নাগপাশ থেকে জনগণ মুক্তিলাভ করে। ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় নীতির ক্ষেত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবিকই, এই সময় থেকেই ইতিহাসের আধুনিক যুগে ইংলণ্ড প্রবেশ করে। উইলিয়ামের আমল থেকে শাসন পরিচালনায় পার্লামেণ্টের ভূমিকাই বড় হয়ে ওঠে এবং একমাত্র প্রোটেস্টাণ্ট মতাবলম্বী ব্যক্তির জন্যই ইংলণ্ডের সিংহাসন নির্দিষ্ট করা হয়। উইলিয়াম একজন সাহসী, সহিষ্ণু, উদ্যমশীল, আত্মবিশ্বাসী এবং দৃঢ়চেতা পুরুষ ছিলেন। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি বেশি মাতামাতি করার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসরণ করে চলতেন।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে উইলিয়াম ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুইকে তাঁর প্রধান শত্রু এবং ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করতেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপ মহাদেশে ভারসাম্য রক্ষা করে চলার চেষ্টা করেন। আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি চাইতেন সমগ্র জাতি দলমত নির্বিশেষে তাঁর পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনে তাঁর পাশে এসে সমবেত হোক্।

তৃতীয় উইলিয়াম যে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাসের একজন বড় রাজা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হ'ল ফ্রান্সের একচেটিয়া প্রভুত্ব করা থেকে পশ্চিম ইউরোপকে রক্ষা করা। এই ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভাও ছিল বিস্ময়কর। এ ব্যাপারে তাঁর 'গ্র্যাণ্ড অ্যালায়েন্স' গঠনই তাঁর ক্ষমতার পরিচয় বহন করে। বৈদেশিক নীতির সাফল্যের জন্যই মূলতঃ তৃতীয় উইলিয়ামের খ্যাতি। তাঁর আমলে ইংলণ্ড ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তিনি ইংলণ্ডে প্রোটেস্টাণ্ট মতবাদকে দৃঢ় ও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন দেশের রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্গঠন করেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেন এবং ক্যাবিনেট ব্যবস্থার শুভ সূচনা করেন। এ ছাড়া তাঁর আমল ছিল ইংলণ্ডের সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপ ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের এক গৌরবময় কাল।

উইলিয়াম চতুর্থ

[শাসনকাল ১৮৩০-১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে]

ঊনবিশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। চতুর্থ উইলিয়াম তাঁর ভ্রাতা চতুর্থ জর্জের মৃত্যুর পর ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন উদার যুক্তিবাদী ও প্রজাদরদী শাসক। চতুর্থ জর্জ অপেক্ষা তিনি অনেক বেশি বিচক্ষণ, সদিচ্ছাসম্পন্ন ও দূরদর্শী রাজা ছিলেন। তিনি নানাবিধ শাসন-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁর শাসনকালে গ্রে, রাসেল, ডারহাম, মেলবোর্ণ প্রভৃতি মন্ত্রিসভা বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংস্কার আইন প্রবর্তন করে। সে সবের মধ্যে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই আইন পরবর্তী বহু আইনের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিল। পরের বছর স্বাধীনতা, শিক্ষা, ফ্যাক্টরী প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন প্রবর্তন করে ক্রীতদাস প্রথা অবলুপ্ত করা, শিক্ষাখাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা, অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের খনি বা কলকারখানায় নিয়োগ নিষিদ্ধ করা প্রভৃতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ছাড়া মিউনিসিপ্যাল আইনের মাধ্যমে পুরসভাগুলোর দুর্নীতি দূরীকরণ ও পুরবাসীদের ভোটদানের অধিকার, 'পেনি পোস্ট' এর মাধ্যমে এক পেনি খরচে চিঠি প্রেরণের সুযোগ প্রদান প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সাতবছর রাজকার্য পরিচালনা করার পর ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় চতুর্থ উইলিয়ামের জীবনাবসান হয়।



উইলিয়াম দি কন্‌কারার

[শাসনকাল ১০৬৬-১০৮৭ খ্রীষ্টাব্দ]

অপুত্রক রাজা এডোয়ার্ড দি কন্‌ফেসর নর্মাণ্ডির উইলিয়ামকে ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এডোয়ার্ডের মৃত্যুর পর স্বভাবতঃই উইলিয়াম ইংলণ্ডের সিংহাসন দাবি করেন। সামরিক শক্তির সাহায্য ছাড়া এই দাবি

স্বীকৃত হবেনা বুঝতে পেরে তিনি ইংলণ্ড আক্রমণের এক ব্যাপক প্রস্তুতি চালান। এডোয়ার্ডের পরবর্তী রাজা হিসাবে হেরল্ড ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু উইলিয়ামের আক্রমণে তিনি হেস্টিংস নামক স্থানে তীব্র যুদ্ধের পর প্রতিপক্ষের হাতে পরাজিত হন। হেরল্ড যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত প্রাণ বিসর্জন দেন। হেস্টিংসের যুদ্ধে জয়ী হয়ে উইলিয়াম ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করেন (১০৬৬) এবং তাঁর সময় থেকে ইংলণ্ডে নর্মান আধিপত্যের সূচনা হয়। উইলিয়াম এই কারণে ইতিহাসে উইলিয়াম 'দি কনকারার' নামে পরিচিতি লাভ করেন। লণ্ডনে উইলিয়ামের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি সমগ্র ইংলণ্ডের অধীশ্বর হন।

কুড়ি বছরের অধিককাল রাজকার্য পরিচালনা করার পর ১০৮৭ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম দি কনকারারের জীবনাবসান হয়।

উইলিংডন

[শাসনকাল ১৯৩১-১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ]

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হয়েছিলেন। লর্ড উইলিংডন ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উইলিংডন বোম্বাই-এবং ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাদ্রাজের গভর্ণর ছিলেন। ভারতে ভাইসরয় নিযুক্ত হবার আগে তিনি ১৯২৬ থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কানাডায় গভর্ণর জেনারেল হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পরবর্তী পাঁচ বছর তিনি ভারতের ভাইসরয় পদে আসীন থাকেন। এই সময়টা ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই ঘটনাবহুল ও উত্তপ্ত। উইলিংডনের আমলেই ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে তৃতীয় 'রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময় দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করার অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড হিন্দুদের মধ্যে জাতি ও বর্ণগত বৈষম্যসৃষ্টির জন্য 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র (কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড) প্রস্তাব করলে গান্ধীজী এর প্রতিবাদে আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তফসিল হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা আম্বেদকরের সাথে 'পুনা চুক্তি' স্বাক্ষর ক'রে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই দূরভিসন্ধিমূলক আইনকে অকার্যকর করে দেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন প্রবর্তন হ'ল লর্ড উইলিংডনের শাসনকালের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিংডনের ভারতে কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়।

উদয় সিংহ

[শাসনকাল ষোড়শ শতাব্দী]

মধ্যযুগে মেবারের রাণা ছিলেন। মোগল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক রাণা উদয়সিংহ ছিলেন মেবারের শক্তিশালী শাসক রাণা সঙ্গের অযোগ্য পুত্র। কর্ণেল টড মন্তব্য করেছেন যে মেবারের রাণাদের তালিকায় উদয় সিংহের নাম না থাকলেই ভাল হত। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আকবর চিতোর দুর্গ অবরোধ করায় উদয় সিংহ রাজধানী ছেড়ে আরাবল্লী পর্বতে আত্মগোপন করলে প্রধানতঃ জয়মল ও পাত্তা সিংহ নামক দুইজন বীর রাজপুতের উপর দেশের স্বাধীনতা রক্ষার ভার পড়েছিল। প্রবল যুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত উভয় বীর যোদ্ধাই শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। উদয় সিংহ অবশ্য তাঁর রাজধানী রক্ষায় ব্যর্থ হলেও অন্যান্য রাজপুত রাজাদের মত আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেননি এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে উদয়সিংহ পরলোকগমন করেন।

এগবার্ট

[শাসনকাল ৮০২-৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন ওয়েসেক্সের একজন রাজা ছিলেন। ৮০২ খ্রীষ্টাব্দে এগবার্ট ওয়েসেক্সের সিংহাসনে বসেন। তাঁর পূর্ববর্তী রাজাদের দুর্বলতাহেতু ওয়েসেক্সের শক্তি হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু এগবার্ট ছিলেন একজন পরাক্রমশালী রাজা। তাঁর আমলে ওয়েসেক্সের সার্বিক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। তিনি কর্নওয়াল অধিকার করেন এবং এসেক্স, সাসেক্স, কেন্ট প্রভৃতি হৃতরাজ্যগুলো মার্সিয়ার শাসকের কাছ থেকে পুনর্দখল করেন। শুধু তাই নয়, তিনি মার্সিয়ার রাজা অফাকে তাঁর অধীনতাপাশে আবদ্ধ করেন। নর্দাম্ব্রিয়া এগবার্টের সামরিক শক্তির পরিচয় পেয়ে বিনাযুদ্ধে তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। এছাড়া পূর্ব এ্যাংলিয়ার রাজারাও তাঁর প্রভুত্ব মেনে নিয়েছিল। এইভাবে দেখা যায় এগবার্টের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের অনেকখানি অংশই তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল। সুদীর্ঘকাল প্রবল বিক্রমে রাজত্ব করার পর ৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এগবার্ট পরলোকগমন করেন।



এট্লি

[শাসনকাল ১৯৪৫-১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ]

ক্লিমেণ্ট রিচার্ড এট্লি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। অক্সফোর্ড থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে তিনি আইন পড়া শুরু করেন এবং লণ্ডন শহরে একজন সমাজসেবী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। ন'বছর লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্-এ অধ্যাপনা করার পর এট্লি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে 'আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ স্টেট্ ফর ওয়র' পদে অধিষ্ঠিত হন। সাত বছর পর তিনি পোস্ট মাস্টার জেনারেল হন (১৯৩১) এবং আরও চারবছর পর কমন্সসভায় লেবারপার্টির নেতৃত্বপদ লাভ করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী হন। লেবার দল নির্বাচনে জয়লাভ করলে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এট্লি ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে আসীন থাকেন। এট্লির এই ছয়-সাত বছর স্থায়ী শাসনকালের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই সময় ভারতবর্ষ, বর্মা, সিংহল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত আরও কিছু কিছু দেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

দৃঢ়চেতা বিদেশমন্ত্রী আর্নেস্ট বেভিনের প্রভাবে পড়ে এট্লির বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন ঘটে। তিনি তাঁর পূর্বেকার সোভিয়েত ঘেঁষা নীতি পরিত্যাগ করে আমেরিকার দিকে ঝুঁকে পড়েন। প্রধানমন্ত্রী হবার পরই তিনি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'কোরিয় প্রশ্নে' প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সাথে আলোচনায় বসেন। ১৯৫১ সালে লেবারপার্টি নির্বাচনে পরাজিত হলেন এট্লি পদত্যাগ ক'রে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বিরোধী পক্ষের নেতার ভূমিকা নেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লেবার-পার্টি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাকে আর্ল-এর পদ-মর্যাদায় ভূষিত করেন। ক্লিমেণ্ট এট্লি ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে পরলোকগমন করেন।

এডোয়ার্ড প্রথম

[শাসনকাল ১২৭২-১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দ]

তৃতীয় হেনরীর মৃত্যুর পর ১২৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। প্রথম এডোয়ার্ড শক্তি, সাহস, বীরত্ব, যুদ্ধ পরিচালনায় দক্ষতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি বহু গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। শাসক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্য ও দূরদর্শিতার পরিচয় রেখেছিলেন। প্রথম এডোয়ার্ড শাসনকার্যে সব শ্রেণীর জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে ১২৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এক পার্লামেণ্ট বা জাতীয় সভা আহবান করেন। এতে অভিজাত সম্প্রদায় ছাড়াও শহর, বরো প্রভৃতির অধিবাসীদেরও অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। এডোয়ার্ড ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে অর্থের প্রয়োজনে ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের এক জরুরী অধিবেশন আহবান করতে বাধ্য হন। স্বয়ং রাজা কর্তৃক সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিয়ে এই পার্লামেণ্ট আহবান ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধে এডোয়ার্ড সফল হতে পারেন নি। এডোয়ার্ড একাধিক যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে ওয়েলেসকে ইংলণ্ডের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। স্কটল্যাণ্ডের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে তাঁকে একাধিক সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্কটল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণ বশীভূত করবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। আইন-প্রণেতা হিসাবেও এডোয়ার্ডের ভূমিকা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বহু স্ট্যাটুট বা আইনের সৃষ্টি করেন যে কারণে তাঁকে 'ইংলিশ জাস্টিনিয়ান' হিসাবে অভিহিত করা হয়। দীর্ঘ ৩৫ বছর রাজত্ব করার পর এডোয়ার্ড মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এডোয়ার্ড দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৩০৭-১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রথম এডোয়ার্ডের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের রাজা হন। দ্বিতীয় এডোয়ার্ড ছিলেন শান্তিপ্রিয় মানুষ। রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহ অপেক্ষা শিকার, নাটক ও জলসা তিনি বেশী ভালবাসতেন। তাঁর হাব-ভাব আচার-আচরণের মধ্যে রাজকীয় মর্যাদার কোনো প্রকাশ ছিল না। পিতার আমলে নির্বাসিত তাঁর বাল্যবন্ধু পিয়ার্স গেভেস্টনকে তিনি ফিরিয়ে এনে তাঁর প্রধান মন্ত্রী করলে দেশের অভিজাতগোষ্ঠী ক্ষিপ্ত হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত গেভেস্টনকে অভিজাতদের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় এডোয়ার্ড স্কটল্যাণ্ডকে পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে এক সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু যুদ্ধ

পরিচালনায় তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য। তিনি ব্যানকবার্ণের যুদ্ধে স্কটদের হাতে চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করেন। আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনায়ও তাঁর অযোগ্যতা ঘন ঘন প্রমাণিত হতে থাকে। দেশের কোনো সমস্যারই তিনি সুষ্ঠ সমাধান করতে পারেন নি বরং সমস্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হতে লাগল। এই অবস্থায় ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি ল্যান্ডি দ্বীপে পলায়ন করেন। পরের বছর ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বন্দী অবস্থায় তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। দ্বিতীয় এডোয়ার্ডের রাজত্বকাল মোট ২০ বছর স্থায়ী হয়েছিল।



এডোয়ার্ড তৃতীয়

[শাসনকাল ১৩২৭-১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বিতীয় এডোয়ার্ডের মৃত্যুর পর ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় এডোয়ার্ড মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে ইংলন্ডের সিংহাসনে বসেন। ১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তৃতীয় এডোয়ার্ড নিজে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করেন। তিনি ছিলেন তেজস্বী ও যুদ্ধপ্রিয় রাজা। তিনি পিতামহ প্রথম এডোয়ার্ডের যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে রাজ্যবিস্তারের নীতি অনুসরণ করেন। তিনি স্কটল্যান্ডে নিজ আধিপত্য স্থাপনের জন্য অনেক মাস সেখানে অতিবাহিত করেন। কিন্তু শীঘ্রই ফ্রান্সের সাথে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হওয়ায় তাঁকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। শুধুমাত্র যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যই নয়, তৃতীয় এডোয়ার্ডের রাজত্বকাল আরও নানা কারণে স্মরণীয়। তাঁর সুদীর্ঘ পঞ্চাশবছরব্যাপী রাজত্বকালে ইংলন্ডের আভ্যন্তরীণ ও রপ্তানী বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নত হয়। বিশেষ ক'রে উল ও বস্ত্র ব্যবসায়ে এই সময়ে এক অভূতপূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই সময় ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যেরও সমৃদ্ধি ঘটে। বিখ্যাত ইংরাজ কবি চসার তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করার পর তৃতীয় এডোয়ার্ড ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

এডোয়ার্ড ষষ্ঠ

[শাসনকাল ১৫৪৭-৫৩ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টম হেনরীর মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র এডোয়ার্ডকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসান হয়। ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের আমলে ইংলণ্ডের প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম প্রবর্তিত হয় এবং এই উদ্দেশ্যে ধর্মক্ষেত্রে প্রচলিত আইন কানুনের পরিবর্তন ঘটানো ও একাধিক নতুন প্রার্থনা পুস্তক প্রকাশ করা হয়। অতঃপর বহুধারাযুক্ত আইন প্রণয়ন করে তা ইংলণ্ডের চার্চগুলোতে অনুসৃত হবার ব্যবস্থা করা হয়। ইংলণ্ডের প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মনীতি প্রবর্তনে ডিউক অব সমারসেট মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কারণ এডোয়ার্ডের হয়ে কার্যতঃ তিনিই দেশ শাসন করতেন। এই ধর্মনীতি জনগণের উপর জোর করে চাপাতে গেলে ইংলণ্ডের একাধিক স্থানে বিদ্রোহ ঘটে। শেষ পর্যন্ত ডিউককে অপরাধী বিবেচনা করে তাঁকে হত্যা করা হয়। ষষ্ঠ এডোয়ার্ড ছিলেন ক্ষীণ স্বাস্থ্যের অধিকারী। মাত্র বছর ছয়েক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এডোয়ার্ড সপ্তম

[শাসনকাল ১৯০১-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। সপ্তম এডোয়ার্ড ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র। তিনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা হন এবং মোট দশ বছর রাজত্ব করেন। সপ্তম এডোয়ার্ড উদার হৃদয় ও প্রজাদরদী রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্ব কালে ইংলণ্ডে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসার ঘটে। তাঁর রাজত্বকালের শেষের দিকে লিবারেলপন্থী এ্যাসকুইথ ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য পেনসন, খনি শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণ প্রভৃতি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করেন। তাঁর রাজত্ব কালের শুরুতেই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সাথে ইংলণ্ডের এক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। কয়েকবছর পর ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী, ইতালি ও জাপানের মধ্যে সম্পাদিত ট্রিপ্‌ল্‌ এলায়েন্সের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার তাগিদে ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গে ট্রিপ্‌ল্‌ আঁতাত বা ত্রিশক্তি মৈত্রী চুক্তি সাক্ষর করে। এইভাবে ইউরোপ দুই পরস্পর বিবদমান যুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত হয়ে চার বছর বাদে সংঘটিত প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা করে। সপ্তম এডোয়ার্ড ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এডোয়ার্ড দি এল্ডার

[শাসনকাল ৯০৯-৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ]

বিখ্যাত আলফ্রেড দি গ্রেটের পুত্র এডোয়ার্ড দি এল্ডার ৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা হন। পিতার আমলে যে সব স্থান ডেনদের অধিকারে ছিল সেগুলো উদ্ধারকল্পে তিনি ডেনমার্কের সাথে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি বারবার প্রয়াস চালিয়ে লিঙ্কন,নটিংহাম, ডার্বি, লিস্টার প্রভৃতি স্থান ডেনদের কবলমুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হ'ল স্কটিশ রাজা কনস্টানটাইনের সাথে এক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন। এই চুক্তির মাধ্যমে স্কটল্যাণ্ড, ইংলণ্ডের অনেক কাছাকাছি আসে এবং পরবর্তীকালে দেশটির উপর ইংরাজ প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

এডোয়ার্ড ৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

এডোয়ার্ড দি কনফেসর

[শাসনকাল ১০৪২-১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন স্যাক্সন বংশের রাজা ছিলেন। এডোয়ার্ড দি কন্‌ফেসর ছিলেন প্রাক্তন রাজা এথেলরেড দি আনরেডির পুত্র। তিনি মোট ২৪ বছর রাজকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পান। এডোয়ার্ড অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং যাজক সম্প্রদায়ের উপর খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এজন্য তাঁকে এডোয়ার্ড 'দি কন্‌ফেসর' বা 'ধর্মপরায়ণ' এডোয়ার্ড বলা হ'ত। এডোয়ার্ড নর্মান্ডীতে লালিত-পালিত হন এবং শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন। ফলে ইংলণ্ডের রাজা হবার পরও তাঁর নর্মান প্রীতি থেকে যায়। তিনি তাঁর নর্মান অনুচরদের উচ্চ রাজপদ প্রদান করেন এবং তাদের প্রতি পক্ষপাত দুষ্টতার জন্য ইংরেজদের বিরাগভাজন হন। এই অবস্থায় গুডউইনের নেতৃত্বে ইংরেজদের নিয়ে একটি বিরোধীপক্ষের উদ্ভব ঘটায় দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রীতিমত ব্যাহত হতে থাকে। এডোয়ার্ড দি কন্‌ফেসর ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

এথেলরেড

[শাসনকাল ৯৭৮-১০১৩ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন স্যাক্সন বংশীয় রাজা ছিলেন। এথেলরেড দীর্ঘ ৩৫ বছর রাজত্ব করেন। তিনি এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি এত অস্থিরচিত্ত ছিলেন যে তাঁকে এথেলরেড 'দি আনরেডি' বলে অভিহিত করা হয়। এথেলরেড ছিলেন অদূরদর্শী.

স্বেচ্ছাচারী, উদ্যমহীন, স্বার্থপর ও খেয়ালী। তাঁর দুর্বলতার সুযোগে ডেন জাতি ইংলণ্ড আক্রমণ করে। এথেলরেড ভীত হয়ে তাদেরকে বিপুল পরিমাণ অর্থ উৎকোচ প্রদান ক'রে সে যাত্রা রেহাই পান ডেনরাও সুযোগ বুঝে ঘন ঘন অর্থ দাবি করতে থাকে। এই অর্থ যোগানোর জন্য প্রজাদের উপর ক্রমাগত কর বৃদ্ধি করা হতে থাকলে প্রজারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এথেলরেড কোনো কারণবশতঃ ইংলণ্ডে বসবাসকারী বহু ডেনকে হত্যা করলে ডেনরাজ সুয়েন ইংলণ্ড আক্রমণ করে জয় করে নেন। এথেলরেড সস্ত্রীক নর্মাণ্ডীতে পলায়ন করলে ইংলণ্ড সুয়েনের অধীন হয়ে পড়ে।

এথেলস্টোন

[শাসনকাল ২৫-৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ]

এডোয়ার্ড দি এল্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম পুত্র এথেলস্টোন ৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন যোগ্য পিতার উপযুক্ত পুত্র। তিনি পিতার বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধনীতি অনুসরণ করে ডেনদের কাছ থেকে নর্দাম্ব্রিয়া নামক স্থান পুনরায় অধিকার করতে সমর্থ হন এবং 'ব্রিটেনের রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। অ্যাংলো স্যাক্সন ক্রনিকল এর বর্ণনা অনুযায়ী বলা চলে ব্রিটিশ দ্বীপের যাবতীয় রাজ্য তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে এক শক্তিশালী সৈন্য-বাহিনী লাভ করেছিলেন। তিনি একে আরও বর্দ্ধিত ও সুসংগঠিত করেন। কর্ণওয়াল মন্মাউথ, নর্দাম্ব্রিয়া এবং স্কটল্যাণ্ডের রাজারা তাঁর সামরিক শক্তির কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছিল। স্করচাজা কন্স্টানটাইন ওয়েলসের সাথে যৌথভাবে এথেল-স্টোনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান চালিয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করেন।

এথেলস্টোন পনের বছর রাজত্ব করার পর ৯40 খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

এলগিন প্রথম

[শাসনকাল ১৮৬২-১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্রিটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। লর্ড এলগিনের শাসনকাল খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। তিনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং এর পরবর্তী শাসক হিসাবে এদেশে কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন এবং পরের বছরই ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। ভারতের বড়লাট পদে অধিষ্ঠিত হবার আগে তিনি কানাডার শাসক নিযুক্ত হন। চীনে অহিফেন যুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ প্রতিনিধি হিসাবে সে দেশে গমন করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে ওয়াহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরা সারা ভারতব্যাপী ইংরাজ বিরোধী এক ব্যাপক বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছিল। ওয়হাবী আন্দোলন নিঃসন্দেহে লর্ড এলগিনের শাসনকালের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

এলগিন দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৮৯৪-১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় এলগিন ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি ছিলেন লর্ড ল্যান্সডাউনের পরবর্তী শাসক। দ্বিতীয় এলগিনের সময়টা ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসের যথার্থই এক সংকটকাল। শাসন কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেই তাঁকে দুর্ভিক্ষ অর্থ সংকট, প্লেগ, মহামারী, সীমান্ত সমস্যা প্রভৃতি নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। খাইবার অঞ্চলের আফ্রিদী নামক দুর্ধর্ষ পার্বত্য উপজাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় নানা সমস্যার সৃষ্টি করলে সীমান্তে শান্তিরক্ষার্থে দ্বিতীয় এলগিনকে পঞ্চাশ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করতে হয়েছিল। কিন্তু সত্যি বলতে, সীমান্ত সমস্যার সমাধান তিনি করতে পারেননি। ১৮৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি নানাস্থানে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ও মহামারীতে বহু মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই অবস্থায় মিঃ র‍্যাণ্ড ও মিঃ আয়ার নামক দুই উদ্ধত ইংরাজ কর্মচারী প্লেগ দূরীকরণের নামে নিরীহ জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালালে পুণা শহরে চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে তাঁরা নিহত হন। উভয় ভ্রাতাকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই ঘটনায় জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পায় এবং দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ক্রমশঃ জটিলাকার ধারণ করতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে দ্বিতীয় এলগিন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন (১৮৯৯)।

এলারিক

[শাসনকাল পঞ্চম শতাব্দী]

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে গথদের রাজা ছিলেন। এলারিক ছিলেন একজন প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট ও যোদ্ধা। রোম সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি ৪১০ খ্রীঃ ইতালী আক্রমণ করেন এবং রোম নগরী অবরোধ করে রাখেন। রোমানরা প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাঁর সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু রোমের ধনসম্পদ এলারিককে খুবই প্রলোভিত করায় তিনি পুনরায় রোম আক্রমণ করেন এবং তাঁর সৈন্যরা রোম নগরী লুঠপাট করে মূল্যবান সামগ্রী নিজেদের দেশে নিয়ে আসে। এই ঘটনার কিছু দিনের মধ্যেই এলারিকের মৃত্যু হয়।



এলিজাবেথ প্রথম

(রাজত্বকাল ১৫৫৮-১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ)

মধ্যযুগের ইংলণ্ডের ইতিহাসে রাণী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকাল নানা কারণে বিশেষ স্মরণীয়। এলিজাবেথ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পঁচিশ বছর বয়সে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অষ্টম হেনরী ও এ্যান্ বোলিনের কন্যা এলিজাবেথ ছিলেন টিউডর বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের বিখ্যাত মোগল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে এলিজাবেথের মৃত্যুর সাথে সাথে ইংলণ্ডের ইতিহাসে টিউডর যুগেরও অবসান ঘনিয়ে আসে। এলিজাবেথ ছিলেন বহুগুণ সমন্বিতা একজন মহিয়সী রাণী। তাঁর সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরব্যাপী রাজত্বকাল বাস্তবিকই ইংলণ্ডের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এলিজাবেথ ছিলেন বিচক্ষণ, দৃঢ়চেতা, নির্ভীক, অহংকারী, উচ্চশিক্ষিতা সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিসম্পন্না, উদার, জাঁকজমক ও আড়ম্বরপ্রিয়, ক্ষমতা ও যশোলিপ্সু, নীতিজ্ঞানহীনা, ক্রোধী, সুবিধাবাদী, অকৃতজ্ঞ ও ছলনাময়ী। বাস্তবিকই তাঁর চরিত্রে বহু পরস্পর বিরোধী দোষ-গুণের আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

ইংলণ্ডের ইতিহাসের এক সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে এলিজাবেথ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় রাজকোষ প্রায় নিঃশেষিত এবং ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্টদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও ইংলণ্ড এক প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন কারণ একাধিক রাষ্ট্র শত্রুতাসাধনে তৎপর হয়ে উঠেছে। সামরিক দিক থেকেও দেশ তখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া ক্যাথলিকরা এলিজাবেথের সিংহাসনলাভের ঘোর বিরোধী ছিল। তাঁরা ইংলণ্ডের সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরির পক্ষাবলম্বন করেছিল। কিন্তু এলিজাবেথের চরিত্রে আত্মবিশ্বাস ও বলিষ্ঠতার অভাব ছিল না। অধিকন্তু, তিনি ছিলেন সুকৌশলী ও তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্না। প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দেবার মত ক্ষমতা তাঁর যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল।

সিংহাসনে আরোহণের পর এলিজাবেথের প্রথম কাজ হ'ল ধর্মীয় সমস্যার সমাধান ক'রে দেশকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা এবং নিজের সিংহাসনের নিরাপত্তাবিধান করা। সেই সময় দেশে তিন ধরনের ধর্মসম্প্রদায় ছিল উগ্র ক্যাথলিক, উগ্র প্রোটেস্টাণ্ট ও মধ্যপন্থী প্রোটেস্টাণ্ট। এলিজাবেথ মধ্যপন্থা অনুসরণ করে চললেন। এলিজাবেথ 'অ্যাক্ট অব্ সুপ্রিম্যাসি', 'অ্যাক্ট অব্ ইউনিফরমিটি' প্রভৃতি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে

ধর্মীয় ব্যবস্থায় কয়েকটি পরিবর্তন ঘটালেন। এ ছাড়া ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের আমলের 'ফরটি টু আর্টিক্যল্স্ অ্যাক্ট' থেকে উগ্র প্রোটেস্টাণ্ট নিয়মগুলো বর্জন ক'রে তিনি ওটিকে 'থার্টি নাইন আর্টিক্যল্স্ অব্ রিলিজন'এ পরিবর্তন করলেন। তাঁর এই নতুন আইনসমূহ কার্যকরী করার জন্য 'কোর্ট অব্ হাই কমিশন' স্থাপিত হ'ল। এলিজাবেথের এই নতুন ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের ধর্মীয় জগতে যে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা অনেকাংশে দূর হ'ল। ধর্মীয় সমস্যা সমাধানে এলিজাবেথ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিলেন ; ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি ছিল এক্ষেত্রে নিতান্তই গৌণ।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এলিজাবেথের মূল লক্ষ্য ছিল যুদ্ধবিগ্রহ এড়িয়ে চলা। সেইসময়ই ইউরোপের ক্যাথলিক দেশগুলোর সম্মিলিতভাবে ইংলণ্ড আক্রমণের সম্ভাবনা রোধ করার উদ্দেশ্যে এলিজাবেথ নিপুণ কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সুকৌশলে স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে এক দীর্ঘকালীন বিবাদের সৃষ্টি করেন এবং স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ডবাসীকে গোপনে সাহায্য করতে থাকেন। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ধর্মীয় বিবাদের সুযোগ নিয়ে এলিজাবেথ ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে হুগেনটদেরও সাহায্য পাঠান।

এলিজাবেথের বিবাহের প্রশ্ন নিয়েও রীতিমত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। ইংলণ্ডের প্রোটেস্টাণ্টরা স্বাভাবিকভাবেই এলিজাবেথের সাথে কোনো ক্যাথলিকের বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিল। আবার ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ এলিজাবেথকে বিবাহ করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন কিন্তু এলিজাবেথ দ্বিতীয় ফিলিপ ও আরও অনেককে বিবাহের আশ্বাস দিয়েও শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক কারণেই বিবাহ করলেন না। তিনি একাধিক রাষ্ট্রকে বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করলেন, কারণ এইভাবে স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি বিরোধী রাষ্ট্রগুলোর প্রকাশ্য শত্রুতা এড়ানো সম্ভব হ'ল। স্কটল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ধর্মীয় অরাজকতার সুযোগে তিনি প্রোটেস্টাণ্টদের গোপন সাহায্যদানের মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে স্কটল্যাণ্ডের ঐক্যবদ্ধ হবার পথে বাধার সৃষ্টি করলেন। এলিজাবেথের বৈদেশিক নীতি পর্যালোচনা করলে তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধি ও ন্যায়নীতিবর্জিত মিথ্যাচারের সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে তাঁর এই নীতি যে রাজনৈতিক সাফল্য এনেছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পোপ পঞ্চম পায়াস ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথকে খ্রীষ্টধর্ম থেকে বহিষ্কার করেন। কিন্তু এতেও এলিজাবেথ পোপ ও ক্যাথলিক ধর্মের কাছে নতিস্বীকার না করায় ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পোপের প্ররোচনায় থ্রুকমর্টন নামে এক ধর্মযাজক এলিজাবেথকে হত্যার পরিকল্পনা করে। উদ্দেশ্য ছিল এলিজাবেথের পরিবর্তে মেরিকে ইংলণ্ডের

রানী করা। স্পেন ও ফ্রান্সও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এলিজাবেথ সময়মত পরিকল্পনাটির কথা জানতে পারেন এবং থ্রকমর্টনের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। এই ঘটনার চার বছর পর অ্যান্টনি ব্যাবিংটন নামক জনৈক ব্যক্তি মেরির সাথে ষড়যন্ত্র ক'রে এলিজাবেথকে হত্যার নতুন পরিকল্পনা করতে গিয়ে ব্যর্থ হ'লে উভয়কেই প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় (১৫৮৭ খ্রীঃ)। মেরির মৃত্যুর সাথে সাথে ইংলণ্ডে ক্যাথলিকদের আধিপত্য স্থাপনের শেষ সম্ভাবনা দূর হওয়ায় ক্রুদ্ধ ও হতাশ স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সমরাভিযান চালান। ফিলিপ এলিজাবেথকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে বহু-সংখ্যক স্পেনীয় আর্মাডা বা সুবৃহৎ যুদ্ধজাহাজ নৌপ্রধান সিডোনিয়ার নেতৃত্বে ইংরাজ দরিয়ায় প্রেরণ করলেন। কিন্তু ইংরাজ নৌবাহিনীর হাতে স্পেনীয় আর্মাডাগুলোর শোচনীয় পরাজয় ঘটল। অধিকাংশ আর্মাডাই বিধ্বস্ত হয়ে গেল আর যে কটি অবশিষ্ট ছিল সেগুলোও এক প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে পড়ল। এই পরাজয়ের পরও একাধিক-বার ফিলিপ ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা ক'রে ব্যর্থ হয়েছিলেন। স্পেনের বিরুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইউরোপে ইংলণ্ডের সামরিক তথা রাজনৈতিক মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেল এবং ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক উচ্চাশা আরও ইন্ধন লাভ করল। অধিকন্তু, স্পেনের পরাজয়ে ইংলণ্ডে 'কাউণ্টার রিফর্মেশন' আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে গেল এবং প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মমতের বিজয় ঘোষিত হ'ল। ওয়ার্নার ও মার্টেনের মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে বলা চলে, "রাজনৈতিকভাবে এলিজাবেথের রাজত্বকাল হ'ল কাউন্টার রিফর্মেশন বা প্রতিঃধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সাথে সংগ্রামের কাহিনী।" প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল এলিজাবেথের একটি ব্যক্তিগত জয়। কাউণ্টার রিফর্মেশনের দীর্ঘস্থায়ী ঝড় কাটিয়ে উঠে এলিজাবেথ তাঁর জীবনের শেষভাগে জাতির কাছে এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। জি. আর. এলটন যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে ক্যাথলিক আক্রমণ প্রোটেস্টান্ট রাষ্ট্রের ভিত্তি নাড়াতেই যে শুধু ব্যর্থ হয়েছিল তাই নয়, বরং এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে একে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল।

এলিজাবেথ যে অত্যন্ত দৃঢ় ও দক্ষ হাতে তাঁর আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি খুবই স্বাধীনচেতা ছিলেন তাই পার্লামেণ্ট যাতে শাসন পরিচালনায় তাঁর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তারের সুযোগ না পায় সেদিকে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখেন। এলিজাবেথের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে ইংলণ্ডের সর্ব বিষয়ে যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটেছিল। কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতিবিধানের জন্য কতকগুলো বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয়। এই সময় দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানও অনেক উন্নত হয়েছিল। তবে এলিজাবেথের রাজত্বকালে সবচেয়ে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে। বাস্তবিকই, তাঁর

আমলকে ইংরেজী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হয়না। বিশ্ববন্দিত নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়র এলিজাবেথের সময়েই তাঁর অমর সাহিত্য কর্মগুলো সৃষ্টি করেন।

১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭১ বছর বয়সে এলিজাবেথ পরলোক গমন করেন।

এলেনবরা

[শাসনকাল ১৮৪২-১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ]

ব্রিটিশ ভারতের একজন গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। তিনি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ডের পরবর্তী শাসক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ভারতের শাসনভার গ্রহণ করার আগে তিনি কিছুকাল বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লর্ড এলেনবরার আমলে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা আইন বলে উচ্ছেদ করা হয়েছিল এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করে ভারতীয়গণকে নিয়োগের নীতি গ্রহণ করা হয়। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে লর্ড এলেনবরার মূল লক্ষ্য ছিল আফগান যুদ্ধে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ। লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলে আফগানিস্হানে বৃটিশ বাহিনীর শোচনীয় বিপর্যয় ঘটেছিল। এলেনবরা এক বিপুল সৈন্যবাহিনী ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সমেত আফগানিস্হানের দুই বিখ্যাত শহর কাবুল ও গজনীর উপর ধ্বংসলীলা চালান। তিনি ইংরাজদের আশ্রিত আমীর দোস্ত মহম্মদকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন। বাস্তবিকপক্ষে আফগান যুদ্ধে ইংরেজদের কোনো দিক থেকেই বিশেষ কোনো লাভ হয়নি বরং যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছিল। আফগানিস্হান অভিযান করা ছাড়া এলেনবরা ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ জয় করেন এবং গোয়ালিয়রের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল পরিস্হিতির সুযোগ নিয়ে রাজ্যটির উপর ইংরাজ কর্তৃত্ব স্হাপন করেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এলেনবরার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়।

ওডো

[শাসনকাল ৮৮৮-৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন ফ্রান্সের একজন রাজা। পিতা রবার্ট দি স্ট্রং এর মৃত্যুর পর ৮৮৮ খ্রীঃ ফরাসী অভিজাতগণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে সম্রাট ওডো ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ওডো রাজা হবার পর ফরাসীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বাস্তবিকই জনপ্রিয়তায় তিনি তাঁর পিতাকেও ছাড়িয়ে যান। দুর্ধর্ষ নর্সম্যান বা ভাইকিংদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। ওডো রাজা হয়েই নর্সম্যানদের সাথে এক তীব্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যথেষ্ট

বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁকে এক প্রতিকূল আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। চার্লস দি গ্রেট বা মহান চার্লসের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা বংশপরম্পরায় তাদের উচ্চ পদাধিকার ভোগ করতে থাকে। এইসব উচ্চপদস্থ অফিসাররা ওডোর কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকৃত হয়। বিশেষ করে তাঁকে আনজাও, গ্যাসকনি, ফ্ল্যাণ্ডার্স ও প্যারিসের প্রভাবশালী কাউণ্টদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। তারা ক্যারোলিঞ্জিয় বংশের চার্লস দি সিম্পলকে সিংহাসনে বসাবার জন্য ওডোর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকে। ওডোর রাজত্বকালের বাকী সময় এইসব ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতেই অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি সবশুদ্ধ দশ বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন। ৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে প্রভাবশালী প্রতিপক্ষের শক্তি উপলব্ধি করে তিনি স্বয়ং তাঁর ভ্রাতার পরিবর্তে উত্তরাধিকারী হিসাবে চার্লস দি সিম্পলকে মনোনীত করে যান।

ওডোয়েসার

[শাসনকাল ৪৭৬-৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ]

একজন ভ্যাণ্ডাল নেতা। তিনি ৪৭৬ খ্রীঃ রোমান সম্রাট রোমিউলাস অগাস্টুলাসকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইতালীতে ভ্যাণ্ডাল শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সতের বছর রাজত্ব করেন। ওডোয়েসার ইতালীর বিভিন্ন অঞ্চল তাঁর অনুচরদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর দুর্বল শাসন অস্ট্রোগথদের আক্রমণে ভেঙ্গে পড়ে। তাদের নেতা থিয়োডারিক ছিলেন একজন শক্তিশালী শাসক। থিয়োডারিক ২০০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ইতালী অভিমুখে অভিযান করেন। তিনি ড্যানিয়ুব এলাকা থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং দীর্ঘ সাতশো মাইল পথ অতিক্রম করে বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে অবশেষে ইতালীতে এসে পৌঁছান। ওডোয়েসার তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইতালী রক্ষার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করেন। কিন্তু প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেননি। তিনি শত্রু হস্তে ধৃত হন এবং তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় (৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

ওমর

[শাসনকাল ৬৩৪-৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ]

আবুবকরের মৃত্যুর পর ওমর ৬৩ খ্রীঃ মুসলিম জগতের খলিফা মনোনীত হন। আবুবকরের মত ওমরের খলিফা পদ লাভ করা নিয়ে কোনো মতবিরোধ উপস্থিত হয়নি। এক্ষেত্রে মহম্মদের পরিবারের সর্বাপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তির দাবিকে একবাক্যে স্বীকৃতি

জানানো হয়। ওমর ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন কৃতি পুরুষ। তিনি তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ববলে খলিফা পদকে যথেষ্ট উন্নীত ও শক্তিশালী করেন। তাঁর আমলে মুসলিম জগতে খলিফার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। খিলাফতের মহত্ব প্রতিষ্ঠায় ওমরের ছিল এক অগ্রণী ভূমিকা। তিনি মাত্র দশ বছরের মধ্যেই মিশর, পারস্য, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অনেক দেশ জয় করেন। তাঁর আমলে ইসলামের সাম্রাজ্য পূর্বে আফগানিস্থান থেকে পশ্চিমে ত্রিপোলি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ওমর একজন প্রতিভাবান শাসক ছিলেন এবং শাসনকার্যে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রবর্তিত নিয়মাবলী ও ব্যবস্থাসমূহ সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসাবে দামাস্কাস শহরকে বেছে নেন। মসজিদে প্রার্থনা করার সময় আততায়ীর ছুরিকায় মর্মান্তিকভাবে ওমরের জীবনাবসান হয়।

ওসমান

[শাসনকাল ৬৪৪-৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দ]

ওসমান হলেন মুসলিম দুনিয়ার তৃতীয় খলিফা। বিখ্যাত খলিফা ওমরের মৃত্যুর পর ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ওসমান খলিফা মনোনীত হন। মহম্মদের পোষ্যপুত্র ও জামাতা আলি খলিফা পদ লাভের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বয়সে বড় হওয়ায় অধিক জন-সমর্থন পেয়ে ওসমান খলিফা পদে আসীন হন। ওসমান খলিফা হবার পর পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের পথ থেকে বিচ্যুত হন। তিনি বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন এবং প্রভূত ধনসম্পদের মালিক হন। নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বহু নীতিবিগর্হিত কাজকর্ম করলে আনসার গোষ্ঠী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা ওসমানের বিরুদ্ধে এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং সুযোগ বুঝে তাঁকে হত্যা করে (৬৫৬ খৃঃ)। ওসমান মোট বারো বছর খলিফা পদে থাকার সুযোগ পান।



ওয়াভেল

[শাসনকাল ১৯৪৩-১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ]

ব্রিটিশ ফিল্ড মার্শাল ও ভারতের ভাইসরয় ছিলেন। তরুণ বয়সে আর্চিবল্ড পার্সিভাল ওয়াভেল সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে একটি চক্ষু হারান। আরব-ইহুদী বিরোধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার

উদ্দেশ্যে তিনি প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ বাহিনীর কমাণ্ডার ইন-চীফ পদ লাভ করেন। এরপর ওয়াভেল ব্রিটিশ ভারতের কমাণ্ডার-ইন-চীফের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জাপান মহাযুদ্ধে যোগদান করার পর তিনি ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক মাসের জন্য দূর প্রাচ্যে মিত্রশক্তির সর্বাধিনায়কের পদ লাভ করেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াভেল ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় তাঁর প্রধান কার্য ছিল ভারতবর্ষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তুত করা। তিনি তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে অনেকগুলি পুস্তকও রচনা করেছিলেন। ১৯৫০ সালে ৬৭ বছর বয়সে ওয়াভেলের জীবনাবসান হয়।



ওয়াশিংটন

[শাসনকাল ১৭৮৯-১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের সর্বপ্রধান সৈনিক ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট। তাঁর পূর্বপুরুষরা জাতিতে ইংরেজ ছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটন ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জিনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উচ্চশিক্ষালাভের বিশেষ সুযোগ পাননি। কিন্তু তিনি ছিলেন সৎ, সাহসী, পরিশ্রমী ও উচ্চাশাপ্রবণ। অল্প বয়সে সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ ক'রে তিনি সৈনিক হিসাবে তাঁর প্রতিভার পরিচয় রাখেন। আমেরিকায় ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হ'লে ওয়াশিংটন তাঁর শহরের নেতৃত্ব দেন। এরপর ফিলাডেলফিয়া শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলে তাতে তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। পরের বছর ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন আমেরিকার সেনাবাহিনীতে সৈন্যাধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ করেন। তেরোটি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা একমত হয়ে তাকে এই পদাধিকার প্রদান করে। সেই সময় থেকে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসান পর্যন্ত তিনি আমেরিকার আপামর জনসাধারণের প্রধান ভরসা ও অনুপ্রেরণার উৎসস্বরূপ ছিলেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে উপনিবেশের সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে আমেরিকাকে মুক্ত করতে সমর্থ

হয়েছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা ও ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়লাভ জর্জ ওয়াশিংটনের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় সন্দেহ নেই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তিনি নবগঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হন (১৭৮৯)। ঐবছরই ফ্রান্সে 'মহাবিপ্লব' শুরু হয়েছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তৃতীয়বার তিনি আর ঐ পদ গ্রহণে সম্মত হননি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'জন্মদাতা' এই মানুষটি ছিলেন বহুগুণের অধিকারী ইতিহাসের এক মহৎ চরিত্র। আমেরিকাবাসীর হৃদয়ে তিনি পেয়েছিলেন সুগভীর আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার এক অক্ষয় আসন। হেনরী লী'র ভাষায়, "তিনি ছিলেন যুদ্ধে প্রথম শান্তিতে প্রথম এবং দেশবাসীর হৃদয়ে প্রথম।" ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর জর্জ ওয়াশিংটন পরলোকগমন করেন।



ওয়েলেসলী

[শাসনকাল ১৭৯৮-১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ]

ব্রিটিশ ভারতের একজন গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী শাসক লর্ড মর্নিংটন ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট হিসাবে এদেশে কার্যভার গ্রহণ করেন 'মারকুইস অব্ ওয়েলেসলী' নামেই তিনি ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেছেন। ভারতবর্ষে এক জটিল ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ওয়েলেসলী কার্যভার গ্রহণ করেন। সেই সময় ইউরোপে ইংলন্ডের প্রবল শত্রু নেপোলিয়নের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তিনি ভারতবর্ষ অভিযানের পরিকল্পনা করছেন। ভারতের অভ্যন্তরেও নিজাম, পেশোয়া, সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি রাজ্যগুলোতে বহুসংখ্যক ফরাসী সামরিক অফিসার এবং ফরাসী সৈন্য বিরাজমান। মহীশূর রাজ্যে টিপুসুলতান ও ইংরাজ শক্তিকে চূড়ান্ত আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ওয়েলেসলী একজন বিচক্ষণ ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় রাজ্যগুলোকে সম্পূর্ণ বশীভূত

করে ভারতে ইংরেজ কর্তৃত্বকে নিরাপদ এবং নিষ্কণ্টক করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতির প্রবর্তন করে বহু দেশীয় রাজ্যকে ইংরাজদের আশ্রিত করদ রাজ্যে পরিণত করলেন। ভারতবর্ষে লর্ড ওয়েলেসলীর যে তিনটি প্রতিপক্ষ ছিল (টিপু সুলতান, নিজাম ও মারাঠা শক্তি) তাদের মধ্যে দুর্বলতম নিজাম প্রথমেই এই নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু হায়দরের সুযোগ্য পুত্র টিপু এই নীতি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয়। বীরের মত যুদ্ধ করে অবশেষে টিপু শত্রুসৈন্যের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেন। ইংরাজ সৈন্য টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন দখল করে নেয়। টিপুর পতনের সঙ্গে সঙ্গে মহীশূর রাজ্যটি ওয়েলেসলীর অধীনে আসে। যে কোনো উপায়ে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার ওয়েলেসলীর মূল লক্ষ্য হওয়ার দরুন তিনি একে একে তাঞ্জোর, সুরাট, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থান নানা অজুহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যাধীনে আনয়ন করেন। তিনি দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মারাঠাদের পরাজিত করেন এবং সুরজি-অর্জন গাঁওয়ের সন্ধির মাধ্যমে সিন্ধিয়াকে অধীনতামূলক মৈত্রী গ্রহণে বাধ্য করেন। এইভাবে ওয়েলেসলী ভারতবর্ষে ইংরাজ কোম্পানীর শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। এছাড়া ভারতবর্ষের বাইরে ফরাসী প্রভাব নষ্ট করার জন্য তিনি বিভিন্ন প্রয়াস চালান এবং নেপোলিয়নের ভারত অভিযানের পরিকল্পনা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে পারস্যে দূত প্রেরণ করেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলেসলী স্বদেশে ফিরে যান। কোম্পানীর আমলে এদেশে যে কয়জন শাসনকার্য পরিচালনা করেন ওয়েলেসলী নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সময়েই ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসন যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' ও কলকাতার 'গভর্নরস হাউস' তাঁর আমলেই স্থাপিত হয়েছিল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরও দীর্ঘকাল জীবিত থেকে অবশেষে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলেসলীর মৃত্যু হয়।



ঔরঙ্গজেব

[শাসনকাল ১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ]

বিশিষ্ট মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব পিতা শাহজাহানের মৃত্যুর পর মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল শাসনকার্য পরিচালনা

করেন। সিংহাসন লাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শাজাহানের মৃত্যুর আগেই ঔরঙ্গজেব দুবার তাঁর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান পালন করেন। শাহজাহানের মৃত্যু সংবাদ পাবার পরই তিনি তৃতীয় বারের জন্য সিংহাসনে আরোহণ ও অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথম ২৩-২৪ বছরের রাজনৈতিক কার্যাবলী উত্তর ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। পরবর্তী সময়টুকু তিনি দাক্ষিণাত্য নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যেই তাঁর জীবনাবসান হয়। উত্তর ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অহোম ও কোচবিহারের রাজারা মোগল কর্তৃত্ব অস্বীকার করলে ঔরঙ্গজেব তাদের দমনের উদ্দেশ্যে মীরজুমলাকে প্রেরণ করেন। কোচবিহারের রাজা মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করলেও অহোমদের সম্পূর্ণ দমন করতে ঔরঙ্গজেব ব্যর্থ হন। মীরজুমলার মৃত্যুর পর শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আরাকানের রাজার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। শায়েস্তা খাঁ বঙ্গোপসাগরে সন্দীপ দ্বীপ দখল করেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুর্ধর্ষ আফ্রিদি, ইউসুফজাই প্রভৃতি পাঠান উপজাতিগুলো বিদ্রোহ শুরু করলে ঔরঙ্গজেব তাদের দমনের চেষ্টায় বহু সময় ও অজস্র অর্থ ব্যয় করে ফেলেন। এরপর ঔরঙ্গজেব অত্যধিক ধর্মীয় গোঁড়ামির দ্বারা পরিচালিত হয়ে পিতৃ পিতামহের রাজপুতনীতি পরিবর্তন করে এক মস্ত ভুল করেন। তিনি মারওয়াড়ের মহারাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর মারওয়াড় অধিকার করার পরিকল্পনা করেন। ঔরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিত সিংহকে উত্তরাধিকারী হিসাবে মানতে স্বীকৃত হননি। শোনা যায় তিনি অজিত সিংহকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের শর্তে স্বীকৃতি জানাতে রাজী হয়েছিলেন। রাজপুতরা এই প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ করতে থাকে। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর জিজিয়া করের বোঝা পুনরায় চাপালে মেবারের রাণা রাজসিংহ অপমানিত বোধ করেন এবং মোগলদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে ঔরঙ্গজেবের রাজপুত যুদ্ধনীতি ছিল রাজনৈতিক অজ্ঞতার এক চরম দৃষ্টান্ত, কারণ প্রকৃতপক্ষে সম্রাট আকবরের সময় থেকে ভারতের শ্রেষ্ঠবীর রাজপুতরা ছিল মোগল শক্তির প্রধান উৎস। অতিরিক্ত ধর্মীয় গোড়ামীর বশবর্তী হয়ে সম্রাট ঔরঙ্গজেব নানাভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুরা মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে মথুরার জাঠ কৃষক এবং দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলের সৎনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে। এই সময় শিখসম্প্রদায়ও গুরুগোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম শুরু করে। হিন্দুশক্তির পুনরুত্থানের চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় দাক্ষিণাত্যে মারাঠাবীর শিবাজীর নেতৃত্বে। শিবাজী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি ঔরঙ্গজেবের পক্ষে এক মারাত্মক ত্রাসের কারণ হিসাবে

বিরাজ করতে থাকেন। এমনকি শিবাজীর মৃত্যুর পরও (১৬৮০ ঔরঙ্গজেব মারাঠাদের সম্পূর্ণরূপে দমন করতে ব্যর্থ হন। ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে শায়েস্তা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। এইভাবে সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে অবিরাম বিরোধী শক্তিগুলোর সাথে একের পর এক যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে প্রচুর সৈন্য ও অর্থের অপচয় ঘটে এবং মোগল রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। ব্যক্তিগত জীবনে ঔরঙ্গজেব ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান একজন সুন্নী মুসলমান। তিনি নিজেকে ইসলামের আদর্শ সেবক বলে মনে করতেন এবং তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল হিন্দুপ্রধান হিন্দুস্থানকে (দার-উল-হারব) একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক রাষ্ট্রে দার-উল-ইসলাম) পরিণত করা। এই উদ্দেশ্য সফল করতে গিয়ে তিনি হিন্দুদের উপর নানা প্রকার নির্যাতন শুরু করেন। তিনি কুখ্যাত জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্তন করেন, হিন্দু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নানা ধরনের অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করেন এবং হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে সেগুলোকে মসজিদে পরিণত করেন। এমনকি হিন্দুদের ভালো পোশাক পরা, ভাল ঘোড়ায় চড়া ও উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে একত্র হয়ে আমোদ-প্রমোদ করাও তিনি নিষিদ্ধ করে দেন। তিনি হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্র মথুরার কেশব রায়ের মন্দির ধ্বংস করেন এবং মথুরার নাম পরিবর্তন করে ইসলামাবাদ নামকরণ করেন। হিন্দুদের বহু দেবোত্তর সম্পত্তিও তিনি বাজেয়াপ্ত করেন। এছাড়া তিনি নানাভাবে হিন্দুদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করেন। ধর্মীয় গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে তিনি দাক্ষিণাত্যের শিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত দুই রাজ্য গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করেন। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে তাঁরই নির্দেশে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় (১৬৮৯)। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পূর্ণ করলেও এই অভিযানে বার হয়ে তিনি জীবনের মূল্যবান সুদীর্ঘ ২৫টি বছর নিষ্ফলভাবে অতিবাহিত করেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযান তাঁর এবং মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে বৃদ্ধ সম্রাট তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতির ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তখন আর করার কিছু ছিল না। শেষ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যেই বৃদ্ধ অবসন্ন সম্রাট ভগ্ন হৃদয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (১৭০৭ খৃীঃ)। ঔরঙ্গজেবের নীতিগুলো যে মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল সে বিষয়ে অধিকাংশ ঐতিহাসিক একমত। ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে নানা গুণের সমাবেশ ঘটেছিল এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি না থাকলে তিনি শ্রেষ্ঠ মোগল সম্রাট হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভ করতে পারতেন বলে কোনো কোনো ঐতিহাসিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ধর্মনিষ্ঠা ও সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য তাঁকে 'জিন্দাপীর'বলা হত। ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত সাহসী ও পরিশ্রমী শাসক ছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য তাঁর কর্ম-

দক্ষতা ও অন্যান্য গুণাবলী সাম্রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ভাবে প্রযুক্ত হতে পারেনি।

সাম্প্রতিক কালের কোনো কোনো গবেষক ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির পশ্চাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করেন। এঁদের মতে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যে ধর্মীয় অনুদারতা ও সংকীর্ণতার অভিযোগ আনা হয়ে থাকে তার মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে। আপাতদৃষ্টিতে যে সব কার্যকলাপকে তাঁর ধর্মনীতির অঙ্গ বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন বিজড়িত ছিল। এইসব গবেষকের পর্যবেক্ষণ কতদূর সত্য ভবিষ্যতই তার বিচার করবে। তবে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল সম্পর্কে পুনর্মূল্যায়ণের প্রয়োজনকে হয়ত সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না।

কণিষ্ক

[শাসনকাল ৭৮–১২০ খ্রীষ্টাব্দ]

কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট হলেন কণিষ্ক। তিনি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে চল্লিশ বছরেরও অধিককাল শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কণিষ্কের বাল্যজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তিনি ছিলেন একজন নিপুণ সমরনায়ক এবং তিনি ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এমনকি ভারতের বাইরেও তিনি তাঁর সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তিনি একে একে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, মথুরা এবং মগধের অংশবিশেষ জয় করেন। চীন অভিযান করে তিনি কাশগড়, ইয়ারকন্দ, খোটান প্রভৃতি প্রদেশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য পূর্বে বারাণসী থেকে পশ্চিমে আফগানিস্থান এবং উত্তরে বোখারা থেকে দক্ষিণে উজ্জয়িনী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুরুষপুর (বর্তমানে পেশোয়ার) ছিল তাঁর রাজধানী।

কণিষ্ক শুধুমাত্র সাম্রাজ্যজয়ী পুরুষ ছিলেন না, শাসক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দান করেন। তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে অনেকগুলি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক প্রদেশের ভার একজন ক্ষত্রপ বা গভর্ণরের হাতে অর্পণ করেন। দৃঢ় হাতে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। কণিষ্ক প্রথমে শিব, সূর্য ও অগ্নির উপাসক ছিলেন ; পরে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীদের সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি সন্ন্যাসীদের জন্য বহু স্তূপ ও মঠ নির্মাণ করেন এবং বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে বহু বৌদ্ধমূর্তি তৈয়ারী করান। বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিরোধ মিটাবার জন্য তিনি

কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধসংগীতি আহবান করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তিনি ধর্মপ্রচারকও প্রেরণ করেছিলেন।

কণিষ্কের মধ্যস্থতায় তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। নাগার্জুন, বসুমিত্র, অশ্ব ঘোষ প্রভৃতি খ্যাতনামা বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। এছাড়া বিখ্যাত আয়ুর্বেদাচার্য চরক তাঁর যথেষ্ট আনুকূল্য লাভ করেন। একজন নির্মাতা হিসাবেও কণিষ্কের অবদান ছিল যথেষ্ট। তাঁর আমলে বহু মঠ, অট্টালিকা, স্ট্যাচু প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল। তিনি কাশ্মীরে কণিষ্কপুর নামে একটি চমৎকার শহর তৈরী করেন। গান্ধার শিল্পকলার বিকাশলাভও ঘটে তাঁর সময়। মথুরায় প্রাপ্ত কণিষ্কের মস্তকবিহীন ব্রোঞ্জ মূর্তিটি শিল্পকলার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কণিষ্কের আমলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য যথেষ্ট বিস্তারলাভ করেছিল। চীন ও রোমের সাথে তাঁর বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় ছিল বলে জানা যায়। আনুমানিক ১২০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কণিষ্কের মৃত্যু হয়।

কদফিস প্রথম

[শাসনকাল প্রথম খ্রীষ্টাব্দ]

ভারতবর্ষে কুষাণ শাসনের সূচনাকারী মধ্য এশিয়ার ইউ-চি জাতির নেতা হলেন প্রথম কদফিস (কদফাইসেস)। ইতিহাসে ইনি কুজুল কদফিস নামে পরিচিত। হূণ আক্রমণের চাপে পড়ে ইউ-চি দের একটি শাখা পিতৃভূমি ছেড়ে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে কুজুল কদফিসের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হয় এবং ইন্দো-পার্থিয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে কাবুল, কাশ্মীর ও প্রাচীন গন্ধারের বেশ কিছু অংশ জয় করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। এতদিন পর্যন্ত এইসব স্থান ইন্দো পার্থিয় বা পহলব ক্ষত্রপদের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। কুজুল কদফিস সিন্ধুর পশ্চিম তীর পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তার করেছিলেন—ভারতের বেশি অভ্যন্তরে তিনি প্রবেশ করেননি। তাঁর রাজত্বকালের সন-তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। মোটামুটিভাবে ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন বলে ডঃ ডি. সি সরকার অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর আমলের মুদ্রাগুলো পরীক্ষা করে এই মতকেই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

কুজুল কদফিস একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন। ইউ চি জাতির মানুষজনকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বীয় নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এক নতুন বিদেশী রাজবংশের শাসন পত্তন করার কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য। কুজুলের রাজত্বকালের মুদ্রাগুলো থেকে তাঁর রাজ্য জয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁর মুদ্রা অনুযায়ী জানা যায় তিনি কাবুল উপত্যকা থেকে

পার্থিয়দের বিতাড়িত ক'রে 'মহারাজা' উপাধি ধারণ করেছিলেন। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে গন্ধার অঞ্চল ও সিন্ধুর পশ্চিম তীরবর্তী রাজ্যগুলো তিনি পার্থিয়রাজ গণ্ডোফার্ণেসের মৃত্যুর পর জয় করেন।

বিভিন্ন মুদ্রা ও সাহিত্যিক উপাদান থেকে কুজুল কদফিসের সাম্রাজ্যসীমা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। তাঁর পিতৃভূমি ব্যাকট্রিয়া, পার্থিয়ার অংশবিশেষ, কাবুল উপত্যকা, কিপিন বা কাফ্রিস্থান (যা কারো কারো মতে কাশ্মীর) এবং সিন্ধুনদ পর্যন্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম এলাকা জুড়ে কুজুলের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

কুজুল কদফিস তাঁর কোনো কোনো মুদ্রায় নিজেকে 'সত্যধর্মস্থিত' বলে দাবি করেছেন। অনুমান করা হয় তিনি শৈব অথবা বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। কুজুল কদফিস আশী বছর জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়।

কদফিস দ্বিতীয়

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী]

কুষাণ বংশের শাসক ছিলেন দ্বিতীয় কদফিস বা কদফাইসেস। প্রথম কদফিসের মৃত্যুর পর তিনি রাজা হন। ইতিহাসে তিনি বিম কদফিস নামে পরিচিত। দ্বিতীয় কদফিসের শাসনকালের সময় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ প্রথম খ্রীষ্টাব্দে তিনি কুষাণদের নেতা হন এবং ভারত অভিযান করেন। কুষাণরা ছিল মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি 'ইউ-চি' দের একটি শাখা বা গোষ্ঠী। দ্বিতীয় কদফিস উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি পার্থিয় সম্রাটকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং ইন্দো-পার্থিয়দের কাছ থেকে কান্দাহার দখল করে নেন। মথুরায় প্রাপ্ত দ্বিতীয় কদফিসের মূর্তি ও অন্যান্য তথ্য থেকে ঐ অঞ্চলে তাঁর প্রভাব বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় কদফিসের রাজত্বকাল মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার ও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রোমান ওজনরীতির অনুকরণে তাম্র ও স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। এ বিষয়ে শুধু পরবর্তী কুষাণ রাজগণই নয়, গুপ্তরাজাদেরও তিনি পথিকৃৎ। তাঁর সময়ে চীনদেশ ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে ভারতবর্ষের বাণিজ্য রীতিমত প্রসারলাভ করে। আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় এইসব অঞ্চলের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

দ্বিতীয় কদফিস সম্ভবতঃ শৈবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মুদ্রায় তিনি নিজেকে মহেশ্বর উপাধিকারী বলে পরিচয় দিতেন। রোমের সাথে বাণিজ্যের ফলে তিনি প্রভূত

স্বর্ণের অধিকারী হন এবং তাঁর আমলের স্বর্ণ মুদ্রাগুলো তাঁর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। রোমের সম্রাটের সাথে দ্বিতীয় কদফিসের সুসম্পর্ক বজায় ছিল এবং উভয়ের মধ্যে দূত বিনিময় চলত। দ্বিতীয় কদফিসের শাসন কত বছর স্থায়ী হয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা আজও সম্ভব হয়নি।

কনরাড দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১০২৪-১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বিতীয় হেনরীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় কনরাড ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কনরাড ছিলেন ফ্রাঙ্কোনিয়ার ডিউক। তিনি দ্বিতীয় হেনরীর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব নেন। তিনি রাজার ক্ষমতা এবং রাজ্যসীমা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন। বার্গাণ্ডীর শেষ রাজা দ্বিতীয় কনরাডকে তাঁর রাজ্য অর্পণ করলে তিনি বার্গাণ্ডীরও রাজা হন। তিনি জার্মানীর ডাচিগুলোর কর্তৃত্বভারও গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় কনরাড তাঁর প্রজাদের নিকট প্রয়োজনমত সামরিক সাহায্যের আবেদন জানাতেন। তিনি তাঁর অধীনস্থ রাজাদের নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান ক'রে তাঁদের কৃতজ্ঞতাভাজন হন এবং নিজের শক্তিবৃদ্ধি করেন। এইসব অধীনস্থ প্রধানরা প্রয়োজনমত তাঁকে অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করত। দ্বিতীয় কনরাড নিঃসন্দেহে একজন বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। পনের বছর রাজত্ব করার পর ১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

কনষ্টানটাইন ষষ্ঠ

[শাসনকাল ৭৮০-৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ]

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের একজন রাজা। তিনি ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পিতা চতুর্থ লিওর পরবর্তী শাসক হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হবার পূর্ব পর্যন্ত মোট সতের বছর রাজত্ব করেন। নাবালক অবস্থায় তিনি সিংহাসনে বসেন বলে তাঁর মা তাঁর হয়ে রাজকার্য দেখাশোনা করতেন। ষষ্ঠ কনস্টানটাইনের মা ছিলেন মূর্তি পূজার সমর্থক যদিও তিনি তাঁর স্বামীর কাছে তাঁর মনোভাব গোপন রেখেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর নাবালক পুত্রের অভিভাবক হিসাবে তিনি 'আইকনো-ডিউলিক'দের উপর সর্বপ্রকার অত্যাচারের অবসান ঘটান। শুধু তাই নয়, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যে 'আইকনো-ডিউলিকরা' আবার মাথা

চাড়া দিয়ে ওঠে এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র মূর্তিপূজা ব্যাপক হারে চলতে থাকে। অবাধ্য মূর্তিপূজা বিরোধী বিশপদের তিনি সমাজচ্যুত বলে ঘোষণা করেন। বেশ কয়েক বছর এইভাবে চলবার পর ষষ্ঠ কনস্টানটাইন সাবালক হয়ে স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর মা'র প্রিয় অনুচরদের রাজপ্রাসাদ থেকে বহিষ্কার করেন এবং সাময়িক ভাবে মাকে বন্দী করে রাখেন। কিন্তু তাঁর মা কারামুক্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী রমণী। অধিকন্তু, ক্ষমতার লোভ তাঁকে নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর চক্রান্ত সফল হয়। ৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে নিজে রাজসিংহাসন দখল করে বসলে ষষ্ঠ কনস্টানটাইনের এক নিষ্প্রভ, গুরুত্বহীন রাজত্বের উপর যবনিকা নেমে আসে।

কনষ্টানটাইন কপরোনিমাস

[শাসনকাল ৭৪০-৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ]

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের একজন রাজা। তিনি ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে পিতা লিওর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকাল সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। পিতার আমলে তিনি শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করেন। যীশুখ্রীষ্টের মূর্তিকে পূজা করা নিয়ে পিতা লিওর আমলে যে ঝড় উঠেছিল তা তিনি প্রত্যক্ষ করেন। সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরই তাঁকে মূর্তিপূজার সমর্থকদের (যাদের বিরোধীরা বলত আইকনো-ডিউলিক) এক বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি দৃঢ় হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং তাদের নেতা আর্টাভাসদুসকে (যিনি নিজেকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন) অন্ধ করে এক নির্জন মঠে প্রেরণ করেন। আর্টাভাসদুসের প্রধান সমর্থকদের শিরচ্ছেদ করা হয়। ফলে এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন করা সম্ভব হয়। আইকনো-ডিউলিকদের বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করার অভিপ্রায়ে কনস্টানটাইন কনস্টান্টিনোপলে একটি সাধারণ সম্মেলন আহবান করেন। এই সম্মেলনে তিনশোরও বেশি বিশপ যোগদান করেছিল। এই সম্মেলনের সম্মতি ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে কনস্টানটাইন আইকনো ডিউলিকদের 'হেরেটিক' (প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী অবিশ্বাসী) হিসাবে ঘোষণা করে তাদের উপর অত্যাচার চালান। সন্ন্যাসীরা ছিল মূর্তিপূজার প্রধান সমর্থক এবং জনসাধারণের উপর তাদের প্রভাব ছিল খুবই বেশি। তাই কনস্টানটাইন মঠগুলোকে উচ্ছেদের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু এই কাজ সহজসাধ্য ছিল না। তিনি বহু সন্ন্যাসীকে জোর করে বিবাহ দেন এবং অনেককে দেশ থেকে নির্বাসিত করেন। ফলে তিনি দেশের জনসাধারণের একাংশের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টানটাইন কপরোনিমাস পরলোক গমন করেন।



কনস্টানটাইন দি গ্রেট

[শাসনকাল ৩০৬-৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন রোমের একজন বিখ্যাত সম্রাট। কনস্টানটাইন ২৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৪ বছর বয়সে রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল তিরিশ বছরেরও অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল। জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পর থেকে জাস্টিনিয়ানের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর মত এত ক্ষমতাশালী ও প্রতিভাবান শাসক রোমের সিংহাসনে আর কেউ অধিষ্ঠিত হননি। কনস্টানটাইন ছিলেন একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও দক্ষ শাসক। তাঁর আমলে রোম সাম্রাজ্যের সীমা বিশালাকার ধারণ করেছিল। বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে এতবড় সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা এবং একটি দৃঢ় ও সুশৃংখল কেন্দ্রীয় শাসনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছিল খুবই কঠিন সমস্যা। রোম নগরী থেকে এই সুবিশাল সাম্রাজ্যকে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা বাস্তবিকই একরকম অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া জার্মান উপজাতিগুলোর দিক থেকে সাম্রাজ্যের রাজধানী ঘন ঘন আক্রান্ত হবার আশংকা ছিল। এই সব অসুবিধার কথা চিন্তা ক'রে কনস্টানটাইন বসফরাসের তীরে বাইজান্টিয়াম নামক স্থানে তাঁর নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাটের নামানুসারে এই নতুন রাজধানীর নামকরণ হয় 'কনস্টান্টিনোপল'। উত্তরোত্তর স্থানটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে ও গুরুত্ব বাড়তে থাকে। কালক্রমে এটি ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহরে পরিণত হয়।



কর্ণওয়ালিশ

[শাসনকাল ১৭৮৫-১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশ ভারতের একজন গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের স্থলাভিষিক্ত হন। বিলাতের অভিজাত বংশের সন্তান কর্ণওয়ালিশ ৪৮ বছর বয়সে ভারতে কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি একজন সৎ ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, তবে ভারতীয় জনগণ সম্পর্কে লর্ড কার্জনের মতই অত্যন্ত নিম্ন ধারণা পোষণ করতেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশ পক্ষের একজন সেনাপতি ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর ভারত শাসনকালে বেশ কিছু অপকীর্তির জন্য ইংলণ্ডে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। এই অবস্থায় বিলাতের কর্তৃপক্ষ এমন একজন যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করেন যিনি সঠিকভাবে কোম্পানীর শাসন পরিচালনা করতে পারবেন। কর্ণওয়ালিশ প্রথমেই কোম্পানীর কর্মচারীদের দুর্নীতি দমনে তৎপর হলেন। তিনি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা, নজরানা কিংবা উৎকোচ গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেন। বেশ কয়েকজন দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীকে তিনি বরখাস্তও করেন। কর্ণওয়ালিশ প্রথমেই বাণিজ্য দপ্তরের সংস্কার সাধনে মনোযোগী হন। তিনি বাণিজ্য বোর্ডের সদস্য সংখ্যা এগারো থেকে কমিয়ে পাঁচে নিয়ে আসেন। তিনি কোম্পানীর মাল সরবরাহের জন্য কনট্রাক্ট প্রথার পরিবর্তে এজেন্সী প্রথার প্রচলন করেন। শাসন বিভাগের উন্নতিকল্পে কর্ণওয়ালিশ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান এবং ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শাসন ও বিচার বিভাগকে পৃথক করে দেন। জেলার কালেক্টরদের শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়। শাসন-কার্যের সুবিধার্থে কর্ণওয়ালিশ সুবা বাংলাকে ২৩টি জেলায় ভাগ করেন। হেস্টিংসের আমলে জেলার সংখ্যা আরও অনেক বেশি ছিল। আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য তিনি কলকাতায় পুলিশ কমিশনারের পদ সৃষ্টি করেন। ভারতীয়দের চরিত্র সম্পর্কে কর্ণওয়ালিশের ধারণা ভাল না-থাকায় তিনি শাসন ও বিচার বিভাগে ভারতীয়দের নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন না। কর্ণওয়ালিশ 'রুল অব ল' বা 'আইনের শাসন' প্রবর্তনে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাঁর আমলে দেশের বিচার ব্যবস্থারও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার

সাধন করা হয়। তিনি জেলাগুলোর বিচারের জন্য জেলা জজ নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শহরে সিটিকোর্ট স্থাপিত হয়। ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের উপর দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়। কলকাতা, পাটনা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শহরে প্রাদেশিক দেওয়ানী আপীল আদালত স্থাপন করা হয়। কর্ণওয়ালিশের শাসনকালের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 'কর্ণওয়ালিশ কোড' বা আইনবিধির প্রবর্তন যা ঐতিহাসিকদের মতে এদেশে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছে। তবে কর্ণওয়ালিশের শাসনকালের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হ'ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কর্ণওয়ালিশ প্রথমে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারের সাথে দশশালা বন্দোবস্ত করেন। চার বছর পর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জমিদারের সাথে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সিদ্ধান্ত নেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা হয়েছে এবং এই ব্যবস্থার দোষ-গুণ উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। তবে এই ব্যবস্থার কুফলের দিকটি বেশি দেখে স্বাধীন ভারত সরকার জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেছেন। কর্ণওয়ালিশের সময়ে ভারতের মহীশূর রাজ্যটি ইংরাজ কোম্পানীর প্রবলতম প্রতিপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হয়। কর্ণওয়ালিশ এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে পেশোয়া ও নিজামের সাথে সম্মিলিতভাবে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করলে টিপু সুলতান সন্ধি করতে বাধ্য হন (১৭৯২)। এই যুদ্ধই ইতিহাসে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ বলে পরিচিত। এই যুদ্ধে টিপুর পরাজয় মহীশূরের পতনের সূচনা করে। আটবছর দৃঢ় হস্তে শাসন-কার্য পরিচালনা করার পর কর্ণওয়ালিশ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে লর্ড ওয়েলেসলীর পরবর্তী শাসক হিসাবে তিনি পুনরায় ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে আসেন। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই কর্ণওয়ালিশ পরলোকগমন করেন (১৮০৫)।



কাভুর

[শাসনকাল ১৮৫২-১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ]

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ্। কাউন্ট ক্যামিল্লো বেনসোডি কাভুর ছিলেন ইতালীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রধান পুরুষ।

কাভুরের নেতৃত্বেই ইতালী ঐক্যবন্ধ আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায়। কাভুর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে সার্ডিনিয়া পিডমণ্টের প্রধানমন্ত্রী হন। সেই সময় ইতালী বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অপর একজন স্বদেশপ্রেমিক ম্যাৎসিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ইতালীকে ঐক্যবন্ধ করার প্রয়াস চালান। কিন্তু কাভুর উপলব্ধি করেন একমাত্র কূটকৌশলের মাধ্যমেই ইতালীর ঐক্য স্থাপন সম্ভব হতে পারে। তাই তিনি ইতালীর সমস্যাকে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোর সামনে উপস্থিত করেন এবং বহু স্থানে ইতালীর ঐক্যসাধনের পক্ষে প্রচারকার্য চালান। সেইসঙ্গে তিনি নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারের দ্বারা নিজের রাজ্যটিকে উন্নত করে তোলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হলে তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পনের হাজার সৈন্য নিয়ে ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষে যোগ দেন। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইতালীর ঐক্য আন্দোলনের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখান এবং সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেন।

কাভুর জানতেন ইতালীর ঐক্যসাধনের পথে অস্ট্রিয়া ছিল প্রধান অন্তরায়। তাই তিনি একটা অজুহাত দেখিয়ে ফ্রান্সের সাথে যুগ্মভাবে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত হ'লে লম্বার্ডি সার্ডিনিয়া-পিডমণ্টের সাথে যুক্ত হ'ল। অস্ট্রিয়া লম্বার্ডির উপর সকল দাবি পরিত্যাগ করে গেলে মধ্য ইতালীর রাজ্যগুলোয় কাভুরের সমর্থকরা এক বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সার্ডিনিয়া পিডমণ্টের সাথে সংযুক্তির দাবি জানায়। তৃতীয় নেপোলিয়নের মধ্যস্থতায় গণভোটের মাধ্যমে মধ্য ইতালীর প্রায় সমগ্র অংশই সার্ডিনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের অধীনে আসে। এই সময় গ্যারিবল্ডী নামক একজন দেশপ্রেমিক তাঁর বিখ্যাত 'লাল কুর্তা' বাহিনী নিয়ে দক্ষিণ ইতালীর সিসিলি ও নেপল্স্ রাজ্য জয় করে মধ্য ইতালীতে পোপের রাজ্য জয়ের জন্য অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে কাভুরের নির্দেশমত সার্ডিনিয়া-পিডমণ্টের রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল পোপের রাজ্য জয় ক'রে নেপল্সে এসে উপস্থিত হ'লে গ্যারিবল্ডী দক্ষিণ ইতালীর কর্তৃত্বভার তাঁর হাতে ছেড়ে দেন। ফলে ভেনিসিয়া ও রোম ছাড়া কাভুরের নেতৃত্বে ইতালীর ঐক্যসাধন সম্পূর্ণ হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কাভুর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ম্যাৎসিনি, কাভুর, গ্যারিবল্ডী এই তিনজনকেই ইতালীর ঐক্য আন্দোলনের প্রধান সৈনিক হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তবে ঐতিহাসিকদের মতে কাভুরের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশি। কাভুর যে ভাবে স্থির মস্তিষ্কে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিপুণ কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ ক'রে ইতালীর ঐক্যবিধানের মত এতবড় একটি কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন তা ভাবলে বাস্তবিকই বিস্মিত হতে হয়। ঐতিহাসিক এ্যালিসন ফিলিপ্স্-এর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ "জাতি হিসাবে ইতালীর আত্মপ্রকাশ কাভুরের সারা

জীবনের কর্মকাণ্ডের উত্তরাধিকার মাত্র।—অন্যেরা জাতীয় মুক্তির আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠাবান ছিলেন; তিনিই জানিতেন কি করিয়া সে আদর্শকে সম্ভাবনার গণ্ডীতে রূপায়িত করা চলে, কোনও হীন চক্রগত স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা তিনি তাহা কলুষিত হইতে দেন নাই; নিষ্ফলা আকাশ কুসুমের অনুসরণ তিনি করেন নাই; বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যপথ ধরিয়া স্বচ্ছন্দে তিনি স্বীয় গন্তব্য পথে চলিয়াছেন, এবং সর্বশেষে ইহাকে দান করিয়াছেন একটি সুসংগঠিত সৈন্যদল, পতাকা, রাষ্ট্র এবং বৈদেশিক মিত্রদল।"

(অধ্যাপক শান্তিময় রায়ের অনুবাদ)।

ইতালীর মুক্তি আন্দোলনে তাঁর মহান অবদানের জন্য কাভুর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।



কামালপাশা

[শাসনকাল ১৯২৩-১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ]

আধুনিক তুরস্কের জনক মুস্তাফা কামাল পাশা বা কামাল আতাতুর্ক ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আঠাশ বছর বয়সে তিনি 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনে যোগ দেন এবং স্বৈরাচারী শাসক আবদুল হামিদকে নানাপ্রকার শাসন সংস্কার প্রবর্তনে বাধ্য করেন। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে তিনি জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় ঘটলে তুরস্কের সুলতান ষষ্ঠ মহম্মদ মিত্রশক্তির সাথে অসম্মান জনক শর্তে সেভ্রের চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হন। কামাল পাশা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি মনোনীত হয়ে সেভ্রের চুক্তিকে অস্বীকার করেন। তিনি তুরস্ককে সর্বপ্রকার বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে সেখানে একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করেন। তিনি সুলতান পদেরও বিলোপসাধন করেন। তিনি তুরস্ককে দ্রুত উন্নত ও শক্তিশালী করার জন্য নানাপ্রকার শাসন সংস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন। তুরস্ককে মধ্যযুগীয় মানসিকতা থেকে মুক্ত

ক'রে তিনিই সর্বপ্রথম একে আধুনিক ক'রে তোলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খলিফা পদ উঠিয়ে দিয়ে তুরস্ককে একটি 'ধর্ম নিরপেক্ষ' দেশ বলে ঘোষণা করেন। তিনি পাশ্চাত্যদেশগুলোর অনুকরণে তুরস্কের অগ্রগতি ও আধুনিকীকরণের কাজকে ত্বরান্বিত করেন। কামাল পাশার বৈদেশিক নীতি ছিল শান্তিপূর্ণ। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক লীগ অব নেশনস্ এর সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক তুরস্কের স্রষ্টা এই অসাধারণ মানুষটি পরলোক গমন করেন।

কায়কোবাদ

[শাসনকাল ১২৮৭-১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ]

কুতুবউদ্দিন আইবক প্রতিষ্ঠিত দাস বংশের শেষ সুলতান মইজউদ্দিন কায়কোবাদ ছিলেন গিয়াসউদ্দিন বলবনের পৌত্র। তাঁর পিতার নাম ছিল বুঘরা খান। বুঘরা খান দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করায় দিল্লীর প্রভাবশালী ওমরাহগণ তাঁর পুত্র কায়কোবাদকে মসনদে বসায় (১২৮৭)। সিংহাসনে আরোহণকালে কায়কোবাদ ছিলেন সতের বছরের তরুণ। তিনি ছিলেন দুর্বল ও অপরিণতবুদ্ধিসম্পন্ন। শক্ত হাতে শাসনকার্য পরিচালনা করার যোগ্যতা ও অভিপ্রায় কোনটাই তার ছিল না। তাঁর আমলে দিল্লীর কোতোয়াল মালিক নিজামউদ্দিন খুব প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তিনি নতুন সুলতানের দুর্বলতার সুযোগে দিল্লীর সিংহাসন দখলের জন্য প্রস্তুতি চালাতে থাকেন। বলবনের অপর পৌত্র কাই খসরুকে তাঁরই নির্দেশে হত্যা করা হলে দিল্লীতে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই অরাজক পরিস্থিতির সুযোগে খলজী বংশোদ্ভূত জালালউদ্দিন ফিরুজ কায়কোবাদকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন (১২৯০)। এইভাবে কায়কোবাদের স্বল্পস্থায়ী তিনবছরের শাসনকালের অবসান ঘটে।



কার্জন

[শাসনকাল ১৮৯৯-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ]

ব্রিটিশ ভারতের একজন ভাইসরয় ছিলেন। লর্ড জন ন্যাথানিয়েল কার্জন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভাইসরয় পদে

বহাল থাকেন। বড়লাট নিযুক্ত হবার আগে তিনি চার বার ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং দশ বছর এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ভারতবর্ষ ও এশিয়া সম্পর্কে আর কোনো ব্রিটিশ শাসক তাঁর মত এতখানি ওয়াকিবহাল ছিলেন কিনা সন্দেহ। কার্জন একজন সুলেখক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং এশিয়ার সমস্যাবলীর উপর কয়েকটি রাজনৈতিক পুস্তক রচনা করেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা ছিল ব্রিটিশ শাসকদের এক অন্যতম সমস্যা। লর্ড কার্জন যখন শাসনভার গ্রহণ করেন তখন প্রায় পঞ্চাশ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় শান্তি রক্ষার জন্য মোতায়েন ছিল। সীমান্তের দুর্ধর্ষ উপজাতিগুলো প্রায়শই নানা সমস্যার সৃষ্টি করত। কার্জন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা থেকে ইংরেজ সৈন্য অপসারণ করে উপজাতি রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করেন। এছাড়া তিনি পেশোয়ারে এক দরবারী অনুষ্ঠানে উপজাতি নেতাদের নানাবিধ আশ্বাস দেন এবং সেইসঙ্গে সীমান্তে শান্তি বিঘ্নিত করলে কি পরিণতি হতে পারে তাও জানিয়ে দেন। কার্জন একটি নতুন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন করেন। তাঁর এই নীতির সাফল্য দাবি করলেও সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধানে তিনি সম্পূর্ণ সফল হননি।

আফগানিস্থানে রুশ প্রভাব বৃদ্ধি ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের পক্ষে বরাবরই ত্রাসের কারণ ছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আফগান আমীর আবদুর রহমানের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র হাবিবুল্লা নেতা হন। নতুন আমীর যাতে রাশিয়ার দিকে না ঝুঁকতে পারেন সেজন্য কার্জন হাবিবুল্লাকে এক চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দেন। হাবিবুল্লা নতুন সন্ধির প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করেন। তিনি ইংরাজদের কোনরকম মুখাপেক্ষী হয়ে চলতে নারাজ হন এবং তাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বেপরোয়া আচরণে কার্জন স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ হন। ফলে ইঙ্গ-আফগান সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় ইংরেজ আধিপত্য বজায় রাখার ব্যাপারে কার্জন অত্যন্ত হুঁশিয়ার ছিলেন। ঐ এলাকায় ইউরোপীয় জাতিগুলো নিজ নিজ কর্তৃত্ব বিস্তারে সচেষ্ট হওয়ায় তিনি চিন্তিত হন। কার্জন স্বয়ং ব্রিটিশ নৌবহরে চড়ে পারস্য উপসাগরীয় এলাকা পরিভ্রমণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলো ঐ এলাকায় আধিপত্য স্থাপনে বিশেষ সফল হতে পারেনি।

লর্ড কার্জনের তিব্বত নীতির পশ্চাতে ইংলণ্ডের ব্যবসায়িক স্বার্থ ও রুশভীতি কাজ করেছিল। এই সময় তিব্বতের উপর রুশ প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে মনে করে তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কর্নেল ইয়ংহাজব্যাণ্ডের অধীনে তিব্বতে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। ইয়ংহাজব্যাণ্ড তিব্বতের রাজধানী লাসা অধিকার করে নেন। শেষ পর্যন্ত তিব্বতের সাথে ইংরেজদের এক সন্ধি স্থাপিত হয়।

লর্ড কার্জন তাঁর ছয় বছর স্থায়ী শাসনকালের মধ্যে বহু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি ভারতীয় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন এবং তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল ছিল ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বনিয়াদ যতদূর সম্ভব দৃঢ় করা। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পুলিশ, শিক্ষা, অর্থ, বিচার, সৈন্য প্রভৃতি বিভাগের তিনি উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেন। কার্জন প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন এবং দেশের প্রধান ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণের জন্য ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন প্রণয়ন করেন। এছাড়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কর্পোরেশন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কার্জন লর্ড রিপনের স্বায়ত্তশাসনের মহৎ প্রয়াসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলেন। এই আইনের দ্বারা নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস করা হয়। ভারতীয় সদস্যারা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেও কার্জন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর সরকারী প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে এক নতুন আইন প্রণয়ন করেন।

তবে কার্জনের সবচেয়ে কুখ্যাত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন হল বঙ্গভঙ্গ। তিনি সুশাসনের অজুহাতে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করেন। আসাম ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নামে দুটি প্রদেশে বাংলাদেশকে বিভক্ত করা হলে সারা দেশে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায়। বাঙালী জাতি কোনো মতেই এই দ্বিখণ্ডীকরণ মেনে নিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সারা দেশব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার বয়ে যায়। বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বঙ্গবিভাগের ফলে কার্জন ভারতবাসীর কাছে খুবই অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ঐ বছরই সামরিক বিভাগের প্রধান লর্ড কিচেনারের সাথে কার্জনের সামরিক শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ ঘটে। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা প্রধান সেনাপতিকে সমর্থন করায় লর্ড কার্জন পদত্যাগ করেন (১৯০৫)।

কার্টিয়ার

[শাসনকাল ১৭৬৯-১৭৭২ খ্রীঃ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্বে বাংলায় ইংরাজ কোম্পানীর গভর্ণর হয়েছিলেন। পূর্ববর্তী গভর্ণর ভেরেলেস্ট স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কার্টিয়ার কোম্পানীর শাসন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। শাসক হিসাবে কার্টিয়ার আদৌ যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। কোম্পানীর কর্মচারীদের অসংযত দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ সংযত করার ক্ষমতা দুর্বলচেতা কার্টিয়ারের ছিল না। এই সময়ে হায়দর আলীর

নেতৃত্বে মহীশূর রাজ্যটি ইংরেজ কোম্পানীর এক প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখা দেয়। মহীশূরের সাথে যুদ্ধ শুরু হলে কোম্পানী পরাজিত হয় এবং প্রচুর অর্থক্ষতি স্বীকার করে। কার্টিয়ার বাধ্য হয়ে সন্ধি করেন। কার্টিয়ারের আমলেই ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে (বাংলা ১১৭৬ সাল) সোনার বাংলা এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে এবং দেশের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারায়। এই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছে। উইলিয়াম হাণ্টারের 'অ্যানাল্স্ অব্ রুরাল বেঙ্গল' গ্রন্থে এই মন্বন্তরের বিবরণ পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে এই ভয়াবহ মন্বন্তরের ছবি এঁকেছেন। কোম্পানীর শাসন বলতে বাস্তবিকই তখন দেশে কিছু ছিল না। এই পরিস্থিতির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বিলাতের কর্তৃপক্ষ কার্টিয়ারের পরিবর্তে ওয়ারেন হেস্টিংসকে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করে (১৭৭২)।

কার্লোমান

[শাসনকাল ৭৪১-৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ]

ফ্রাঙ্কিস বংশের প্রসিদ্ধ রাজা চার্লস মার্টেলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কার্লোমান উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন। চার্লস মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। কার্লোমান অস্ট্রেসিয়া, সোয়াবিয়া, থুরিঙ্গিয়া প্রভৃতি প্রদেশ লাভ করেন। সত্যি বলতে, শাসক হিসাবে তিনি কোনো কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি। স্বীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর ভ্রাতা পিপিনের সাথে যুগ্মভাবে সোয়াবিয়া, ব্যাভারিয়া, অ্যাকুইটেইনের ডিউকদ্বয় এবং স্যাক্সন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কার্লোমান সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে যান এবং তাঁর রাজ্যাংশ ভ্রাতা পিপিনকে দান করেন।

কাং সি

[শাসনকাল ১৬৬১-১৭২২ খ্রীষ্টাব্দ]

চীনের মাঞ্চু বংশের একজন বিখ্যাত সম্রাট। কাং সি মাত্র সাত বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৩ বছর বয়সে স্বহস্তে শাসনভার নেন। প্রথমেই তিনি মাঞ্চু শাসনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কাং সু'র আমলে চীনের দক্ষিণাংশে এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ দেখা দিলে তিনি তা কঠোর হস্তে দমন করেন। এই সময়েই তাইওয়ান সর্বপ্রথম চীন সাম্রাজ্যের অধীনে আসে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি তিব্বতের উপর নিজ প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে প্রেরণ করেছিলেন। কাং সি শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুদীর্ঘ ষাট বছরেরও অধিককাল রাজকার্য পরিচালনা করার পর কাং সি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কিওপ্‌স্‌ বা খুফু

[শাসনকাল ২৬০০-২৫৭৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ]

প্রাচীন মিশরের একজন ফারাও বা সম্রাট ছিলেন। কিওপ্‌স্‌ খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০০ সাল নাগাদ মিশরের শাসক হন এবং মোট ২৩ বছর রাজত্ব করেন। মিশরের ফারাওরা পিরামিড নির্মাণে অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। আকারে সবচেয়ে বড় ও সর্বোচ্চ পিরামিডটি কায়রোর নিকটে গিজা নামক স্থানে খুফুর দ্বারাই নির্মিত হয়েছিল। এঁর উচ্চতা হ'ল পাঁচশো ফুটের কাছাকাছি। সত্তর-আশি হাজার মানুষ প্রায় কুড়ি বছর ধরে এটি নির্মাণ করেছিল। কিওপ্‌স্‌ বা খুফুর রাজত্বকাল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

কীর্তিবর্মন প্রথম

[শাসনকাল ৫৬৬-৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন চালুক্যবংশের একজন রাজা। তিনি প্রথম পুলকেশীর মৃত্যুর পর ৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ত্রিশ বছরের অধিককাল রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। চালুক্যবংশের চতুর্থ শাসক প্রথম কীর্তিবর্মন ছিলেন শক্তিশালী ও দৃঢ় মানসিকতাসম্পন্ন। তিনি সামরিক অভিযান পরিচালনা করে চালুক্য সাম্রাজ্যের সীমা যথেষ্ট প্রসারিত করেন। আইহোল শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তিনি বেলারি জেলার নল, উত্তর কোঙ্কনের মৌর্য, বারাণসীর কদম্বদের পরাজিত করেন। তিনি বাতাপী দুর্গের নির্মাণ শেষ করে পিতার অসমাপ্ত কার্য সম্পূর্ণ করেন। কীর্তিবর্মন উত্তরদিকে মগধ ও বঙ্গ পর্যন্ত এবং দক্ষিণে চোল ও পাণ্ডরাজ্যের সীমানা পর্যন্ত তাঁর সফল সমরাভিযান পরিচালনা করেছিলেন। ৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কীর্তিবর্মন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কীর্তিবর্মন দ্বিতীয়

[শাসনকাল ৭৪৪-৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ]

পশ্চিমী চালুক্য বংশের শেষ রাজা। তিনি ৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কীর্তিবর্মন সিংহাসনে বসার অনেক আগে থেকেই সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। তাঁর পূর্ব-

পূর্বসূরিরা পল্লবদের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় নানা দিক দিয়ে চালুক্য-বংশের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে আসছিল। এদিকে তাঁর পূর্ববর্তী রাজাদের আমলে দাক্ষিণাত্যে চালুক্যশক্তি বিস্তার লাভ করায় সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। চালুক্য রাজাদের দক্ষিণে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকার সুযোগ নিয়ে উত্তরের অধীনস্থ এলাকাগুলো একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অবশেষে রাষ্ট্রকূট বংশীয় একজন সামন্তপ্রভু অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্যবংশের শাসনের অবসান ঘটায়। দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন ৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

কুইসলিং

[শাসনকাল ১৯৪২-১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ]

নরওয়ের একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নরওয়ের সামরিক বাহিনী পরিত্যাগ ক'রে হিটলারের নাৎসী বাহিনীতে যোগদান করেন। এবং অল্পকালের মধ্যেই হিটলারের একজন বংশবদ অনুচরে পরিণত হন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন হিটলার তাঁকে নরওয়ের প্রিমিয়ার নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি জনগণের চোখে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। বাংলার ইতিহাসে যেমন 'মীরজাফর' তেমনি আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে 'কুইসলিং' নামটি বিশ্বাসঘাতকের প্রতিশব্দ হিসাবে 'কুখ্যাত' হয়ে রয়েছে।

কুতুবউদ্দিন আইবক

[শাসনকাল ১২০৬-১২১০ খ্রীষ্টাব্দ]

ভারতবর্ষে দাসবংশের তথা মুসলিম শাসনের সূচনা হয় কুতুবউদ্দিন আইবকের সময় থেকে। মহম্মদ ঘোরীর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় ভারতবর্ষে তাঁর বিজিত সাম্রাজ্য তাঁর প্রিয় গোলাম ও একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দিনের হস্তগত হয়। তিনি ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজে দাস হিসাবে জীবন শুরু করেন বলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশকে 'গোলাম'বা 'দাস' বংশ বলে অভিহিত করা হয়। মাত্র চার বছর রাজত্ব করার পর চৌগান খেলার সময় ঘোড়া থেকে প'ড়ে আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বল্পকাল রাজত্বের মধ্যে কুতুব দেশে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। তিনি কোনো শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন নি। কুতুবউদ্দিন সম্পর্কে ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ উচ্চ প্রশংসা করে বলেছেন যে, তিনি ছিলেন একজন সাহসী, শক্তিশালী ও প্রজাদরদী শাসক। তিনি সামরিক অভিযান পরিচালনা করে তাঁর

সাম্রাজ্য-সীমা বেশ কিছু বিস্তৃত করেছিলেন। কুতুবের দানশীলতা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল এবং তিনি 'লাখবক্স' বা লক্ষদাতা খেতাব লাভ করেন। তাজ-উল-মসির গ্রন্থের লেখক হাসান নিজামী লিখেছেন যে কুতুব ছিলেন একজন ন্যায়বিচারক এবং তাঁর সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট প্রয়াস চালিয়েছিলেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, যার প্রমাণ মেলে দিল্লী ও আজমীরে দুটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার মধ্যে।



কুবলাই খান

[শাসনকাল ১২৫৯-১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দ]

১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা মোঙ্গুখানের মৃত্যু হলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কুবলাই খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সম্পর্কে কুবলাই ছিলেন চেঙ্গিস খানের নাতি। তিনিই সর্বপ্রথম চীনের উত্তর ও দক্ষিণ অংশকে একই শাসনাধীনে আনেন। মোঙ্গলদের ইতিহাসে কুবলাই খানের ক্ষমতালাভ নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কুবলাইয়ের সাম্রাজ্য চীন, কোরিয়া এবং ইরান থেকে শুরু করে সুদূর দক্ষিণ রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি একাধিকবার জাপান জয়ের জন্যও প্রয়াস চালিয়েছিলেন কিন্তু উপযুক্ত নৌবাহিনীর অভাবে শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেননি। কুবলাই হলেন প্রথম মোঙ্গল নেতা যিনি নিজেকে একজন চৈনিক সম্রাট হিসাবে ভাবতে শুরু করেন এবং খোদ মঙ্গোলিয়া থেকে পিকিং-এ তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন (১২৬০)। কয়েক বছর পর ১২৬৭ সাল নাগাদ তিনি এর পুনর্গঠনের কাজও শুরু করেন। এরপর থেকে স্বভাবতঃই মঙ্গোলিয়ার গুরুত্ব কমে যেতে থাকে আর মোঙ্গলরাও ক্রমশঃ চীনা জনগণের সঙ্গে মিশে যায়। কুবলাই খান মোট ৩৫ বছর রাজত্ব করেন। বিখ্যাত ভেনেসীয় পর্যটক মার্কোপোলোর কুবলাই খানের রাজসভায় গমন তাঁর রাজত্বকালের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী থেকে কুবলাই খান ও মোঙ্গলদের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেছে।

কুমার গুপ্ত প্রথম

[শাসনকাল ৪১৫-৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ]

গুপ্তবংশের একজন রাজা এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র। তিনি পিতার মৃত্যুর পর ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠান করেন এবং সুদীর্ঘ ৪০ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালের যে সব শিলালেখ পাওয়া গেছে তার থেকে জানা যায় কুমারগুপ্ত অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক ছিলেন এবং তাঁর আমলে সুবিশাল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ভালভাবেই বজায় ছিল। কিন্তু এই সব শিলালেখ তাঁর রাজনৈতিক বা সামাজিক কৃতিত্ব সম্পর্কে নীরব। এর থেকে মনে হয় তিনি বিশাল সাম্রাজ্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় তাঁর রাজত্বকালের সম্পূর্ণ সময় ব্যায়িত করেন। তাঁর আমলের শিলালেখগুলো থেকে গুপ্তদের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কেও অনেক কথা জানা গেছে। কুমার গুপ্তের কৃতিত্ব হল পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজের অখণ্ডতা তিনি তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকাল জুড়ে বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

কুম্ভ

[শাসনকাল পঞ্চদশ শতাব্দী]

রাণা মুকুলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুম্ভ মেবারের রাজা হন। তিনি শিশোদিয় বংশোদ্ভূত ছিলেন। কুম্ভ ছিলেন রাজপুতানার ইতিহাসের একজন খ্যাতনামা রাজা। তিনি বহু গুণসমন্বিত পুরুষ ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মালব ও গুজরাটের রাজাদ্বয় সম্মিলিতভাবে মেবার রাজ্য আক্রমণ করলে কুম্ভ অসাধারণ বীরত্ব ও সামরিক দক্ষতা প্রদর্শন করে শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হন। এই বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তিনি চিতোরে একটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। রাণা কুম্ভ সুদীর্ঘ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন প্রজাদরদী দক্ষ প্রশাসক। এই সময়ের মধ্যে তিনি মেবারের শত্রুদের পরাজিত করেন এবং নানা সংস্কার, দুর্গস্থাপন ও জনকল্যাণমূলক কাজের দ্বারা স্বীয় রাজ্যটিকে সুদৃঢ় করে তোলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজ্যলোভী পুত্র 'উদা'র হস্তে বৃদ্ধবয়সে তাঁকে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

কুলোতুঙ্গ প্রথম

[শাসনকাল ১০৭০-১১২০ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন ভারতের চোল বংশের একজন রাজা। তিনি ১০৭০ থেকে ১১২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন বলে জানা যায়। কুলোতুঙ্গ প্রথমে ভেঙ্গীর পূর্ব-

চালুক্য রাজ্যের শাসক ছিলেন। চালুক্য সিংহাসনে বসে তিনি দুই রাজ্যকে যুক্ত করেন।

কুলোতুঙ্গ একজন সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয় রাজা ছিলেন এবং পাণ্ড্য ও কেরলের রাজাদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তিনি কলিঙ্গ আক্রমণ করে সেখানকার রাজা অনন্ত বর্মণ চোড়গঙ্গকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। পশ্চিম চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য বেশ কয়েকবার চোল রাজ্য আক্রমণ করলে তিনি সফলভাবে সেগুলো প্রতিহত করেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালের শেষের দিকে তাঁর দুর্বলতার সুযোগে বিক্রমাদিত্য তাঁকে পরাজিত করে ভেঙ্গী ছিনিয়ে নেন। সিংহল তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং হোয়সলরাও তার কাছ থেকে অঙ্গ রাজ্য এবং কাবেরী উপত্যকা কেড়ে নেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তাঁর রাজত্বকালের শেষ দিকে সাম্রাজ্যে দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথম কুলোত্তুঙ্গ শিবের উপাসক ছিলেন এবং বৌদ্ধদের প্রতিও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতেন। সম্ভবতঃ বৈষ্ণবদের প্রতি তিনি খুব একটা প্রসন্ন ছিলেন না।

কৃষ্ণ প্রথম

[শাসনকাল ৭৫৮–৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশের একজন বিশিষ্ট রাজা। তিনি ৭৫৮ খ্রীঃ সিংহাসনে বসেন এবং সর্বসমেত পনের বছর রাজত্ব করেন। তিনি যে একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনকে পরাজিত করে চালুক্য শক্তির মূলে চরম আঘাত হানেন। এর পর তিনি মহীশূরের গঙ্গ ও ভেঙ্গীর পূর্বদিকের চালুক্যদের পরাজিত করে দাক্ষিণাত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা হয়ে ওঠেন। তিনি দক্ষিণ কোঙ্কন পর্যন্ত তাঁর রাজ্য সীমা বিস্তৃত করেন। কৃষ্ণ ছিলেন একজন বিখ্যাত নির্মাতা। তিনি ইলোরার বিখ্যাত শৈব মন্দির নির্মাণ করেন।

কৃষ্ণদেব রায়

[শাসনকাল ১৫০৯-১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ]

কৃষ্ণদেব রায়কে নিঃসন্দেহে দক্ষিণভারতের বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলা যায়। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে বহু অভিযান পরিচালনা করে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় সামরিক কৃতিত্ব হল বিজাপুরের সুলতানের হাত থেকে রায়চুর দোয়াব পুনরুদ্ধার করা। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরে রায়চুর দোয়াব, ভিজাগাপত্তনম থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারত মহাসাগরের কিছু কিছু দ্বীপের ওপরও

তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তিনি যে শুধু একজন বীর যোদ্ধা ও সফল সেনানায়ক ছিলেন তাই নয়, সুদক্ষ প্রশাসক হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব কোন অংশে কম নয়। তিনি বহু জনকল্যাণমূলক শাসন সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন বড় পণ্ডিত ও কবি এবং শিল্প-সাহিত্যের বড় পৃষ্ঠপোষক। তিনি একজন নির্মাতাও ছিলেন। এক কথায় বলা চলে, তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর রাজধানী সুন্দর করার উদ্দেশ্যে তিনি বহু দেবালয়, অট্টালিকা নির্মাণ ও উদ্যান রচনা করেন। পর্তুগীজদের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি পশ্চিমী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ও উৎকলে তিনি পর্তুগীজদের একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন। নিজে বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী হলেও সর্বধর্মের প্রতি তিনি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতেন। কৃষ্ণদেবের আমলে বিজয়নগর সাম্রাজ্য সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির দিক দিয়ে উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। পর্তুগীজ পর্যটক ডোমিঙ্গো পাএস তাঁর রাজত্বকালে বিজয়নগর পরিদর্শন করেন। পাএস-এর বর্ণনা থেকে বিজয়নগরের প্রাচুর্য, শ্রী ও সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। কৃষ্ণদেব রায়ের চরিত্র ও নানাপ্রকার গুণাবলীর তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায় পরলোকগমন করেন।

কেশব সেন

[শাসনকাল ১২২০-১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ]

বাংলার সেন বংশের রাজা ছিলেন। ভ্রাতা বিশ্বরূপ সেনের পরবর্তী শাসক হিসাবে তিনি বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (সম্ভবতঃ ১২২০ খ্রীষ্টাব্দ)। কেশব সেন সূর্যের উপাসক ছিলেন। মালিক সইফুদ্দিন এর আক্রমণ প্রতিহত করে বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষা করা ছিল তাঁর রাজত্বকালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেশব সেন প্রায় পঁচিশ বছর বঙ্গে রাজত্ব করেন। তিনি হচ্ছেন সেন বংশের পরিচিত শেষ শাসক।

১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। এর পর বাংলার ইতিহাস বেশ অস্পষ্ট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ক্যাথারিণ দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৭৬২-১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ছিলেন। তিনি ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ক্যাথারিণ ছিলেন সমসাময়িক ইউরোপের একজন

অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, উচ্চশিক্ষিতা, দৃঢ়চেতা ও ন্যায়নীতি-বর্জিত। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হ'ল কঠোর হস্তে শাসনকার্য পরিচালনা ক'রে রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা। প্রকৃতপক্ষে মহান পিটার রাশিয়ার জাগরণের যে কাজটি শুরু করে গিয়েছিলেন ক্যাথারিণ তাকে সম্পূর্ণতা দান করেন। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় দিক দিয়েই ক্যাথারিণ তাঁর পূর্বসূরী পিটারের পদাঙ্কই মোটামুটিভাবে অনুসরণ করে চলেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে কোনো উপায়ে রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি করা। তিনি ফরাসী দার্শনিকদের রচনার সাথে বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং নিজেকে একজন প্রজাহিতৈষী শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি স্বৈরাচারী শাসক হলেও প্রজাকল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে দেশে বহু শাসন সংস্কার প্রবর্তন করেন। দেশে শক্তিশালী স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি এক কেন্দ্রীভূত শাসন চালু করেন এবং সরকারী বিভাগগুলোকে ঢেলে সাজান। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের তিনি নিজেই নিয়োগ করতেন। তিনি প্রচলিত আইনের সংস্কার করেন এবং দেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার স্থাপন করেন। ক্যাথারিণের পৃষ্ঠপোষকতায় রাশিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং সেন্ট পিটার্সবার্গ সমসাময়িক ইউরোপের সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি কৃষিকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটান। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ক্যাথারিণ সহিষ্ণুতার মনোভাব প্রদর্শন করতেন। তিনি রাষ্ট্রস্বার্থে চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। তবে ক্যাথারিণের প্রজাহিতৈষণার পশ্চাতে যে কূটনৈতিক অভিসন্ধি ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাস্তবিকই তাঁর সকল কাজের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি। তিনি সার্ফ বা ভূমিদাসদের অবস্থার উন্নতির জন্য কোনো প্রয়াস চালান নি। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব শুরু হ'লে ক্যাথারিণ শঙ্কিত বোধ করেন এবং তাঁর ভিতরের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ক্যাথরিণ তাঁর সমসাময়িক প্রাশিয়ারাজ ফ্রেডারিকের মতই সুবিধাবাদী নীতির চরম পরাকাষ্ঠা দেখান। পিটারের পন্থা অনুসরণ ক'রে তিনি রুশ সীমান্তকে ভুইনা ও কৃষ্ণসাগরীয় এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে আগ্রহী ছিলেন। ফলে তাঁকে তুরস্কের বিরুদ্ধে পরপর কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল। তিনি মোল্ডাভিয়া, ওয়ালাচিয়া প্রভৃতি বেশ কয়েকটি স্থান জয় ক'রে নিয়ে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ান। তিনি পোল্যান্ড ব্যবচ্ছেদে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং পোল্যান্ডের অনেকগুলো স্থান রুশ অধিকারভুক্ত করেন। এ ছাড়া তিনি জর্জিয়া, ক্রিমিয়া, ইউক্রেন প্রভৃতি স্থানের উপরও তাঁর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বাস্তবিকই রাশিয়াকে একটি বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে ক্যাথারিণের অবদান

রাশিয়ার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথারিণ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ক্যানিউট

[শাসনকাল ১০১৭-১০৩৫ খ্রীষ্টাব্দ]

ডেনমার্কের রাজা সুয়েনের পুত্র ছিলেন। ক্যানিউট ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা হন। ইংলণ্ডবাসী একজন বিদেশী বংশোদ্ভূত বলে প্রথমে তাঁর প্রতি বিশেষ আনুগত্য প্রদর্শন করেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় ক্যানিউট শুধু ইংলণ্ড-বাসীরই প্রিয় হননি, সমসাময়িক কালের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে স্বীকৃত হন। তিনি একাধারে ইংলণ্ড ও ডেনমার্ক উভয় দেশই শাসন করতেন। ক্যানিউট ছিলেন অত্যন্ত প্রজাদরদী শাসক। তাঁর সাম্রাজ্যে ইংলণ্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ে নিয়ে গঠিত ছিল। তিনি দৃঢ়হাতে ও দক্ষতার সাথে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। তাঁর সুশাসনে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় ছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। আঠারো বছর রাজত্ব করার পর ১০৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানিউট মৃত্যুবরণ করেন।



ক্যানিং

[শাসনকাল ১৮৫৬-১৮৬২ খ্রীঃ]

লর্ড ভাইকাউণ্ট ক্যানিং ছিলেন ইংলণ্ডের বিশিষ্ট প্রধানমন্ত্রী লর্ড জর্জ ক্যানিং-এর পুত্র। তিনি ছিলেন ভারতে কোম্পানীর শাসনের শেষ গভর্ণর জেনারেল ও মহারানী ভিক্টোরিয়ার শাসনের প্রথম ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি। ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী শাসক লর্ড ডালহৌসীর পরবর্তী শাসক হিসাবে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে তিনি ভারতের রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘের সঞ্চার ও ভবিষ্যৎ দুর্যোগের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তিনি তাঁর এই আশঙ্কার কথা ইংরাজ কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে ব্যক্ত করেন। ভারতবর্ষে শাসক হিসাবে নিযুক্ত হবার

স্বল্পকালের মধ্যেই ক্যানিং-এর আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হল এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক মহাবিদ্রোহ ঘটল। এই বিদ্রোহের ফলস্বরূপ ভারতে কোম্পানীর শাসনের অবসান হয় এবং মহারানী ভিক্টোরিয়া সরাসরি এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট ভারত সুশাসনের আইন ঘোষণার মাধ্যমে স্থির হয় যে একজন ভারত সচিব ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কাউন্সিলের সাহায্যে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন এবং গভর্ণর জেনারেল ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবেন। সিপাই বিদ্রোহ দমনে ক্যানিংকে যথেষ্ট সহিষ্ণুতা, সাহস ও মানসিক স্থৈর্যের পরিচয় দিতে হয়েছিল। তিনি বিদ্রোহীদের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কিছুটা উদার মনোভাব প্রদর্শনের পক্ষপাতী হওয়ার দরুন বিলাতে তাঁর বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা করা হয়। ইংরাজরা তাকে 'ক্লিমেন্সি ক্যানিং' বা 'দয়ার অবতার' বলে উপহাস করতে শুরু করে। সিপাই বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হলে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের বিক্ষোভ দেখা দিতে না পারে সেজন্য সেনা-বিভাগে পরিবর্তন সাধন করা হয়। ক্যানিং সেনাবাহিনীতে ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপনীতির উচ্ছেদ ঘটান। অত্যাচারী জমিদার ও নীলকর সাহেবদের হাত থেকে নিরীহ প্রজাসাধারণের রক্ষাকল্পে ক্যানিং আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হন। সিপাই বিদ্রোহের পর ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট প্রভৃতি প্রণীত হয় এবং একটি হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়। ক্যানিং এর আমলেই ভারতে সর্বপ্রথম কাগজের নোট বা মুদ্রার প্রচলন হয়। ক্যানিং-এর আরও একটি বড় কীর্তি হল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় সিপাই বিদ্রোহের পূর্বেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ক্যানিং-এর আমলেই ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটে এবং বহু মানুষের মৃত্যু হয়। বিদ্রোহ দমন ও বিদ্রোহ পরবর্তী পুনর্গঠনের কাজে তাঁকে যে প্রচণ্ড ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছিল তার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানিং অবসর গ্রহণ করে স্বদেশে ফিরে যান এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ক্যাম্বিসিস্

[শাসনকাল ৫২৯-৫২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ]

প্রাচীন পারস্যের একজন সম্রাট ছিলেন। বিখ্যাত পারসীক সম্রাট সাইরাস দি গ্রেটের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় ক্যাম্বিসিস্ পারস্যের অ্যাকামেনিড বংশের রাজা হন।

পিতার মত যোগ্যতাসম্পন্ন না হলেও তিনি একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন এবং ফিনিশিয়া, সাইপ্রাস প্রভৃতি স্থানে সামরিক অভিযান চালিয়ে সেগুলো তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি মিশরও জয় করেছিলেন। কিন্তু ইথিওপিয়া অভিযানে গিয়ে তাঁকে বিফল হতে হয়েছিল। আট বছর রাজত্ব করার পর ৫২২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ক্যাম্বিসিস মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ক্যালিগুলা

[শাসনকাল ১২-৪১ খ্রীষ্টাব্দ]

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের একজন শাসক ছিলেন ক্যালিগুলা ১২ খ্রীষ্টাব্দে রোমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং প্রায় তিরিশ বছর রাজত্ব করেন। এই সম্রাটের নাম গেয়াস অগাস্টাস জারমানিকাস। ক্যালিগুলা হ'ল ডাকনাম। শৈশবে তাঁর পিতার অধীনস্থ সৈনিকেরা এই নামকরণ করেন এবং পরবর্তীকালে এই নামেই তিনি জনসমক্ষে পরিচিতি লাভ করেন। টিবেরিয়াসের মৃত্যুর পর রোমের সেনেট তাঁকে রোমের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

অল্পবয়সে শাসনভার হাতে পেয়ে ক্যালিগুলা ভালভাবেই রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু ৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ এক গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হবার পর থেকে তাঁর বিশেষ মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। সুস্থ হয়ে উঠে তিনি রাতারাতি একজন স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর শাসকে পরিণত হন। তাঁর স্বৈরাচারী অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। তাঁর বিরুদ্ধে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র শুরু হলে তিনি আরও অধিকমাত্রায় নিষ্ঠুর ও সন্দেহপরায়ণ হয়ে ওঠেন।

ক্যালিগুলা ৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গেটুলিকাসের বিদ্রোহ দমন করার জন্য গল অভিমুখে অভিযান করেন এবং কয়েক মাস ধরে সেখানে নির্বিচারে লুণ্ঠনকার্য চালাবার পর নিজ রাজধানীতে ফিরে আসেন। জার্মানদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং ব্রিটন আক্রমণের পরিকল্পনাও দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির পর তিনি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন

সাম্রাজ্যের পূর্বদিকস্থ প্রদেশগুলোতে ক্যালিগুলা প্রজাসাধারণ কর্তৃক পূজিত হবার দাবি জানালে বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্যালেস্টাইন ও আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদীরা সম্রাটের এই আদেশে অত্যন্ত কুপিত হয়। ক্যালিগুলা অতঃপর সেনেটের উপর সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে এক নিপুণ ষড়যন্ত্র শুরু হয় যার পরিণতিস্বরূপ আততায়ীহস্তে তাঁর জীবনের অবসান ঘটে (৪১ খ্রীষ্টাব্দ)।



ক্রমওয়েল

[শাসনকাল ১৬৫৩-১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ]

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের শাসক ছিলেন ওলিভার ক্রমওয়েল। তিনি ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'প্রোটেক্টর' হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ওলিভার ক্রমওয়েলের শাসনকাল নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদের পর ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের সাময়িক পতন ঘটে এবং ইংলণ্ড 'কমনওয়েলথ' হিসাবে ঘোষিত হয়। এই সময় রাম্প পার্লামেণ্টের একজন বিশেষ প্রভাবশালী সদস্য হিসাবে ক্রমওয়েল ও তাঁর অধীনস্থ 'নিউ মডেল' সেনাবাহিনী কার্যতঃ সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। রাজতন্ত্রের পতন ঘটানোর ক্ষেত্রে ক্রমওয়েল ও নিউ মডেল সেনাবাহিনীই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমওয়েল সেনাবাহিনীর সাহায্যে রাম্পের সদস্যদের পার্লামেণ্ট থেকে বহিষ্কার ক'রে নিজে সকল ক্ষমতা দখল করে বসেন। এরপর থেকে তিনি কিছুকাল অন্তর অন্তর একের পর এক নতুন পার্লামেণ্ট গঠন করেন ও মনঃপূত না হওয়ায় পুরোনো পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেন। প্রথমে তিনি 'বেয়ারবোন' পার্লামেণ্ট গঠন করেন। কিন্তু এই পার্লামেণ্ট খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। অতঃপর ইনস্ট্রুমেণ্ট অব্ গবর্ণমেণ্ট নামে এক নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'লে ক্রমওয়েল সকল রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী হন। কিন্তু তিনি 'রাজা' উপাধি গ্রহণ না ক'রে 'প্রোটেক্টর' হিসাবে রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা করতে থাকেন। ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমওয়েল এই পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিয়ে মেজর-জেনারেলদের উপর শাসনভার অর্পণ করেন। ইংলণ্ডকে বারোটি জেলায় বিভক্ত ক'রে প্রত্যেকটি জেলা শাসনের ভার এক-একজন মেজর জেনারেলের উপর অর্পণ করা হয়। মেজর-জেনারেলদের কঠোর সামরিক শাসনে দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে ক্রমওয়েল এই ব্যবস্থাও প্রত্যাহার করে নেন। পরের বছর ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমওয়েল এক নতুন পার্লামেণ্ট আহবান

করেন। এই পার্লামেণ্ট 'হাম্বল পিটিশন এ্যাণ্ড অ্যাডভাইস' নামে এক নতুন শাসনব্যবস্থার খসড়া প্রস্তুত ক'রে ক্রমওয়েলকে 'রাজা' উপাধি গ্রহণের আহবান জানালে ক্রমওয়েল তা গ্রহণে অস্বীকৃত হন। রাজা উপাধি গ্রহণ না করলেও এটা ছিল, মরিস এ্যাশলে যেমন বলেছেন, 'রাজাবিহীন রাজতন্ত্র'। দুবছর পর এই পার্লামেণ্ট ক্রমওয়েল ভেঙ্গে দিলেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে ক্রমওয়েলের আভ্যন্তরীণ সংস্কারগুলো ছিল চূড়ান্তভাবে স্বৈরাচারী। পার্লামেণ্টের সাহায্যে শাসনকার্য চালাতে ব্যর্থ হয়ে তিনি সামরিক শাসন প্রবর্তন করেন এবং তা ব্যর্থ হলে ফের পার্লামেণ্টের সাহায্য নেন। ক্রমওয়েলের পার্লামেণ্টের মাধ্যমে দেশ শাসনের ব্যর্থতা পুনরায় ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পথ প্রস্তুত করে। ট্রেভর রোপারের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ "তাঁর পূর্বসূরী আর্চবিশপ ল্যডের মত ক্রমওয়েলও শীঘ্র উপলব্ধি করেন যে রাজনীতিতে শুভ ইচ্ছাই পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু তিনি বাস্তব ঘটনাবলী পর্যালোচনা ক'রে সেগুলো থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেননি। তাই ক্রমাগত একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে গিয়েছেন।" পার্লামেণ্টকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অভাবই এই ব্যর্থতা ডেকে এনেছিল। তাঁর মানসিকতা ও চরিত্রের মধ্যেই এই ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। ট্রেভর রোপারের ভাষায় বলা চলে, তাঁর অনুচরদের মতই ক্রমওয়েল নিজেও ছিলেন পার্লামেণ্টের একজন পিছন সারির লোক। তিনি কখনও রাজনীতির সূক্ষ্মতা বুঝতে পারেননি।

ক্রমওয়েলের ব্যর্থতা সত্ত্বেও বলা যায় তিনি একজন বড় সংস্কারক ছিলেন এবং তাঁর স্বল্পমেয়াদী শাসনকালের মধ্যে বহু শাসন সংস্কার প্রবর্তন করেন। তাঁর আমলেই ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড সর্বপ্রথম একই পার্লামেণ্টের ছত্রছায়ায় ঐক্যবদ্ধ হয়। তবে আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ অপেক্ষা পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই ক্রমওয়েলের কৃতিত্ব ছিল বেশি। প্রথম দুই স্টুয়ার্ট রাজার আমলে ইংলণ্ডের মর্যাদা ইউরোপে বিশেষ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ক্রমওয়েলের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হ'ল বহির্বিশ্বে ইংলণ্ডের সম্মান ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর বলিষ্ঠ ও সফল বৈদেশিক নীতির দ্বারাই যে এটা সম্ভব হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। বাস্তবিকই, ক্রমওয়েলের পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য ইংরাজ জাতির প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন ক'রে। প্রোটেক্টর ক্রমওয়েল ছিলেন মনে-প্রাণে একজন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। তাঁর সময়ে ইংল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যও যথেষ্ট প্রসারলাভ ক'রে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে একজন গোঁড়া প্রোটেস্টাণ্ট হিসাবে ক্রমওয়েলের লক্ষ্য ছিল সমগ্র ইউরোপে এই মতবাদের প্রসার ঘটানো যদিও সে লক্ষ্য অর্জনে তিনি সফল হননি। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর ক্রমওয়েল মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ক্রিস্টিনা

[শাসনকাল ১৬৩২-১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ]

গুসতাভাস এ্যাডলফাসের মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা ক্রিস্টিনা ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের সিংহাসনে বসেন। এই সময় তিনি নাবালিকা থাকায় তাঁর পিতার চ্যান্সেলর রাজকার্য দেখাশুনা করতেন। ১৬৪৪ খ্রীঃ থেকে ক্রিস্টিনা শাসনকার্য স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সেই যুগের এক আকর্ষণীয় মহিলা। বহুগুণসমন্বিতা এই রমণীর বিদ্যানুরাগ ছিল যথেষ্ট এবং পণ্ডিত ও সাহিত্যরসপিপাসু ব্যক্তিদের সান্নিধ্য তিনি খুব পছন্দ করতেন। তাঁর রাজত্বকালে স্টকহোম সমগ্র ইউরোপের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে ওঠে। কিন্তু সাম্রাজ্য পরিচালনায় তিনি আদৌ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি এবং শাসনকার্য পরিচালনায় বিশেষ উৎসাহও তাঁর ছিলনা। ফলে তাঁর ঔদাসীন্যের সুযোগে বিরোধী গোষ্ঠী তাঁকে পদচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তিনি কঠোর হস্তে এই চক্রান্ত দমন করেন। ক্রিস্টিনা ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু সেই সময় সুইডেনে প্রোটেস্টাণ্ট মতবাদের প্রাবল্য থাকায় তিনি তাঁর ভ্রাতা চার্লসের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ক্রিস্টিনা আজীবন অবিবাহিত ছিলেন।

ক্রুগার

[শাসনকাল ১৮৮১-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক ধরে ট্রান্সভাল প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। স্টিফেনাস জোহানেস ক্রুগার ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৬ বছর বয়সে ট্রান্সভালের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান লাভের অধিকারী। ইংলণ্ডের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর মতবিরোধ ঘটেছিল। তিনি প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেন। তবে তিনি ইংরেজ জাতির সামরিক শক্তির পরিমাপ করতে গিয়ে অদূরদর্শিতার কাজ করেন। ইংলণ্ডের সাথে বিরোধ তীব্র হয়ে উঠলে তিনি সামরিক বলের সাহায্যে ইংলণ্ডকে পরাজিত করার অবাস্তব আশা পোষণ করতে থাকেন। এই ভুলের মাশুল তাঁকে শীঘ্রই দিতে হয়। ইংরাজ সামরিক বাহিনী ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে সহজেই ট্রান্সভাল দখল করে নেয় এবং অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের সাথে স্থানটি ব্রিটেনের উপনিবেশে পরিণত হয়। ক্রুগার বাধ্য হয়ে স্বদেশ ছেড়ে বাকী জীবন হল্যাণ্ডে অতিবাহিত করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুগারের জীবনাবসান ঘটলে তাঁকে প্রিটোরিয়ায় সমাধিস্থ করা হয়।

ক্রোসাস

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী]

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাচীন লিডিয়ার রাজা ছিলেন। ক্রোসাস খ্যাতনামা পারসীক সম্রাট সাইরাসের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সম্পদশালী রাজা ছিলেন এবং তাঁর ধন-সম্পদের কথা দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি তাঁর রাজধানী-শহর সার্ডিসকে অত্যন্ত মনোরমভাবে সজ্জিত করেন। ক্রোসাস লিডিয়ার রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন। তিনি এশিয়া মাইনরের অনেকগুলি গ্রীক রাজ্য জয় করে তাঁর সাম্রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। কিন্তু অধিকৃত গ্রীক শহরগুলোর উপর তিনি সদয় ব্যবহারই প্রদর্শন করতেন। তিনি গ্রীক সভ্যতার খুব অনুরাগী ছিলেন এবং গ্রীক দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন। পারস্য সম্রাট সাইরাস এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এশিয়া মাইনর অভিযান করলে ক্রোসাসের সাথে পারসীকদের এক তীব্র যুদ্ধ হয়। ক্রোসাস শেষপর্যন্ত পরাজয় বরণ করেন এবং সেইসঙ্গে লিডিয়ার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়।

ক্লডিয়াস

[শাসনকাল ৪১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন রোমান সম্রাট ড্রুসাসের পুত্র ক্লডিয়াস ১০ খৃষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মোট ৬৪ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী রাজা ও লেখক ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল। ক্লডিয়াস ইতিহাস, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর বেশ কিছু লেখালেখি করেছিলেন এবং একটি আত্মজীবনীও রচনা করেন। দুঃখের বিষয় তাঁর কোন রচনাই আজ আর পাওয়া যায় না। ৪১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ক্যালিগুলা আততায়ী হস্তে নিহত হলে ক্লডিয়াস সম্রাট পদ লাভ করেন। তিনি ৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেন অভিযান করে সফল হন। তিনি বহুবিধ শাসন সংস্কার প্রবর্তনে প্রয়াসী হন এবং খুঁটিনাটি যাবতীয় বিষয়ে অতিরিক্ত মনোনিবেশ করেন। ফলে তাঁর আমলে শাসন পদ্ধতি অত্যন্তরকম কেন্দ্রমুখী হয়ে পড়ে। তিনি রোমান সেনেটের কাজ কর্মেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন। এইসব সত্ত্বেও বলা যায় ক্লডিয়াস একজন উদার মনোভাবাপন্ন শাসক ছিলেন এবং রোমের জনগণের উন্নতিকল্পে অনেক হিতকর কাজকর্ম করেন। তাঁর তৃতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর ক্লডিয়াস অাগ্রিপ্পিনাকে বিবাহ করেন। এই অাগ্রিপ্পিনা হলেন কুখ্যাত রোমান সম্রাট নীরোর জননী। তিনি অত্যন্ত কুচক্রী মহিলা ছিলেন এবং পুত্রকে সিংহাসনে বসাবার জন্য ক্লডিয়াসকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন বলে জানা যায়।

ক্লাইভ

[শাসনকাল ১৭৫৭-৬০ ও ১৭৬৫-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ]

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন রবার্ট ক্লাইভ। তিনি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর ঐতিহাসিক যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে এদেশে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হয়। সুতরাং ভারতে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব যে লর্ড ক্লাইভের প্রাপ্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। লর্ড ক্লাইভ মাত্র সতেরো বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আসেন এবং মাদ্রাজে একজন সামান্য কেরানী হিসাবে কোম্পানীর চাকরীতে যোগদান করেন। এইভাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। কর্ণাটকের যুদ্ধের সময় ক্লাইভ যোদ্ধা হিসাবে সর্বপ্রথম তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিদের নজরে আসেন। সিরাজউদ্দৌলার হাতে কলকাতায় ইংরাজ কোম্পানীর পরাজয় ঘটলে ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে এ্যাডমিরাল ওয়াটসনকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং রাতারাতি কলকাতা পুনর্দখল করতে সমর্থ হন। এরপর ক্লাইভ সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের পরাজয় ঘটলে ক্লাইভ প্রকৃতপক্ষে 'কিংমেকার' বা 'রাজা সৃষ্টিকারী'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন ইংরাজ কোম্পানী বাংলার সর্বময় প্রভু হয়ে বসে। ক্লাইভ ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদেরার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজিত করে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ নিরাপদ করেন এবং মীরজাফর ওলন্দাজদের সাথে হাত মিলানোয় তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে বসান (১৭৬০)। ক্লাইভ এক নতুন শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন যা ইতিহাসে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা নামে কুখ্যাত হয়ে আছে। দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বাস্তবিকপক্ষে বাংলার জীবনে অভিশাপরূপে দেখা দেয় এবং নিরীহ জনসাধারণের দুর্দশা চরমে ওঠে। স্বয়ং গভর্ণর ক্লাইভ থেকে শুরু করে কোম্পানীর নিম্নতম বেতনের কর্মচারী পর্যন্ত অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জনে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে যা ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের মন্বন্তরের সময় চরম আকার ধারণ করে। ১৭৬০ সালে ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে আবার বক্সারের যুদ্ধের (১৭৬৫) কয়েক মাস পরে ভারতে ফিরে আসেন এবং ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে শেষ বারের মত স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানীর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ দিল্লীর মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ

আলমের কাছ থেকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ক্লাইভ আশা করেছিলেন যে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দেশবাসী তাঁকে অভিনন্দিত করবে। কিন্তু কার্যত তাঁকে ঠিক বিপরীত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ব্রিটিশ লোকসভায় তাঁর বিরুদ্ধে বহু দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। ক্লাইভ ইউরোপে ফিরে গিয়ে লণ্ডন ও প্যারিসের অভিজাত সমাজে প্রবেশের চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হন। উচ্চ সম্প্রদায়ের জনগণ তাঁকে অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে থাকে। ক্ষোভে, দুঃখে ক্লাইভ মাত্র উনপঞ্চাশ বছর বয়সে ক্ষুর দিয়ে নিজের জীবনাবসান ঘটান। ব্যক্তিগত জীবনে ক্লাইভ ছিলেন একজন অশিক্ষিত, ন্যায়-নীতি বিবর্জিত মানুষ। কোম্পানীর এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনে তিনি যে কোন ধরনের অসৎ উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত ছিলেন। ক্লাইভের যে অপরিমিত লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শাসক হিসাবেও তিনি সফল হতে পারেননি। তা সত্ত্বেও বলা যায় ক্লাইভ ছিলেন একজন সাহসী, পরিশ্রমী ও সফল সেনানায়ক। অসাধারণ ধুরন্ধর ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন এই মানুষটি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।



ক্লিওপেট্রা

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী]

প্রাচীন মিশরের রানী ছিলেন। ৫১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পিতা টলেমি অউলেটিসের মৃত্যুর পর ক্লিওপেট্রা তাঁর ভ্রাতার সাথে যুগ্মভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ রূপসী, বুদ্ধিমতি, উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালিপ্সু। শীঘ্রই তাঁর বিরুদ্ধে ভ্রাতৃহত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার অভিযোগ আনা হলে তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। ক্লিওপেট্রা তাঁর জাদুকরী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সৈন্যবাহিনীকে হস্তগত ক'রে দেশে এক গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটান। ৪৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জুলিয়াস সীজার

পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী পম্পের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে মিশরে এসে উপস্থিত হলে তিনি ক্লিওপেট্রার রূপেগুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন। ক্লিওপেট্রার ভ্রাতা টলেমিকে ক্ষমতাচ্যুত ক'রে সীজার ক্লিওপেট্রাকে মিশরের পূর্ণ কর্তৃত্বভার প্রদান করেন। সীজারের বিশেষ পীড়াপীড়িতে ক্লিওপেট্রা তাঁর সাথে রোমে গমন করেন এবং সীজারের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। ৩৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি রোমের ট্রায়াম্‌ভির মার্কাস অ্যান্টোনিয়াসকে (মার্ক অ্যান্টনী) বিবাহ করেন। ৩১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে অক্টেভিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অ্যান্টনী ও ক্লিওপেট্রা উভয়েই পলায়ন করেন। কিছুদিন পর আলেকজান্দ্রিয়া নামক স্থানে দু'জনেই আত্মহত্যা করেন। ক্লিওপেট্রা একটি বিষধর সর্পের দংশনে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন বলে জানা যায়।

ক্লিসথিনিস

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী]

খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রীসের একজন স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। মধ্য গ্রীসের সিসিয়ন অঞ্চলের অধিপতি ক্লিসথিনিস তাঁর উচ্চস্তরের শাসনব্যবস্থার জন্য সমগ্র গ্রীসে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর শাসনকে হিতকর, দক্ষ এবং এককথায় চমৎকার বলা চলে। তিনি প্রজাসাধারণের অবস্থার উন্নতিকল্পে বহু শাসন সংস্কার করেছিলেন যেগুলো ইতিহাসে তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ক্লিসথিনিসের ক্ষমতা ও নৈপুণ্য শুধুমাত্র শাসন সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। তাঁর কূটনৈতিক জ্ঞান ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও ছিল যথেষ্ট রকম। তিনি আর্গসের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধাভিযান করে সাফল্যলাভ করেন। সিসিয়নে স্বৈরাচারী রাজগণের শাসন দীর্ঘ একশো বছরেরও অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল যার পশ্চাতে ক্লিসথিনিসের অবদান কম ছিল না।

ক্লোটার দ্বিতীয়

[শাসনকাল ৫৮৪-৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ]

চিলপেরিকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ক্লোটার ৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কিস বংশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিরোধী গোষ্ঠীগুলো পরাজিত হলে তিনি সমগ্র ফ্রাঙ্কোনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি হন। দ্বিতীয় ক্লোটারের রাজত্বকাল প্রধানতঃ আইন-প্রণয়ণের দিক দিয়ে স্মরণীয়। ক্লোটার একজন দুর্বল রাজা ছিলেন। তিনি একবার ক্লিচি নামক স্থানে একটি জাতীয় সভার অধিবেশন আহ্বান করেন। এই সভায় ক্লোটারের সামনেই অস্ট্রেসিয়ান ও বার্গাণ্ডিয়ানরা তুমুলভাবে প্রকাশ্য কলহে লিপ্ত হয়েছিল। উভয় পক্ষই অস্ত্রধারণ করে এবং একে কেন্দ্র করে এক বড় ধরনের অশান্তির

সৃষ্টি হয়। শেষে ক্লোটার বার্গাণ্ডীয়দের শান্ত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। তিনি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের শাস্তি প্রদানে ব্যর্থ হন এবং সভা ভেঙ্গে দেন। তাঁর মত দুর্বল শাসকের পক্ষে সামরিক শক্তির প্রকাশ দেখিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করা সম্ভব ছিল না। ক্লোটারের দুর্বলতার সুযোগে একজন ফ্রাঙ্কিস ভাগ্যান্বেষী স্যামোর নেতৃত্বে স্লাভরা ক্ষমতা বিস্তার করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই মেরোভিঞ্জিয় শাসনের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুদীর্ঘ ৪৫ বছর রাজত্ব করার পর ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ক্লোটার ইহলীলা সংবরণ করেন।

ক্লোভিস

[শাসনকাল ৪৮১-৫১১ খ্রীষ্টাব্দ]

ফ্রাঙ্কদের একজন রাজা ছিলেন। তিনি ৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র পনের বছর বয়সে মেরোভিঞ্জিয় সিংহাসনে বসেন এবং মোট তিরিশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালের সূচনায় ফ্রাঙ্কিস সাম্রাজ্যের সীমা গলের ক্ষুদ্র এক প্রান্তে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য ফ্রাঙ্কিস গোষ্ঠীগুলো গলের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করত। সেইসময় মোট ৬টি স্বাধীন রাজ্যে গল বিভক্ত ছিল। ক্লোভিসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তিনি এই সব খণ্ড বিচ্ছিন্ন পরস্পর বিবদমান রাজ্যগুলোকে জয় করে তাঁর নিজস্ব শাসনাধীনে আনেন। তিনি নিজে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং ক্যাথলিক চার্চের প্রতি তাঁর অবদান ছিল নিঃসন্দেহে বিরাট। তিনি ক্যাথলিক ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং রোমান চার্চকে হেরেটিকদের হাত থেকে রক্ষা করে ইউরোপে দৃঢ় ভিত্তির উপর একে প্রতিষ্ঠিত করেন। পশ্চিম ইউরোপকে কার্যত তিনিই ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি ফ্রাঙ্কিস রাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় করেন, বিভিন্ন ফ্রাঙ্কিস গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ ও হানাহানি দূর করেন এবং বিরোধী শক্তিগুলোকে নির্মমভাবে দমন করেন। গলের ক্ষুদ্র এক অংশের রাজা হিসাবে জীবন শুরু করে তিনি পরবর্তীকালে এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন এবং রোমানদের অনুকরণে এক উন্নত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এইভাবে তিনি কনস্টানটাইনের মত তাঁর সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ঐক্য স্থাপন করেন যা পরবর্তীকালে বিখ্যাত শার্লেমানের গৌরবময় শাসনের পথ প্রস্তুত করে। ক্লোভিসের চরিত্র সম্বন্ধে বলা চলে, তিনি ন্যায়নীতির ধার বড় একটা ধারতেন না, তাঁর কাছে প্রয়োজনই ছিল রাজনীতি এবং নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র করে নির্মমভাবে প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি ছিলেন একজন নির্মম, স্বেচ্ছাচারী শাসক ও সাম্রাজ্যলোলুপ বিজেতা। তা সত্ত্বেও তাঁর অবদানের জন্য ক্লোভিস ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ক্লোভিস ৫১১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

খারবেল

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী]

মহারাজা খারবেল প্রাচীন ভারতের রাজাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর শাসনকাল নানা কারণে ইতিহাসে স্মরণীয়। তাঁর রাজত্বকালের সময় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত মত অনুযায়ী ২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ নাগাদ তিনি কলিঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। উদয়গিরি পাহাড়ে প্রাপ্ত খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপি থেকে তাঁর রাজত্বকালের তেরো বছর পর্যন্ত অনেক কথাই জানা গেছে। খারবেলের জন্ম হয়েছিল চেত বংশে এবং সম্ভবতঃ তাঁর পিতামহ মহামেঘবাহন কর্তৃক কলিঙ্গে চেত রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি কলিঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 'কলিঙ্গাধিপতি' এবং 'কলিঙ্গ চক্রবর্তীন' উপাধি ধারণ করেন। খারবেল অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন এবং কলিঙ্গের সামরিক শক্তি মগধের যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে খারবেলের সুযোগ্য নেতৃত্বে কলিঙ্গ এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। খারবেল জৈন ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা ছিল যথেষ্ট রকম এবং সামরিক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে অনেক বিস্তৃত করেন। হাতিগুম্ফা শিলালিপি থেকে জানা যায় তিনি দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাঞ্চলের রাজাকে পরাজিত করেন, উত্তরে রাজগৃহ অধিকার করেন এবং মগধ জয় করেন, উত্তর-পশ্চিম অংশের গ্রীক রাজ্য আক্রমণ করেন এবং দক্ষিণের পাণ্ড্যরাজ্যের একাংশ জয় করেন। খারবেল একজন প্রজাদরদী শাসক ছিলেন এবং জনকল্যাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। হাতিগুম্ফা শিলালেখ যে খারবেলের প্রশস্তি গাওয়ার উদ্দেশ্যে খোদিত হয়েছিল এবং অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবুও সমসাময়িক আমলের, বিশেষতঃ খারবেলের রাজত্বকালের ইতিহাস জানার পক্ষে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। খারবেলের মৃত্যুর সাথে সাথে সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে কলিঙ্গের ইতিহাসে আবার অন্ধকার যুগ শুরু হয়।

খিজিরখান

[শাসনকাল ১৪১৪-১৪২১ খ্রীষ্টাব্দ]

ভারতে সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ অভিযান শেষ করে ফিরে যাবার সময় খিজির খানকে মুলতান, লাহোর এবং দীপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যান। কিছুদিনের মধ্যে সুলতান মামুদ শাহের মৃত্যু হলে দিল্লীর

ওমরাহগণ দৌলত খান লোদীকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে খিজির খান তাঁকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন (১৪১৪)। তিনি সৈয়দ বংশীয় ছিলেন বলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশকে সৈয়দ বংশ বলা হয়। খিজির খান তৈমুরের চতুর্থ পুত্র এবং তাঁর উত্তরাধিকারী শাহরুখের প্রতিনিধি হিসাবে এদেশ শাসন করতেন এবং তাঁকে রাজস্ব, উপহার প্রভৃতি পাঠাতেন। খিজির খানের সাত বছর স্থায়ী রাজত্ব-কালের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় সৈয়দবংশের শাসন দিল্লী ও তার আশেপাশে খুবই সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ফিরিস্তা খিজির খানকে একজন ন্যায়পরায়ণ, উদার হৃদয় ও প্রজাবৎসল শাসক বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি খুব একটা শক্তিশালী শাসক ছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর সময়ে এটাওয়া, কনৌজ, কম্পিলা প্রভৃতি স্থানের হিন্দু প্রধানেরা তাঁর কর্তৃত্ব উপেক্ষা করে এবং নানা অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকে। খিজির খান এক অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে মারা যান (১৪২১।

গনেশ

[শাসনকাল ১৪১৪-১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ]

ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান সৈফউদ্দিন হামজা শাহের আমলে এক প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। সেই সুযোগে দিনাজপুরের হিন্দু ব্রাহ্মণ জমিদার গনেশ বাংলার সিংহাসন দখল করে এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ বাংলাদেশে মোট আঠাশ বছর রাজত্ব করে। গনেশ ছিলেন দিনাজপুরের একজন প্রতাপশালী জমিদার। হিন্দু জমিদারের বাংলার মসনদলাভে মুসলমানেরা রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে গনেশকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু গনেশ ছিলেন যথেষ্ট বিচক্ষণ ও কূটনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন। গনেশ 'দনুজমর্দনদেব' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি বাস্তবিকই একজন সুশাসক ছিলেন। তাঁর চার বছরের স্বল্পস্থায়ী রাজত্ব ছিল বাংলায় সুখ ও শান্তির কাল। তাঁর সুশাসনে সাধারণ মুসলমান প্রজারাও অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল। ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গনেশ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গণ্ডোফার্ণেস

[শাসনকাল ২০-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ]

গণ্ডোফার্ণেস ছিলেন পহলব বা পার্থিয় জাতির শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর আমলে ভারতে পহলব শক্তি সার্বিকভাবে বিকাশ লাভ করে। মার্শালের মতে গণ্ডোফার্ণেসের সাম্রাজ্য, সিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও দক্ষিণ আফগানিস্থান

এবং পশ্চিমের পার্থিয় রাজ্যের বেশ কিছু জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। গণ্ডোফার্নেস পার্থিয় শাসনপদ্ধতি তাঁর সাম্রাজ্যে প্রবর্তন করেন। তিনি শেষ যবন রাজাকে উৎখাত করে কাবুল উপত্যকা জয় করেন এবং শকদের হাত থেকে গান্ধার রাজ্য ছিনিয়ে নেন। পশ্চিম পাঞ্জাবেও তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে যার থেকে ঐ এলাকার উপর তাঁর আধিপত্যের কথা ধারণা করা যায়।

ইতিহাসে গণ্ডোফার্ণেসের আবির্ভাব ছিল উল্কার মত আকস্মিক। তাঁর পক্ষে তাঁর সাম্রাজ্যকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। তাই তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে গণ্ডোফার্ণেসের বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে থাকে। গণ্ডোফার্ণেসের শাসনকাল কত বছর স্থায়ী হয়েছিল তা সঠিক জানা সম্ভব হয়নি। আনুমানিক ২০ থেকে ৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি রাজত্ব করেন।

গিয়াস্উদ্দিন তুঘলক

[শাসনকাল ১৩২০-১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ]

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গাজী মালিক ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর আমলে সীমান্ত এলাকায় মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সিংহাসনে বসেই তিনি নানাবিধ শাসন সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তিনি দরিদ্র ব্যক্তিদের সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বিদ্বান ব্যক্তিদের ভরণপোষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। তিনি দরবারের প্রধান কবি বিখ্যাত আমীর খসরুকে সরকারী কোষাগার থেকে হাজার তঙ্কা মাসোহারা দানের ব্যবস্থা করেন। তিনি পূর্ববর্তী খলজী শাসক আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেন এবং এমনকি সুদূর বাংলাদেশ অভিমুখে অভিযান চালিয়ে প্রদেশটিকে দিল্লীর অধীনে আনয়ন করেন। তিনি দিল্লীর অনতিদূরে একটি দুর্গ-শহর নির্মাণ করে তার নাম দেন তুঘলকাবাদ। কিন্তু গিয়াসউদ্দিনের দিন ফুরিয়ে এসেছিল। বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসে শীঘ্রই এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু ঘটে (১৩২৫ খ্রীঃ)। তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে একাধিক ঘটনার কথা জানা যায়। বাংলাদেশ থেকে ফিরে এলে তাঁর পুত্র জৌনা খাঁ (পরবর্তীকালে মহম্মদ তুঘলক) এক বিশাল উঁচু কাষ্ঠ নির্মিত মঞ্চ স্থাপন করে তাঁকে সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেন। জিয়াউদ্দিন বারনী ও ইয়াহিয়া বিন আমেদ সরহিন্দীর লেখা থেকে জানা যায় যে গিয়াস যখন মঞ্চে আরোহণ করেন তখন অকস্মাৎ বজ্রপাতে মঞ্চ ভেঙে পড়ে ও তাঁর মৃত্যু ঘটায়। কিন্তু ইবন বতুতা এই ঘটনার জন্য মহম্মদ তুঘলককে সম্পূর্ণ দায়ী করে বলেছেন যে সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে তিনি সুপরিকল্পিতভাবে মঞ্চটি তৈরী করিয়েছিলেন যাতে ওটা সহজেই ভেঙে পড়ে।

গিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহ

[শাসনকাল ১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ]

বাংলায় হুসেন শাহ প্রতিষ্ঠিত বংশের শেষ সুলতান হলেন গিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহ। ফিরুজ শাহের মৃত্যুর পর ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলার শাসক হন এবং তাঁর পাঁচ বছর স্থায়ী রাজত্বকাল ছিল অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ। তাঁর আমলে আফগান নেতা শের শাহ বাংলা দেশ আক্রমণ করলে মামুদ শাহ পরাজিত হয়ে প্রভূত পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাঁর সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। শাসক হিসেবে গিয়াসউদ্দিন আদৌ যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। রাজ্য পরিচালনা ও তার প্রতিরক্ষার জন্য যে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা থাকা উচিত তা তাঁর ছিল না। সুতরাং বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যাবার জন্য তাঁকে অনেকাংশে দায়ী করা চলে। সমসাময়িক পর্তুগীজদের বিবরণ থেকে জানা যায় তাঁর নৈতিক চরিত্র ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের এবং তাঁর হারেমে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল দশ হাজারের মত। রাজকার্য পরিচালনায় তিনি নিজেকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেন এবং সাধারণ বুদ্ধিরও অভাব দেখান। তিনি ক্ষতিকারক ও নির্ভরতার অযোগ্য লোহানিদের সাথে নিজের ভাগ্য জড়িত করে এক মস্ত ভুল করেন। আফগানবীর শেরশাহের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াও ছিল তাঁর পক্ষে নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। তা ছাড়া শেরশাহের শক্তিকে চূর্ণ করার জন্য তিনি মোগল শক্তির সাহায্য লাভের কথা চিন্তা করেননি। শেষ পর্যন্ত তাঁর অপদার্থতার জন্য তাঁকে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন হারাতে হয়েছিল। মোগল সম্রাট হুমায়ুন বঙ্গের রাজধানী গৌড় জয় করার সাথে সাথে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অন্ধকার পর্বের সূচনা হয়।

গুস্তাভাস এ্যাডলফাস

[শাসনকাল ১৬৩০-১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ]

সুইডেনের একজন প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি 'ভাস' বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন এবং তাঁকে উত্তর ইউরোপের সিংহ বলা হত। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে বসেন এবং অলপকালের মধ্যেই সুইডেনকে ইউরোপের একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে সমর্থ হন। তিনি ইউরোপের উত্তরাংশে আপন শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন। এক অত্যন্ত প্রতিকূল ও অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন কারণ তাঁকে ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড ও রাশিয়া এই তিন শক্তির বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু অসাধারণ সামরিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করে তিনি তাঁর

বিরোধী রাষ্ট্রগুলোকে প্রতিহত করেন। তিনি রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের অংশবিশেষ জয় করেন। এরপর তিনি প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন। এছাড়া বাল্টিক সাগরকে সুইডেনের কুক্ষিগত করার অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। তিনি তাঁর সামরিক প্রতিভার দ্বারা সমগ্র ইউরোপকে চমৎকৃত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র দু'বছর রাজত্ব করার পর ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে লুটজেনের যুদ্ধক্ষেত্রে গুস্তাভাস এ্যাডলফাসের জীবনাবসান ঘটে।

গুস্তাভাস ভাসা

[শাসনকাল ১৫২৩-১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগের সুইডেনের ইতিহাসের একজন বিখ্যাত রাজা। গুস্তাভাস ভাসা ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের সিংহাসনে বসেন এবং সুদীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর অত্যন্ত নিপুণভাবে রাজকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ডেনমার্কের অধীনতা থেকে এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে রোমের প্রভাব থেকে সুইডেনকে মুক্ত করে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সুইডেনের রাজসিংহাসনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশ এক গৌরবময় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং বংশধরদের আমলে সুইডেনের সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়। বাস্তবিকই, তাঁর সময়ে সুইডেনের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয় বলা চলে। গুস্তাভাস ভাসা ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গোপাল

[শাসনকাল ৭৫০-৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ]

বাংলার বিখ্যাত পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গোপাল। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গের রাজা হন। ধর্মপালের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে দেশে তখন যোগ্য শাসকের অভাবে মাৎস্যন্যায় চলছিল। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য জনসাধারণ গোপালকে তাদের রাজা হিসাবে মনোনীত করে। গোপাল সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথে অন্যান্য সামন্ত রাজারাও একে একে স্বেচ্ছায় তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়। গোপালের প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। সম্ভবতঃ রাজা হবার আগে তিনি একজন শক্তিশালী স্থানীয় নেতা ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁর রাজ্য পূর্ববঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তিনি প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশের অধীশ্বর হন। গোপালের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল বাংলাকে দীর্ঘস্থায়ী অরাজক পরিস্থিতির হাত থেকে উদ্ধার করে তিনি স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পাল শাসনের ভিত্তিপ্রস্তর তিনি স্থাপন করে যান যা পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র ধর্মপালের আমলে আরও দৃঢ় ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কুড়ি বছর রাজত্ব করার পর ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে গোপালের মৃত্যু হয়।

গোবিন্দচন্দ্র

[শাসনকাল ১১১৫-১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দ]

গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন গাড়ওয়াল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ১১১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে গাড়ওয়াল সাম্রাজ্যকে অত্যন্ত দক্ষভাবে শাসন করেন। একজন বড় সমরনায়ক হিসাবে তিনি তাঁর প্রতিভার যথেষ্ট স্বাক্ষর রাখেন। তিনি মুসলমান শক্তিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীর হাতে বাংলার রাজা রামপালকেও পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁর আমলে কনৌজ ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহরে পরিণত হয় এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে এর গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। গোবিন্দচন্দ্রের একটি অন্যতম প্রধান কীর্তি হল তুর্কী আক্রমণের হাত থেকে হিন্দুদের পবিত্র স্থানগুলোকে রক্ষা করা।

গ্যাসেরিক

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী]

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে স্পেনের দুর্ধর্ষ ভ্যাণ্ডাল উপজাতির নেতা ছিলেন গ্যাসেরিক যিনি জেনসেরিক নামেও ইতিহাসে পরিচিত। তিনি ৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকা অভিযান করে সেখানে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং ৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কার্থেজ জয় করে স্থানটিকে তাঁর রাজধানী করেন। গ্যাসেরিক ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালী অভিমুখে সমরাভিযান চালিয়ে তদানীন্তন রোমান সম্রাট ভ্যালেণ্টিয়ানকে পরাজিত ও নিহত করেন। রোম অধিকার করার পর তিনি জনগণের উপর অত্যাচার ও লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে যান এবং প্রচুর ধনরত্ন ও মূল্যবান দ্রব্য লাভ করেন। গ্যাসেরিক ৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গ্ল্যাডস্টোন

[শাসনকাল ১৮৬৮-৭৪, ১৮৮০-৮৫, ১৮৮৬, ১৮৯২-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংলণ্ডের একজন বিশিষ্ট প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। উইলিয়াম ইউয়ার্ট গ্ল্যাডস্টোন ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন লিভারপুলের একজন ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র। তিনি ইটন ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ

করেন এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে একজন টোরি সদস্য হিসাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সর্বপ্রথম নির্বাচিত হন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল তেইশ বছর। ৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'লর্ড অব্ দি ট্রেজারী' পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট পীল তাঁকে 'বোর্ড অব্ ট্রেড' এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেন। দু'বছর পর তিনি প্রেসিডেন্ট পদে উন্নীত হন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লর্ড পামারস্টোনের মন্ত্রিসভায় 'চ্যান্সেলর অব্ দি এক্সচেকার'-এর পদ লাভ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর 'হাউস অব্ কমন্স'-এর নেতা হয়ে বসেন। তিনি মোট চারবার ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। উদারপন্থী রাজনীতিবিদ গ্ল্যাডস্টোন নানাপ্রকার শাসন সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত আইন, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের আইন, ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান, ব্যালট ও বিচারালয় সংক্রান্ত আইন, এবং সামরিক বিভাগের উন্নতিকল্পে আইন প্রণয়ন করেন।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও গ্ল্যাডস্টোন উদার ও শান্তিপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি ইতালীর ঐক্য আন্দোলনকে সমর্থন করেন। তিনি ডিজরেলীর বলকান ও আফগান নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ইঙ্গ-আফগান সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি হয়। গ্ল্যাডস্টোন সুদান থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ করেন এবং বুয়রদের স্বাধীনতার দাবিকে স্বীকৃতি জানান। আয়ারল্যান্ডের প্রতিও গ্ল্যাডস্টোনের আচরণ ছিল উদার ও সহানুভূতিপূর্ণ। তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত 'আইরিশ ল্যান্ড অ্যাক্ট' বা 'জমি-আইন' এর প্রবর্তন করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাময়িকভাবে পদত্যাগ করেন এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ ক'রে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর পদে ফিরে আসেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যান এবং পরের বছরই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয়বারের মত প্রধানমন্ত্রী হন। এই সময় আয়ারল্যান্ডের জন্য তাঁর প্রথম 'হোমরুল বিল' কমন্স সভায় উত্থাপিত হ'লে তা গৃহীত না হওয়ায় গ্ল্যাডস্টোন মন্ত্রীত্ব-পদে ইস্তফা দেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে গ্ল্যাডস্টোন চতুর্থবারের মত প্রধানমন্ত্রীর পদলাভ ক'রে পুনরায় দ্বিতীয় 'হোমরুল বিল' পার্লামেন্টে উত্থাপন ক'রে ব্যর্থ হন। কমন্স সভা এটা পাস করলেও লর্ড সভার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্ল্যাডস্টোন শেষবারের মত পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি পার্লামেন্টিয় রাজনীতিতে আর অংশগ্রহণ করেননি। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে মে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃতদেহ ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে সমাধিস্থ করা হয়।

গ্ল্যাডস্টোন ছিলেন ইংলন্ডের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী ও রাজনীতিবিদ্। চরিত্রগত দিক থেকে তিনি তাঁর সমসাময়িক ও ইংলন্ডের অপর একজন বিশিষ্ট রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলীর সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের মানুষ ছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে ডিজরেলী ছিলেন তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ। গ্ল্যাডস্টোন ছিলেন পণ্ডিত, সুবক্তা, নীতিনিষ্ঠ, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও হৃদয়বান একজন মানুষ। প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মানুষটি তাঁর কর্মদক্ষতা ও চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা ইংরাজ জনগণের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

চন্দ্রগুপ্ত প্রথম

[শাসনকাল ৩২০-৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন গুপ্ত বংশের একজন রাজা। সম্ভবতঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত বংশের তৃতীয় রাজা। তবে তিনিই হলেন প্রথম পরিচিত রাজা যিনি "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। শক্তিশালী লিচ্ছবী বংশের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তিনি নিজের সিংহাসনকে নিরাপদ করেন। সেই সময় লিচ্ছবীরা বিহারের একাংশ এবং সম্ভবতঃ সুদূর নেপালের উপরও তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। লিচ্ছবী রাজবংশের কন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করার পর রাজা হিসাবে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মর্যাদাও যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বেশ কয়েকটি স্থান জয় করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা কিছুটা প্রসারিত করেন। তাঁর আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্য সম্ভবতঃ এলাহাবাদ, অযোধ্যা এবং দক্ষিণ বিহার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তাব্দের সূচনা কাল ধরা হয়ে থাকে। পণ্ডিতগণ মনে করেন প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল থেকেই এর প্রচলন হয়। পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ৩৩৫ খ্রীঃ) পরলোকগমন করেন।

চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়

[শাসনকাল ৩৮০-৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ]

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত বংশের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মোট তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। ইতিহাসে তিনি বিক্রমাদিত্য নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন পিতার উপযুক্ত পুত্র। সিংহাসনে আরোহণ করেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতার সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সামরিক এবং শান্তিপূর্ণ উভয় নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি

ছিলেন একজন মস্তবড় কুটনীতিবিদ্। তিনিও পিতার মত একাধিক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। তিনি নাগ বংশের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং দক্ষিণের শক্তিশালী বাকাটক বংশের দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সাথে নিজ কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ দেন। এইভাবে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করে তিনি তাঁর সাম্রাজ্য-বিস্তারে মন দেন এবং পূর্ব মালব অভিমুখে অভিযান করেন। তাঁকে উজ্জয়িনী এবং পাটলিপুত্রের অধীশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর বহু মুদ্রায় তাঁকে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিযুক্ত দেখা যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল শকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ। তিনি শকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে পশ্চিম মালব ও কাথিয়াওয়াড় থেকে তাদের উচ্ছেদ করেন। তিনি শকরাজাকে হত্যা করে 'শকারি' উপাধিতে ভূষিত হন। বিক্রমাদিত্য হলেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের একজন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় শাসক। তাঁকে নিয়ে নানা কিংবদন্তী উপকথা উপাখ্যান রচিত হয়েছে। নবরত্নসভার কথা ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই জানা। মহাকবি কালিদাস ছিলেন এই সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন। তবে নয় জন রত্ন সমসাময়িক কালের ছিলেন বলে মনে হয়না। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এদেশে আসেন এবং পাটলিপুত্র শহর দেখে মুগ্ধ হন। ফা-হিয়েনের লেখা থেকে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ও সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানা মূল্যবান তথ্য জানা গেছে।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

[শাসনকাল ৩২১-৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন চন্দ্রগুপ্ত। ৩২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি যখন মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর বয়স ২৫ বছর এবং একজন কূটবুদ্ধি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কৌটিল্য (চাণক্য) ছিলেন তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা। মূলতঃ কৌটিল্যের সাহায্যেই চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। নন্দ রাজশক্তিকে ধ্বংস করে গাঙ্গেয় উপত্যকার উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করার পর চন্দ্রগুপ্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশের দিকে দৃষ্টি দেন। আলেকজাণ্ডারের ভারতত্যাগের পর ঐসব অঞ্চলে নিজ প্রভাব বিস্তারের এক সুবর্ণ-সুযোগ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়। গ্রীক লেখকদের লেখায় চন্দ্রগুপ্তকে 'স্যাণ্ড্রোকোট্রাস' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রীক লেখকদের লেখা থেকে জানা যায় ৩০৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক সেনাপতি সেলুকাস ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে একটি বৈবাহিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল।

সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে এক দূতকে পাঠান। মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রে বহু বছর অতিবাহিত করেন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন।

তাঁর লেখা মূল গ্রন্থ 'ইণ্ডিকা' পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তীকালে বহু লেখক এই গ্রন্থ থেকে বহু উপাদান সংগ্রহ করেছেন যেগুলো সমসাময়িককালের ইতিহাস জানার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। মৌর্য ও গ্রীকদের মধ্যে রীতিমত দূত ও অন্যান্য মূল্যবান উপহার সামগ্রী বিনিময় চলত।

জৈনরা দাবি করেন যে তাঁর জীবনের শেষ দিকে চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি নাকি সিংহাসন ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন এবং অবশেষে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের অন্যতম প্রধান কীর্তি হ'ল বিদেশী গ্রীক অধীনতাপাশ থেকে ভারতীয় অঞ্চলগুলো মুক্ত করা এবং ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা। চন্দ্রগুপ্ত মৌরিয় গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন এবং নীচ বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। মৌরিয়রা ছিল বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু স্বীয় প্রতিভা ও যোগ্যতাবলে তিনি ক্ষমতার শীর্ষে ওঠেন। চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে অল্পবয়স থেকেই তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চল থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করেন এবং আলেকজাণ্ডারের একজন জেনারেল সেলুকাসকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করেন। সিন্ধু ও হিন্দুকুশের মধ্যবর্তী রাজ্যগুলো সেলুকাস তাঁকে সমর্পণ করতে বাধ্য হন। চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরে পারস্য সীমান্ত থেকে দক্ষিণে মহীশূর এবং পূর্বে বাংলা থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব শুধুমাত্র তাঁর রাজ্যজয় ও বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। একজন সুদক্ষ প্রশাসক হিসাবেও তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মৌর্য সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হবার মূলে এই শাসনব্যবস্থার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

জীবনের একটা বড় অংশ যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকলেও হৃদয়ের সুকুমারবৃত্তিগুলো তাঁর অটুট ছিল। রাজধানী পাটলীপুত্র নগরটিকে তিনি নতুনভাবে সুসজ্জিত করেন। তাঁর রাজসভা জ্ঞানীগুনীর দ্বারা পূর্ণ থাকত এবং তিনি সব সময় তাঁদের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করতেন। এঁদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী কৌটিল্যের নাম সর্বাগ্রগণ্য। শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির তিনি ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সময়ে বহু সূত্র, গাথা ও অপদান রচিত হয়েছিল। ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চন্দ্রবর্মা

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী]

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে রাজপুতানার মরুপ্রদেশের অন্তর্গত পুষ্করণা নগরের রাজা ছিলেন চন্দ্রবর্মা। তিনি ছিলেন এক দিগ্বিজয়ী বীর। তিনি সপ্তসিন্ধুর মুখে অবস্থিত বহ্লীক দেশ থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ এলাকা জয় করেন বলে জানা যায়। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের গায়ে চন্দ্ররাজার এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার থেকে জানা যায় তাঁর পিতার নাম ছিল সিংহবর্মা এবং তিনি ছিলেন একজন পরম বৈষ্ণব। দিল্লীর কুতুবমিনারের সামনে যে লৌহস্তম্ভ আছে তার গায়ে খোদিত প্রাচীন লিপি থেকে জানা যায় চন্দ্র নামে এক বিষ্ণুভক্ত রাজা বঙ্গ ও বহ্লীক দেশে শত্রুদের বিনাশ সাধন করেছিলেন। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মান্দাশোরে একটি শিলালিপি আবিষ্কার করেছেন। এই লিপি থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তার ওপর ভিত্তি করে শাস্ত্রী মহোদয় এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শুশুনিয়া পর্বত লিপির চন্দ্রবর্মা ও দিল্লীর লৌহস্তম্ভে উল্লিখিত চন্দ্রবর্মা একই ব্যক্তি।

চন্দ্রবর্মার শেষ জীবন সুখের হয়নি। কারণ এই সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরাক্রমশালী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত বঙ্গদেশ আক্রমণ করে চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করলে শাসক হিসাবে তাঁর স্বাধীন অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

চাঁদবিবি (সুলতানা)

[শাসনকাল ১৫৮০-১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ]

আহমদনগরের হুসেন নিজাম শাহের কন্যা এবং বিজাপুরের আলি আদিল শাহের বেগম ছিলেন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীর মৃত্যু হলে চাঁদ সুলতানা তাঁর নাবালক পুত্রের হয়ে রাজ্যশাসন করতেন। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন একজন বীরাঙ্গনা রমণী। রাজনৈতিক জ্ঞান ও শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিভার যথেষ্ট স্বাক্ষর রাখেন। বিখ্যাত মোগল সম্রাট আকবর আহমদনগর জয় করার উদ্দেশ্যে যুবরাজ মুরাদের নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরণ করলে কয়েকমাস ধরে চাঁদ সুলতানা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মোগলবাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। অবশেষে মোগলরা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়। স্থির হয় বেরার মোগলদের অধিকারে থাকবে এবং আহম্মদনগরও তার অধীনস্থ এলাকাগুলো তিনি মোটামুটি স্বাধীনভাবেই শাসন করতে পারবেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চাঁদ বিবি বিরোধী গোষ্ঠীর এক চক্রান্তের শিকার হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।



চার্চিল

[শাসনকাল ১৯৪০-৪৫, ১৯৫১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ]

ইংলণ্ডের সর্বকালের ইতিহাসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্। তাঁকে ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। মূলতঃ তাঁর নির্ভীকতা, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলেই দ্বিতীয় বিশবযুদ্ধে হিটলারের পরাজয় ঘটেছিল। তিনি ১৯৪০-৪৫ এবং ১৯৫১-৫৪ সালের মধ্যে দু'বার ব্রিটিশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদলাভের গৌরব অর্জন করেন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ৯১ বছর বয়সে যখন তাঁর জীবনাবসান হয় সেই সময় তিনি ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বিশ্বের ছোট-বড় বহু দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের জন্য লণ্ডনে সমবেত হয়েছিলেন।

উইনস্টন লিওনার্ড স্পেনসার চার্চিল ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই সৈনিক জীবনের প্রতি তিনি তীব্র আকর্ষণ বোধ করতেন। তিনি প্রথমে হ্যারোতে শিক্ষালাভ করেন এবং তারপর স্যাণ্ডহার্স্টের বিখ্যাত রয়াল মিলিটারি কলেজে ভর্তি হন। একুশ বছর বয়সে কিউবায় স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বিখ্যাত ব্রিটিশ জেনারেল লর্ড কিচেনারের নেতৃত্বে তিনি ভারতবর্ষ ও সুদানে একাধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ক্রমশঃ সামরিক বিভাগে তাঁর পদোন্নতি ঘটতে থাকে। এই সময় বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি বহু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন যেগুলো নিয়ে পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ এ রোভিং কমিশন : মাই আর্লি লাইফ'।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধ শেষ হলে চার্চিল ইংলণ্ডে ফিরে এসে রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করেন। তখন ছিল ১৯০৬ সাল এবং চার্চিল ছিলেন ত্রিশ বছরের যুবক। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা ইংলণ্ডে বেশ পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি প্রথমে রক্ষণশীল দলের হয়ে পার্লামেন্টের সদস্য মনোনীত হন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি রক্ষণশীল দল পরিত্যাগ ক'রে উদারপন্থী (লিবারেল) দলে যোগদান

করেন। তিনি একে একে বোর্ড অব্ ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট, হোম সেক্রেটারি এবং ফার্স্ট লর্ড অব্ দি অ্যাডমিরালটি পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে চার্চিল জার্মানদের হাত থেকে অ্যাণ্টোয়ার্প রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশনৌবাহিনীর সাথে প্রেরিত হন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর তিনি কিছুকাল ফরাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। ডেভিড লিওড জর্জ প্রধানমন্ত্রী হবার পর চার্চিল প্রথমে 'মিনিস্টার অব্ মিউনিশন্স্' ও পরে 'সেক্রেটারি ফর ওয়ার এণ্ড ফর এয়ার' নিযুক্ত হন। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে চার্চিল পুনরায় কনজারভেটিভ দলের সদস্য হন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলোনিয়াল সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেন। ১৯২৪-২৯ এর মধ্যে চার্চিল চ্যান্সেলর অব্ দি এক্সচেকারের পদ লাভ করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন হিটলারের প্রতি তোষণনীতি অবলম্বন করায় তিনি তাঁর বৈদেশিক নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হ'লে চার্চিল পুনরায় ফার্স্ট লর্ড অব্ দি অ্যাডমিরালটি পদে নিযুক্ত হন। সাতমাস পর চেম্বারলেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে চার্চিল প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন।

১৯৪০ সালের মে মাসে ইংলণ্ড এক ঘোরতর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। জার্মানী ইতিমধ্যেই পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে প্রভৃতি দখল করে নিয়েছিল। এরপর হিটলার লুক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালান। জুন মাসে ফ্রান্সের পতন হয় এবং মিত্রপক্ষ অনেকখানি পিছু হঠতে বাধ্য হয়। মিত্র-বাহিনীর এই ঘোরতর দুর্দিনে চার্চিল নেতা হিসাবে তাঁর অনন্যসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন এবং দেশবাসীর মনোবল ঠিক রাখতে অনেক স্মরণীয় ভাষণ দেন। তাঁর অদম্য মনোবল ও অসাধারণ নেতৃত্বদানের জোরে তিনি ইংলণ্ড ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলোকে বহু সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অবশেষে সাফল্যের তীরভূমিতে উত্তীর্ণ করেন। তিনি মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সাথে মিলিত হয়ে 'আটলাণ্টিক চার্টার' রচনা করেন। চার্চিল বেশ কয়েকবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। তিনি মস্কো সফরেও গিয়েছিলেন এবং বৃহৎ আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে যোগদান করেছিলেন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে জার্মানী পরাজয় বরণ করে।

চার্চিল দীর্ঘদিন ধরে ইংলণ্ডের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ইংলণ্ডীয় নির্বাচনে তাঁর দল শ্রমিক দলের কাছে পরাজিত হওয়ায় চার্চিলকে পদত্যাগ করতে হয়। ক্লিমেণ্ট এ্যাটলি চার্চিলের স্থলাভিষিক্ত হন। চার্চিল বিলেতের কমন্স সভায় বিরোধীদলের নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি নতুন সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করেন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে নির্বাচনে জয়লাভ ক'রে তাঁর

দল পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে চার্চিল দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্চিলকে 'নাইট' উপাধি প্রদান ক'রে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়। এরপর থেকে তিনি 'স্যার' উইনস্টন' চার্চিল নামে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮১ বছর বয়সে চার্চিল প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তবে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ছয় খণ্ডে চার্চিল মহাযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যকীর্তির জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।



চার্লস প্রথম

[শাসনকাল ১৬২৫-১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ]

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট বংশের একজন রাজা ছিলেন। প্রথম চার্লস পিতা প্রথম জেমসের উত্তরাধিকারী হিসাবে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬২৫)। তিনি ছিলেন সুদর্শন, গম্ভীর ও মর্যাদাসম্পন্ন। তিনি একজন সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন ও অতিশয় ধর্মপ্রবণ মানুষ ছিলেন। তাঁর চালচলন, আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা সবকিছুর মধ্যদিয়েই রাজকীয় ভাব প্রকাশ পেত এবং এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যথার্থই তাঁর পিতা প্রথম জেমসের ব্যতিক্রম। কিন্তু তাঁর চরিত্রে নানা গুণের সমাবেশ ঘটা সত্ত্বেও পরিস্থিতি অনুযায়ী চলবার ব্যর্থতাই শেষ পর্যন্ত তার পতন ডেকে এনেছিল। তিনি সিংহাসনে বসার পর প্রভাবশালী মন্ত্রী বাকিংহামের পরামর্শ মত চলতে লাগলেন। তাঁরই পরামর্শে চার্লস ফরাসীরাজ ত্রয়োদশ লুইয়ের ভগিনীকে বিবাহ করেন। পার্লামেণ্টের সাথে চার্লসের সম্পর্ক শুরু থেকেই তিক্ত হয়ে ওঠে। চার্লস ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেইভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে সচেষ্ট হলে পার্লামেণ্টের সাথে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিরোধ চরমে উঠলে প্রথম চার্লস তাঁর পিতার নীতি অনুসরণ করে পার্লামেণ্ট ব্যতিরেকেই শাসন পরিচালনা করতে স্থিরসংকল্পবদ্ধ হলেন। ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু হল প্রথম চার্লসের স্বৈরাচারী শাসনপর্ব। এই শাসন এগারো বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই সময় তিনি অনেক ক্ষেত্রেই টমাস ওয়েন্টওয়ার্থ ও উইলিয়াম ল্যাডের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করতেন। শেষ পর্যন্ত চার্লসের সাথে পার্লামেণ্টের অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু

হয়। এই অন্তর্যুদ্ধের সুযোগে ওলিভার ক্রমওয়েল ও তাঁর নিউ মডেল সৈন্যবাহিনী ইংলণ্ডের রাজনীতির প্রধান নিয়ন্তা হয়ে ওঠেন এবং পার্লামেণ্টের সাথে রাজার মিটমাটের সবরকম সম্ভাবনা বাতিল করে দেন। এরপর 'রাম্প' পার্লামেণ্ট রাজার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে তাঁর বিচার করে। বিচারে প্রথম চার্লসকে দোষী বলে ঘোষণা করে তাঁর শিরচ্ছেদ ঘটানো হয় (১৬৪৯ খ্রীঃ)।

চার্লস দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৬৬০-১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ]

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট বংশের রাজা ছিলেন। দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬০ খ্রীঃ ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং পঁচিশ বছর ধরে রাজকার্য পরিচালনা করেন। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চালর্সের শিরচ্ছেদ ঘটানোর পর ইংলণ্ডে রাজতান্ত্রিক শাসনের উপর সাময়িক যবনিকা পতন ঘটেছিল। এগারো বছর পর ১৬৬০ খ্রীঃ দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসনারোহণের সাথে সাথে স্টুয়ার্ট রাজবংশ পুনরায় শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসে। দ্বিতীয় চার্লস তিরিশ বছর বয়সে রাজা হন। তিনি ছিলেন অলস, ফুর্তিবাজ লঘুচিত্ত, রসিক এবং নীতিজ্ঞানশূন্য। তিনি ছিলেন স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী। তাঁকে উদারচিত্তের মানুষ বলে মনে হলেও এই উদারতার পিছনে তাঁর স্বার্থবুদ্ধি কাজ করত। নিজ স্বার্থসাধনে তিনি নির্বিচারে কপটতা, ভণ্ডামী ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতেন। তিনি জাঁকজমক ও বিলাস-ব্যসনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। তিনি অত্যন্ত কুটবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং তার মনের কথা কখনও বাইরে প্রকাশ পেত না। দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসনে বসার কিছু দিনের মধ্যেই কনভেনশন পার্লামেণ্ট প্রথম চার্লসের হত্যাকারীদের প্রাণদণ্ড বিধান করল। দ্বিতীয় চার্লস 'ক্যাভেলিয়ার' অর্থাৎ প্রথম চার্লসের সমর্থকদের নিয়ে তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করায় এই মন্ত্রিসভার নাম হয় ক্যাভেলিয়ার মন্ত্রিসভা। আর্ল অব ক্ল্যারেণ্ডন প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টকে নতুন ভাবে গঠন করা হয়। এই পার্লামেণ্ট ক্যাভেলিয়ার পার্লামেণ্ট নামে পরিচিত ছিল। ক্ল্যারেণ্ডনের পদচ্যুতির পর দ্বিতীয় চার্লস ক্যাবাল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু এই মন্ত্রিসভা ও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় চার্লস ডানবির নেতৃত্বে আর একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। কিন্তু পার্লামেণ্ট ডানবির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাঁকে পদচ্যুত করল। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে লণ্ডন শহর প্লেগ রোগের শিকার হয় এবং এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে, বহু মানুষের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে ইংলণ্ড হল্যাণ্ডের সাথে একাধিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ব্রেডার শান্তি চুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যুদ্ধের অবসান ঘটলেও ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে

দ্বিতীয় চার্লস পুনরায় হল্যাণ্ডের সাথে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হন। দ্বিতীয় চার্লস ক্যাথলিক ধর্মের অনুরাগী ছিলেন এবং ইংলণ্ডের মাটিতে স্বৈরতন্ত্র ও ক্যাথলিক ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

চার্লস পঞ্চম

[শাসনকাল ১৫১৬-১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ]

স্পেনের বিখ্যাত রাজা ফার্দিনান্দের দৌহিত্র ছিলেন পঞ্চম চার্লস। তিনি ফার্দিনান্দের মৃত্যুর পর ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের সিংহাসনে বসেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে স্পেন, নেপল্‌স্ ও নিউ ওয়ার্ল্ড-এর এক বিশাল অংশের কর্তৃত্ব লাভ করেন। পিতার মৃত্যু হলে নেদারল্যাণ্ড এবং পিতামহ ম্যাক্সিমিলিয়ানের মৃত্যুর পর তিনি অস্ট্রিয়া ও এর অধীনস্থ এলাকাগুলোর শাসক হন। কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্য চার্লসকে কখনও স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। সিংহাসনে বসার পর থেকে তাঁর বাকী জীবন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সমস্যার সমাধান ও নানাপ্রকার অশান্তির মোকাবিলা করতে অতিবাহিত হয়ে যায়। চার্লসের আমলে স্পেনের বৈদেশিক নীতি সমস্যাসংকুল ও জটিলাকার ধারণ করেছিল। এইসময় মার্টিন লুথারের রিফর্মেশন আন্দোলন শুরু হওয়ায় তাঁকে আরও ব্যতিব্যস্ত ও দিশাহারা করে তুলেছিল। ঘরে-বাইরের এইসব সমস্যা সমাধানের উপযোগী যে উচ্চমানের কূটনৈতিক বুদ্ধির প্রয়োজন তা চার্লসের ছিল না। তাঁর সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা ঘটেছিল জার্মানীতে যেখানে তিনি লুথারের আন্দোলন প্রতিহত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি বিষয়টিকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গিয়ে মহা ভুল করেন। তিনি এক নতুন ধর্মের শক্তিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। তা সত্ত্বেও বলা যায় পঞ্চম চার্লস নানা ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করেন। তিনি স্প্যানিশ আমেরিকায় একটি উন্নত ও জনকল্যাণকর শাসন প্রবর্তন করেন। এছাড়া আফ্রিকার উত্তর উপকূলে মুসলিম শক্তিহ্রাসেও তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন। নেদারল্যাণ্ডে তাঁর অধিকৃত এলাকাগুলোর মধ্যে ঐক্যসাধনেও তিনি কার্যকারী ভূমিকা নেন। কিন্তু স্পেনের ক্ষেত্রে তিনি অত্যাচারী ও পীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করেন।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর রাজত্ব করার পর ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম চার্লস মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চার্লস ষষ্ঠ

[শাসনকাল ১৭১১-১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত হ্যাপসবার্গ বংশীয় রাজা ছিলেন। ষষ্ঠ চার্লস ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব

পর্যন্ত মোট তিরিশ বছর রাজত্ব করেন। শাসক হিসাবে ষষ্ঠ চার্লস বিশেষ কোনো কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন না। বরং সমসাময়িক প্রাশিয়ার রাজার সাথে তুলনা করলে তাঁর রাজত্বকালকে রীতিমত নিষ্প্রভ বলেই মনে হবে। সামরিক কিংবা শাসনতান্ত্রিক কোনো দিক দিয়েই তাঁর রাজত্বকাল ইতিহাসে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কোনো পুত্রসন্তান না থাকায় সিংহাসনের উত্তরাধিকারীসংক্রান্ত সমস্যা ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে একথা ষষ্ঠ চার্লস রাজত্বকালের শেষ দিকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরিয়া থেরেসাকে তাঁর পরবর্তী শাসক হিসাবে হ্যাপস্‌বার্গ সিংহাসনে বসাবার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু অস্ট্রিয়ার ইতিহাসে কোনো রমণীর সিংহাসন প্রাপ্তির কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত না থাকায় তিনি বিষম সমস্যায় পতিত হন। ষষ্ঠ চার্লস উপায়ান্তর না দেখে 'প্রাগ্‌মেটিক স্যাংশন' নামে নতুন শর্তাবলী প্রণয়ন করে তাঁর কন্যাকে তাঁর পরবর্তী শাসক হিসাবে মনোনীত করেন। কন্যার ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার জন্য তিনি এ বিষয়ে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সমর্থন ও প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টা করেন। ষষ্ঠ চার্লস তাঁর কন্যা মেরিয়া থেরেসার জন্য বাস্তবিকই দুর্বল, বিশৃঙ্খল ও সমস্যাজর্জর এক সাম্রাজ্য রেখে যান। তাই ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর মেরিয়া থেরেসাকে সিংহাসনে আরোহণ করেই বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

চার্লস নবম

[শাসনকাল ১৫৬০-১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে]

দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের পর তাঁর ভ্রাতা নবম চার্লস ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সিংহাসন লাভ করেন। এই সময় তিনি ছিলেন দশ বছরের বালক। তাই তাঁর হয়ে তাঁর মা ক্যাথারিন দি মেডিসি রাজকার্য পরিচালনা করতেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে বিবাদকে কেন্দ্র করে এক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। হুগেনটরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে এবং প্যারিস অবরোধ করে প্রোটেস্টান্টদের জন্য সমানাধিকারের দাবি জানায়। কিন্তু এই দাবি অগ্রাহ্য হলে যুদ্ধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট জার্মেইনের সন্ধি দ্বারা এই গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। এর ফলে হুগেনটরা ধর্মক্ষেত্রে ক্যাথলিকদের সাথে সমানাধিকার ও ফ্রান্সের কতকগুলি শহরের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে। এরপর নবম চার্লস জাতির কর্মশক্তি ও উদ্যমকে গৃহযুদ্ধ থেকে সরিয়ে বৈদেশিক রাজ্যজয়ের দিকে পরিচালিত করেন। তিনি ফ্রান্সের পুরোনো শত্রু স্পেনের বিরুদ্ধে এক জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনা করতে চান। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজ ভগিনী মার্গারেটের সাথে হুগেনটদের নেতা হেনরীর বিবাহের আয়োজন করেন।

এই ঘটনায় প্রোটেস্টান্টদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায় ক্যাথারিন এতে ঈর্ষান্বিত হন, যার ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত সমগ্র ফ্রান্স জুড়ে হাজার হাজার মানুষের হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। এই হত্যাকান্ড সেন্ট বার্থলোমিউ এর কুখ্যাত দিন (১৫৭২) হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই ঘটনার পর অবশিষ্ট জীবিত হুগেনটরা ঘৃণা ও হিংসায় জর্জরিত হয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ফলে নতুন করে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। শেষ পর্যন্ত রাজা হুগেনটদের সাথে সেন্ট জার্মেইনের চুক্তির পূর্ব শর্তগুলি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শান্তি স্থাপন করেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নবম চার্লস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

চার্লস দশম

[শাসনকাল ১৮২৩-১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ]

ফ্রান্সের বুর্বোঁ বংশীয় একজন রাজা ছিলেন। দশম চার্লস তাঁর ভ্রাতা অষ্টাদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হবার পূর্ব পর্যন্ত মোট সাত বছর রাজত্ব করেন। দশম চার্লস সিংহাসনে বসেই সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেন। দশম চার্লস ছিলেন একজন গোঁড়া রাজতন্ত্রী ও চরম রক্ষণশীল শাসক। অধিকন্তু তিনি ছিলেন অদূরদর্শী ও হঠকারী। অতীত ইতিহাস থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হন। তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল প্রধানমন্ত্রী পলিগন্যাক, যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সহায়তায় ফ্রান্সে বিপ্লব পূর্ববর্তী পুরনো অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। তিনি দেশের মধ্যে সর্বপ্রকার উদারনৈতিক ভাবধারা দমনের ব্যবস্থা নেন। দেশে অভিজাত ও যাজকতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলো প্রতিক্রিয়াশীল আইন প্রবর্তন করেন। পলিগন্যাকের স্বৈরাচারী ক্রিয়াকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে জাতীয় প্রতিনিধি সভার উদারপন্থী সদস্যরা তাঁর পদত্যাগ দাবি করলে দশম চার্লস জাতীয় প্রতিনিধি সভা ভেঙ্গে দেন। তিনি ভোটদাতাদের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে নতুন জাতীয় সভা গঠনের আদেশ জারি করেন। সেই সঙ্গে তিনি সংবাদপত্রের উপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করেন। এইসব আদেশ জারী হবার পর দিনই প্যারিসের জনসাধারণ বিদ্রোহ করায় দশম চার্লস ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সিংহাসনচ্যুত হন। এইভাবে দশম চার্লসের সাত বছরের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে। ইতিহাসে এই ঘটনা জুলাই বিপ্লব হিসাবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে।

চার্লস একাদশ

[শাসনকাল ১৬৬০-১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দ]

দশম চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র একাদশ চার্লস ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র চোদ্দ বছর। এই সময় স্বার্থপর বিলাসী অভিজাত সম্প্রদায় শাসনকার্যের ভার গ্রহণ করে। তাদের কুশাসন ও অমিতব্যয়িতার ফলে দেশের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। তারা অর্থের লোভে ও নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে ত্রিশক্তি চুক্তিতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের পক্ষাবলম্বন করে। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পরিস্থিতির চাপে পড়ে একাদশ চার্লস ডাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফ্রান্সের পক্ষ সমর্থন করেন। ব্রাণ্ডেনবার্গ ও ডেনমার্ক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মৈত্রীসঙ্ঘে যোগ দেওয়ায় একাদশ চার্লস ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুইয়ের প্ররোচনায় উভয়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ডেনদের বিরুদ্ধে তিনি জয়লাভ করলেও ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ফেরবেলিনের যুদ্ধে ব্রাণ্ডেন বার্গের গ্রেট ইলেক্টরের হাতে পরাজিত হন। এই পরাজয়ে সুইডেনের সামরিক দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অবশ্য এই পরাজয়ে ব্যক্তিগতভাবে চার্লস লাভবান হন। এই পরাজয়ের জন্য অভিজাতদেরই দায়ী করা হয় এবং ব্যাপক গন সমর্থন পেয়ে চার্লস তাদেরকে পদচ্যুত করেন। তাদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষমতা খর্ব করে চার্লস সম্পূর্ণ স্বাধীন ও এককভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পান। রাজত্বকালের বাদবাকী সময় তিনি দেশের নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটান। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে একাদশ চার্লসের মৃত্যু ঘটে।

চার্লস দ্বাদশ

[শাসনকাল ১৬৯৭-১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দ]

পিতা একাদশ চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বাদশ চার্লস ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র পনের বছর বয়সে সুইডেনের সিংহাসনে বসেন। দ্বাদশ চার্লস অল্প বয়স থেকেই যুদ্ধ-প্রিয় ছিলেন। তিনি ছিলেন নির্ভীক, পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু। কষ্টসাধ্য-খেলাধূলা ও বীরত্বপূর্ণ কাজকর্মে তিনি বিশেষ আনন্দ পেতেন। চার্লস উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। সিংহাসনে বসার কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁকে অনেকগুলো বিরোধী শক্তির সম্মিলিত আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। জীবনের বাকী দিনগুলো তাঁর অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়ে কাটে। চার্লস ছিলেন একজন জন্ম যোদ্ধা এবং তাঁর শত্রুরা তাঁর সামরিক ক্ষমতার

৯

পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়। তিনি ঝড়ের গতিতে অভিযান চালিয়ে ডেনমার্ক ও রাশিয়ার রাজাকে পরাস্ত করেন। এর পর তিনি পোল্যান্ডের রাজাকে পরাজিত করে ওয়ারস দখল করেন। এইভাবে তরুণ সুইডিস রাজা তাঁর প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রগুলোর সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত করে নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। কিন্তু পুনরায় পোল্যান্ড অভিযান করতে গিয়ে তিনি মস্ত ভুল করেন পোল্যান্ডে ব্যস্ত থাকার সময় রাশিয়ার রাজা পিটার বাল্টিকের তীরবর্তী বহু সুইডিস প্রদেশ জয় করে নেন। বেগতিক দেখে চার্লস রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হন। তিনি প্রথমে সুইডিস এলাকাগুলো মুক্ত না করে রাশিয়াকে উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য মস্কো পর্যন্ত অভিযানের পরিকল্পনা করেন। এই প্রয়াসের ফলে পরবর্তীকালে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের মতই তিনি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনেন। রুশীয়রা সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত না হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে এবং গোপন ঘাঁটি থেকে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সুইডিস সৈন্যদের নাজেহাল করে। চার্লস রুশদের একটি যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। কিন্তু এটাই ছিল তাঁর শেষ বিজয়। সুইডিস সৈন্যরা পথশ্রম ও আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় অবষন্ন হয়ে পড়ার দরুণ ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস পুলটাভার রণক্ষেত্রে পিটারের কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। চার্লস কোনও রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। এরপর রুশ, ডেন ও পোলান্ডের সম্মিলিত বাহিনী সুইডেন আক্রমণ করে। সুইডেনের বিরুদ্ধে ইংলন্ডও যোগ দেয়। চার্লস বিরোধী রাষ্ট্রগুলোর সাথে দীর্ঘ সাতবছর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালান। অবশেষে তাঁর সৈন্যবাহিনী রণক্লান্ত হয়ে পড়ে, রাজকোষ শূন্য হয় এবং জনগণও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ের একটি দুর্গ অবরোধ কালে তিনি মারা যান। সমসাময়িক যুগের একজন অসাধারণ সমর বিশারদ হওয়া সত্ত্বেও দূরদর্শিতার অভাব ও হঠকারী স্বভাবের জন্য দ্বাদশ চার্লসের পতন হয়।

চার্লস এলবার্ট

[শাসনকাল ঊনবিংশ শতাব্দী]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সার্ডিনিয়ার রাজা ছিলেন চার্লস। চার্লস ছিলেন একজন উদারনৈতিক ভাবধারাসম্পন্ন মানুষ। সিংহাসনে বসার পর থেকেই তিনি সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে এক ঐক্যবদ্ধ ইতালী গঠনের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি জনগণের উন্নতিকল্পে নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কার প্রবর্তন করেন যেগুলোর মধ্যে 'স্ট্যাটুটো' নামক সংবিধান প্রণয়ন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অস্ট্রিয়া ছিল ইতালীর ঐক্যসাধনের পক্ষে মস্ত প্রতিবন্ধক স্বরূপ। তিনি জানতেন ইতালী থেকে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য খর্ব করা না গেলে সার্ডিনিয়ার জাতীয় রাজতন্ত্রের অধীনে ইতালীর ঐক্য-

সাধন বাস্তবায়িত হবে না। তাই তিনি সার্ডিনিয়ার সামরিক শক্তিবৃদ্ধির দিকে নজর দেন এবং সুযোগ বুঝে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় চার্লসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।



চার্লস দি গ্রেট

[শাসনকাল ৭৬৮-৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট চার্লস ৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পিপিনের মৃত্যুর পর ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস ফ্রাঙ্কিস সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী পিপিন মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সাম্রাজ্য দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যান। ৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে কার্লোমানের মৃত্যুর পর চার্লস সমগ্র ফ্রাঙ্কিস সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। চার্লস ছিলেন একজন সাম্রাজ্যবিজয়ী বীর ও দক্ষ প্রশাসক। 'মহান চার্লস' বা 'শার্লেমান' নামে তিনি ইতিহাসে বিশেষ পরিচিত। সাম্রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্চাশটিরও বেশি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন একে একে লম্বার্ড, স্যাক্সন, ফ্রিজিয়ান, ডেন, স্লাভ, গ্যাস্কন, বাইজানসিও, ব্রিটন প্রভৃতি বহু জাতিই তাঁর অবিরাম আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়েছিল। স্পেনের কিয়দংশও তিনি জয় করেন। সুতরাং চার্লস যে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর সাম্রাজ্য উত্তরে আইডার থেকে এব্রো, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও বেনিভেন্টো, পশ্চিমে আটলান্টিক থেকে পূর্বে ড্যানিয়ুব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য জয় করেই চার্লস ক্ষান্ত হননি। বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে প্রজাদের রক্ষা এবং অধিকৃত স্থানগুলোতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার প্রভৃতি কার্যও তিনি সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করেন।

চার্লস একজন অত্যন্ত উঁচুমানের সংগঠক ও প্রতিভাবান শাসক ছিলেন। চার্লসের কেন্দ্রীভূত শাসনে সম্রাট সকল ক্ষমতার উৎস হলেও তাঁর শাসন ছিল প্রজাদরদী ও হিতকর। চার্লস ব্যক্তিগতভাবে খ্রীষ্টধর্মের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শাসক হিসাবে পৃথিবীতে তিনি ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট কাজই করছেন।

তাই তাঁর শাসনব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট। পোপ তৃতীয় লিওর হাত থেকে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজমুকুট গ্রহণের মাধ্যমে চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বাস্তবিকই এটা ছিল নানা কারণে মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর থেকে পোপের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব সম্রাটের উপর এসে পড়ে এবং ইউরোপ পুনরায় রোমসাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিশালী সংগঠন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের স্রষ্টা হিসাবে চার্লস ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। অভিষেক অনুষ্ঠানের পর থেকে চার্লস নিজেকে চার্চের সর্বেসর্বা বলে ভাবতে শুরু করেন। চার্চের আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে তিনি তাঁর রাজকীয় ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে থাকেন। পোপকেও তিনি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতেন। ফলে পরবর্তীকালে চার্চ ও শাসকের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে এবং মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে বহু তিক্ততার সৃষ্টি হয়।

চার্লস বা শার্লেমান একজন বিদ্যানুরাগী সম্রাট ছিলেন। তিনি লিখতে জানতেন না, কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই পড়তে ভালবাসতেন। তিনি শিল্প-সাহিত্যের যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন এবং জ্ঞানী-গুণীর সমাদর করতেন। সমসাময়িক যুগের বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন। এঁদের মধ্যে কবি ও শিক্ষাবিদ্ অ্যালকুইন ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত। এইনহার্ড লিখিত জীবনীগ্রন্থ থেকে চার্লসের ব্যক্তিগত জীবন ও তাঁর রাজত্বকালের অনেক কথাই জানা সম্ভব হয়েছে। মূলতঃ শার্লেমানের ঐকান্তিক প্রয়াসের ফলেই 'ক্যারোলিঞ্জিয় রেনেসাঁ'র পথ প্রস্তুত হয়। শার্লেমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু শিক্ষাব্রতী, পণ্ডিত ব্যক্তিকে তাঁর সাম্রাজ্যে নিয়ে আসেন।

নির্মাতা হিসাবেও শার্লেমান যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি আকেন, নাইমওয়েগেন ইংলেহেইম প্রভৃতি স্থানে সুবৃহৎ গীর্জা ও প্রাসাদোপম অট্টালিকাসমূহ এবং মেইনজ-এ এক দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করেন। তিনি একটি খাল খনন ক'রে রাইন ও ড্যানিয়ুবের মধ্যে যুক্ত করে দেন। রোমের গৌরবময় যুগের অবসানের পর থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তিনি ছিলেন ইউরোপের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরেরও অধিককাল প্রবল পরাক্রম ও যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করার পর ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস দি গ্রেট বা শার্লেমান পরলোকগমন করেন।

চার্লস দি সিম্পল

[শাসনকাল ৮৯৮-৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন ক্যারোলিঞ্জিয় বংশের একজন রাজা। পূর্ববর্তী শাসক ওডোর মৃত্যুর পর ৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস দি সিম্পল ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চার্লস দি সিম্পল শাসক হিসাবে মোটামুটি যোগ্যতাসম্পন্নই ছিলেন বলা চলে। কিন্তু অভিজাতগোষ্ঠীর উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা তাঁকে দুর্বল করে ফেলেছিল। বাস্তবিকই অভিজাত গোষ্ঠীর কথামত চলতে গিয়ে চার্লসকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। আবার প্রবল প্রভাবশালী এই গোষ্ঠীর সমর্থনের জোরে সিংহাসন লাভ করায় অভিজাতদের চটাতে তিনি সাহস পেতেন না। তাঁর হয়ত ভয় ছিল, অভিজাতরা বিপক্ষে গেলে তাঁর পক্ষে সিংহাসন বজায় রাখা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। চার্লসের রাজত্বকালে দুর্ধর্ষ নর্সম্যান বা ভাইকিংস জাতি ক্রমাগত ফ্রান্স আক্রমণ করতে থাকে এবং সেইন নদীর তীরবর্তী বেশ কিছু অঞ্চল তারা অধিকার করে নেয়। চার্লস তাদের আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে কূটবুদ্ধির আশ্রয় নেন। ৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আক্রমণকারী নর্সম্যানদের নেতা রোলোর সাথে নিজ কন্যার বিবাহ দানের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব রোলো কর্তৃক গৃহীত হয়। বিবাহের পর নর্সম্যান নেতা সেইন নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে সস্ত্রীক স্বাধীনভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। এটা ছিল নিঃসন্দেহে চার্লসের এক কূটনৈতিক সাফল্য। এরপর বহু নর্সম্যান ফ্রান্সে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং তাদের বসতিকেন্দ্রের নাম হয় নর্মাণ্ডি। ৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এক আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে চার্লস দি সিম্পল সিংহাসনচ্যুত হন। এই ঘটনার ছয় বছর পর ৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়।

চার্লস মার্টেল

[শাসনকাল ৭১৪-৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ]

ফ্রাঙ্কিস বংশের একজন বিশিষ্ট রাজা। ৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে শাসন-কার্য পরিচালনা করেন। তিনি এক সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে সিংহাসনে বসেন এবং অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তা ও যোগ্যতাবলে সকল প্রতিকূলতা জয় করতে সক্ষম হন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি এক সুদক্ষ সামরিক বাহিনীর অধীশ্বর হন। ৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউস্ট্রিয়া আক্রমণ করে নিউস্ট্রিয়দের প্যারিস পর্যন্ত বিতাড়িত করেন। অতঃপর তিনি তাঁর বিমাতাকে কোলন নামক স্থান তাঁর কাছে সমর্পণে বাধ্য করেন। একের পর

এক সাফল্য অর্জন করে তিনি পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে চার্লস ব্যাটবোল্ডকে পশ্চিম ফ্রিজল্যান্ড সমর্পণে বাধ্য করেন এবং সাক্সনদের বিতাড়িত করে নিউস্ট্রিয়ার দিকে অগ্রসর হন। রাজা চিলপেরিক পরাজিত হলে নিউস্ট্রিয়া চার্লসের অধীনে আসে। চার্লসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল স্পেনের মুসলমানদের আক্রমণ থেকে ফ্রাঙ্কিস সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা। তিনি ক্রমাগত মুসলমান অভিযান সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত ক'রে মার্টেল (হ্যামার বা হাতুড়ি) উপাধি লাভ করেন। বাস্তবিকই চার্লস মার্টেল মুসলিমদের হাত থেকে খৃষ্টীয় জগতের ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর সামরিক সাফল্যে একদিকে যেমন খ্রীষ্টীয় জগতে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়, অপরদিকে তেমনি আবার মুসলিম জগতে এই সাফল্য ত্রাসের সঞ্চার করে। সেই সময় চার্লস মার্টেল না থাকলে ইসলামের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক পশ্চিমী সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। লম্বার্ডরা পোপের রাজ্য রোম আক্রমণ করলে পোপ তৃতীয় গ্রেগরী চার্লসের সাহায্য চান। চার্লস একাধিকবার রোম ও পোপের উদ্ধারকর্তার ভূমিকা নেন।

সাতাশ বছর রাজত্ব করার পর ৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস মার্টেলের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

চার্লস মেটকাফ

[শাসনকাল ১৮৩৫-১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ]

ব্রিটিশ ভারতে উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের পরবর্তী অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। স্যার চার্লস মেটকাফ উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং স্বল্পস্থায়ী শাসনকালের মধ্যেই জনদরদী শাসক হিসাবে তিনি বেশ সুনামের অধিকারী হন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ অ্যাডাম এক বিশেষ আইন জারি করে সংবাদপত্রের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার খর্ব করার পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস মেটকাফ এই আইন প্রত্যাহার করে নেন। ভারতবাসী এই সংবাদে খুবই প্রীত হয়ে তাঁকে ভারতীয় সংবাদপত্রের মুক্তিদাতা' বলে অভিনন্দন জানায়। কিন্তু চার্লস মেটকাফের উদারনীতি ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষকে রুষ্ট করে। ফলে মেটকাফ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে তিনি জামাইকা ও কানাডার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।



চিয়াং কাই শেক

[শাসনকাল ১৯২৫-১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ]

বর্তমান শতাব্দীর চীনের একজন বিখ্যাত জেনারেল ও রাজনীতিবিদ্। মার্শাল চিয়াং কাই শেক ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং সুদীর্ঘকাল চীনা রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর চিয়াং-কাই শেকের উপর প্রজাতান্ত্রিক চীন সরকারের কর্তৃত্বভার ন্যস্ত হয়। এই সময় চীনে কম্যুনিস্টরা বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং কুয়োমিংটাং দলের কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা করতে থাকে। ফলে চিয়াং-এর নেতৃত্বাধীন কুয়োমিংটাং সরকারের সাথে কম্যুনিস্টদের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। চিয়াং কম্যুনিস্টদের দমন করার জন্য তাঁর সেনাবাহিনীর সাহায্যে তীব্র অত্যাচার চালান এবং বহু বিপ্লবীকে হত্যা করেন। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপ ও অগ্রগতি রোধ করতে তিনি ব্যর্থ হন।

জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উভয় দল পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশরক্ষায় সচেষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চীন মিত্রপক্ষকে সমর্থন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেলে দুই দল পুনরায় তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বাধীন কম্যুনিস্টরা শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে চিয়াং-এর কুয়োমিংটাং বাহিনীকে পরাস্ত ক'রে চীনে এক নতুন বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করে যা 'পিপল্স রিপাবলিক অব্ চায়না' (গণপ্রজাতন্ত্রী চীন) নামে পরিচিত। চিয়াং কাই শেক বাধ্য হয়ে ফরমোজা দ্বীপে (বর্তমান তাইওয়ান) আশ্রয় নেন (১৯৪৫) এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের সাহায্যে সেখানকার সরকার পরিচালনা করতে থাকেন। চিয়াং-এর নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ইউ. এন ও তে চীনের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে কুয়োমিংটাং সরকারের শাসন ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আমেরিকার একজন বিশ্বস্ত অনুচর চিয়াং কাই শেক ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চিয়েন লুঙ

[শাসনকাল ১৭৩৬-১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ]

চীনের মাঞ্চুবংশের একজন বিশিষ্ট সম্রাট ছিলেন। তিনি প্রায় ষাট বছর চীনের সম্রাট হিসাবে রাজকার্য পরিচালনা করেন। চিয়েন লুঙ একজন শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি যে শুধু শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাই নয়, তিনি নিজেও ছিলেন একজন শিল্পী ও কবি। তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনের উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চিয়েন লুঙের শাসনের অবসান ঘটার পর থেকে সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে মাঞ্চুবংশের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে।

চিলপেরিক

[শাসনকাল ৫৬১-৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দ]

মেরোভিঞ্জিয় বংশের একজন ফ্রাঙ্কস রাজা। চিলপেরিক ৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন এবং ৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত হলেও তাঁর হৃদয় ছিল নির্মম। তিনি উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং প্রচলিত আইন ও রাজনীতিকে উপেক্ষা করে নানা প্রকার নিয়ম-কানুনের প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকার সূত্রে জমির মালিকানা লাভের সুযোগ দেন যা ছিল স্যালিক আইনের বিরোধী। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তিনি প্রচলিত ধারাকে অস্বীকার করে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং পুরনো তত্ত্বসমূহ বাতিল করে নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। তিনি ল্যাটিন ভাষায় বুৎপত্তিলাভ করেন এবং বেশ কিছু স্তোত্র রচনা করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। আইন অমান্যকারীর শাস্তি ছিল অন্ধত্ব। মেরোভিঞ্জিয়দের নীতিবোধ ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। এমনকি সেই মেরোভিঞ্জিয়দের চোখেও তিনি কুখ্যাত বলে পরিগণিত হতেন। চিলপেরিক ছিলেন চরিত্রহীন, লোভী, পেটুক। অপর একজন রমণীকে বিবাহ করার জন্য তিনি তাঁর প্রথমাস্ত্রীকে হত্যা করতে দ্বিধা করেননি। তিন তাঁর উপপত্নী ফ্রিডেগণ্ডের প্রভাবাধীন ছিলেন। ৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চিলপেরিককে হত্যা করা হয়।

চু উয়ান চ্যাঙ

[শাসনকাল ১৩৬৮-১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ]

চীনের বিখ্যাত মিঙ বংশের প্রতিষ্ঠাতা চু উয়ান চ্যাঙ ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চল্লিশ বছর বয়সে হুং-য়ু উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। চু উয়ান

চ্যাঙ একজন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ তিরিশ বছরের রাজত্বকাল চীনের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। চু সিংহাসনে বসে চীনে এক দৃঢ় ও সুশৃঙ্খল কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন এবং নানাবিধ শাসন সংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ঘটান। ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে চু উয়ান তাঁর দৌহিত্র হুই-তি'কে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।



চেঙ্গিস খান

[শাসনকাল ১২০৫-১২২৬ খ্রীষ্টাব্দ]

দুর্ধর্ষ মোঙ্গলজাতের দুর্ধর্ষ নেতা ছিলেন চেঙ্গিস খান। মোঙ্গলদের প্রথম দিককার ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এদের দুর্ধর্ষ ক্রিয়াকলাপ শুরু হয় এবং চেঙ্গিস খানের জন্মের অল্পকাল পর থেকেই মোঙ্গলরা অজেয় আর অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। চেঙ্গিসের জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ ১১৫৪ থেকে ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময় তাঁর জন্ম হয়েছিল ওনান নদীর নিকটবর্তী দিলাম বোল্‌দাক নামক স্থানে। তাঁর আসল নাম ছিল তেমুজিন। পরবর্তীকালে তিনি চেঙ্গিস নামে বিশ্ববাসীর পরিচিতি লাভ করেন। চেঙ্গিসের মধ্যে অল্পবয়স থেকেই সংগঠনশক্তি ও নেতৃত্বের ক্ষমতা দেখা যায় এবং ধাপে ধাপে তিনি ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন। মধ্য বয়সে এসে ১২০৫ সালে তিনি 'খান' উপাধিতে ভূষিত হন। মোঙ্গলদের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের খুব অল্প কালের মধ্যেই এই দুর্দান্ত প্রবল পরাক্রমশালী পুরুষ ঝড়ের গতিতে অভিযান চালিয়ে একে একে জয় করেন চীনের বহু অঞ্চল, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান রাজ্যগুলো। চেঙ্গিস ককেসাস পর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ রাশিয়ায়ও অভিযান চালান এবং ক্রিমিয়া অঞ্চল নিজ কুক্ষিগত করেন। দুনিয়া কাঁপানো 'কুখ্যাত' আর 'অভিশপ্ত' চেঙ্গিস খানের সবচেয়ে বড় অবদান হল আলসে বর্বর একটা জাতকে অল্প সময়ের মধ্যে যোদ্ধৃজাতিতে পরিণত করা। এই বিরাট সাম্রাজ্যজয়ী পুরুষ ও আইন-প্রণেতা বিচ্ছিন্ন মোঙ্গলদের

শক্তি, সাহস, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণাবলীর সুযোগ নিয়ে তাঁর যোগ্য নেতৃত্ববলে তাদের পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে চেঙ্গিসের আমল থেকে যাযাবর মোঙ্গলদের মধ্যে সামাজিক জীবনের সুসংবন্ধ বিকাশ ঘটে। ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিস পরলোকগমন করেন।

চেমসফোর্ড

[শাসনকাল ১৯১৬-১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে তিনি ১৯১৬ থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট পাঁচ বছর এই পদে আসীন ছিলেন। একজন প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও শাসক চেমসফোর্ড ছিলেন ইংলণ্ডের অভিজাত বংশের সন্তান। ভারতবর্ষে আসার পূর্বে তিনি বেশ কয়েকটি উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ১৯০৫ থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কুইন্সল্যাণ্ডের এবং ১৯০৯ থেকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌-এর গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে চেমসফোর্ডের শাসনকাল মূলতঃ ভারতসচিব মণ্টাগুর সহযোগিতায় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বৈতশাসনের ভিত্তিতে রচিত 'ভারত শাসন আইন' এর জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে।

চৈত সিংহ

[শাসনকাল ১৭৭০-১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বারাণসীর রাজা ছিলেন। চৈৎ সিংহ পিতা বলবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সেই বছর বাংলায় এক ভয়াবহ মন্বন্তর ঘটেছিল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন ইংরাজ গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানীর অর্থাভাব হেতু তাঁর কাছ থেকে অতিরিক্ত কর দাবি করেন। রাজা তাঁর অক্ষমতার কথা জানালে হেস্টিংসের আদেশে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর সমর্থনে এক বিদ্রোহ দেখা দিলে রাজা সেই সুযোগে পলায়ন করেন। হেস্টিংস কর্তৃক প্রেরিত কোম্পানীর ফৌজ অবিলম্বে বারাণসী অধিকার ক'রে নেয় এবং চৈৎ সিংহের বাহিনীকে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত লতিফপুর নামক স্থানে পরাজিত করে। রাজা চৈৎ সিংহ এই লতিফপুরেই আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ইংরাজবাহিনী মেজর পপহ্যামের নেতৃত্বে তাঁর বিজয়গড় দুর্গ অবরোধ করে তাঁর পরিবারের উপর অত্যাচার ও ব্যাপক লুঠতরাজ চালায়।

রাজাকে তাঁর পদাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং রাজার এক ভাগিনেয়কে তাঁর

পদে স্থাপন করা হয়। চৈৎ সিংহের বিদ্রোহে সহায়তা করার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস অতঃপর অযোধ্যার নবাবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। রাজা চৈৎ সিংহ গোয়ালিয়রে আশ্রয় নেন এবং পরবর্তী ২৯ বছর সেখানেই অতিবাহিত করেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ তিনি পরলোকগমন করেন।

জন

[শাসনকাল ১১৯৯-১২১৬ খ্রীষ্টাব্দ]

জন ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় হেনরীর সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। তাঁর চরিত্র ছিল মন্দ এবং শাসক হিসাবেও তিনি আদৌ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি ছিলেন বুদ্ধিহীন ও অপরিণামদর্শী। পিতার মৃত্যুর জন্য তাঁর ষড়যন্ত্র দায়ী ছিল বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। জনের আমলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ইংলন্ডের ধর্মাধিষ্ঠানের অধিকার নিয়ে পোপের সাথে বিরোধ। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট ছিলেন জনের সমসাময়িক। পোপের সাথে জনের বিরোধ চরমে উঠলে পোপ তাঁকে খ্রীষ্টধর্ম বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেন এবং সিংহাসনচ্যুত করার ভীতি প্রদর্শন করেন। জন তাঁর আচার-আচরণে ও হঠকারী কার্যকলাপের দ্বারা প্রজাসাধারণকে রীতিমত রুষ্ট করে তুলেছিলেন। সাধারণ প্রজা থেকে শুরু করে অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করলে বাধ্য হয়ে জনকে পোপের কাছে নতিস্বীকার করতে হয়। এইভাবে ইংলণ্ডে পোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সূচনা হল। এই ঘটনার পর তিনি ফ্রান্স আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। জনকে ইংলণ্ডের ইতিহাসের একজন ব্যর্থ রাজা বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

জয়চন্দ্র

[শাসনকাল ১১৭০-১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দ]

জয়চন্দ্র প্রাচীন গাড়োয়াল বংশের একজন বিশিষ্ট রাজা ছিলেন। তিনি ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে পিতা বিজয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। জয়চন্দ্র শক্তিমান শাসক ছিলেন। সেইসময় পূর্বভারতে বাংলার সেনরাজা এবং পশ্চিমভারতে চান্দেল্ল বংশ তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল। জয়চন্দ্রের কৃতিত্ব হল, এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি নিজ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং পূর্বদিকে তাঁর সাম্রাজ্য গয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। তবে তা দীর্ঘকাল নিয়ন্ত্রণে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পশ্চিমদিকে জয়চন্দ্র চৌহান বংশের তৃতীয় পৃথিবরাজের সঙ্গে এক তীব্র

সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। শক্তিশালী পৃথিবরাজ ছিলেন তাঁর প্রধান শত্রু। এই সময় আফগানিস্তান থেকে মুসলমান শাসক মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষ অভিযানে বার হয়ে পৃথিবরাজ চৌহানের সাথে এক তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। এই সংবাদ জয়চন্দ্রকে উদ্বিগ্ন করার পরিবর্তে উৎসাহিত করে। তিনি ঘোরীর আক্রমণের পরিণতি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন প্রধান শত্রু পরাজিত হলে সমগ্র উত্তরভারতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর হাতে পৃথিবরাজ পরাজিত ও নিহত হন। অতঃপর ঘোরী কনৌজের দিকে অগ্রসর হন এবং ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। জয়চন্দ্রের মৃত্যুর ফলে গাড়োয়াল শক্তির পতন ঘনিয়ে আসে। জয়চন্দ্র ও পৃথিবরাজের পারস্পরিক রেষারেষি ও শত্রুতাকে কেন্দ্র করে একাধিক কাহিনী প্রচলিত আছে, যেগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা যথেষ্ট সন্ধিহান।

জয়নুল আবেদিন

[শাসনকাল ১৪২০-১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দ]

কাশ্মীরের একজন খ্যাতিমান শাসক। তিনি ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের রাজা হন এবং ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকাল নিঃসন্দেহে মধ্যযুগের কাশ্মীরের ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়।

জয়নুল ছিলেন একজন প্রজাদরদী, উদারহৃদয় ও বিদ্যোৎসাহী শাসক। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় কাশ্মীরের সার্বিক উন্নতি ঘটে, দেশে চুরি-ডাকাতির পরিমাণ অনেক কমে যায় এবং জনগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। তিনি দ্রব্যমূল্যের দর নির্দিষ্ট করে দেন, জনগণের করের বোঝা হ্রাস করেন এবং মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। তিনি ধর্মীয় ব্যাপারেও যথেষ্ট সহিষ্ণু ও উদার ছিলেন। তিনি হিন্দী পণ্ডিতদের খুবই মর্যাদাদান করেন এবং পিতার আমলে বিতাড়িত ব্রাহ্মণদের পুনরায় ফিরিয়ে আনেন। তিনি ফার্সী, হিন্দী, তিব্বতী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়া ছাড়াও সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকলার অনুরাগী ছিলেন। তাঁর আনুকূল্যে মহাভারত ও রাজতরঙ্গিণী সংস্কৃত থেকে ফার্সী ভাষায় এবং বেশ কিছু আরবী ও পারসী বই হিন্দী ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁর এই সমস্ত বহুমুখী গুণের জন্য তাঁকে 'কাশ্মীরের আকবর' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

দীর্ঘ গৌরবময় রাজত্বের পর ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে জয়নুল আবেদিন পরলোকগমন করেন।

জয়পীড় বিনয়াদিত্য

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী]

সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। জয়পীড় বিনয়াদিত্য পিতামহ রাজা ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পর কাশ্মীরের সিংহাসনে বসেন। তিনি গৌড়, কনৌজের রাজাদের পরাজিত করে সাম্রাজ্য সীমা পূর্বাপেক্ষা আরও বিস্তৃত করেন। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং তার রাজসভা ক্ষীরস্বামী, উদ্ভট, দামোদর গুপ্ত, বামন প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলীর দ্বারা পূর্ণ থাকত। শোনা যায় উৎপীড়ন মূলক রাজস্ব আদায় নীতি অবলম্বন করায় তিনি জনপ্রিয়তা হারান। সম্ভবতঃ ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ জয়পীড় বিনয়াদিত্যের রাজত্বের অবসান ঘটে।

জয়বর্মন দ্বিতীয়

[শাসনকাল ৮০২ ৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ]

খ্রীষ্টীয় নবম শতকে কম্বোজ দেশের রাজা ছিলেন। দ্বিতীয় জয়বর্মন একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন এবং তাঁর রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। তিনি ৮০২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং ৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল রাজকার্য পরিচালনা করেন। তিনি অঙ্কোর নামক স্থানে কম্বোজের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন এবং স্থানটি অল্পকালের মধ্যেই শিল্প সংস্কৃতির এক অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত হয়। ৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় জয়বর্মন মৃত্যুমুখে পতিত হন।



জর্জ প্রথম

[শাসনকাল ১৭১৪-১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। রাণী অ্যানের মৃত্যুর পর জার্মানীর হ্যানোভার বংশের প্রথম জর্জ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম জর্জের রাজত্বকাল ক্যাবিনেট প্রথার সূচনাকাল হিসাবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথম জর্জ ইংরেজী ভাষা বুঝতেন না এবং শাসনভার কার্যত হুইগ দলের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি ভাষা না বোঝার দরুণ মন্ত্রিসভার অধিবেশনে যোগদান করা থেকে প্রায়শই বিরত থাকতেন। ক্রমশঃ মন্ত্রিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী স্যার রবার্ট

ওয়ালপোল শাসনকার্য পরিচালনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ওয়ালপোলকে ইংলন্ডের ইতিহাসের প্রথম 'আধুনিক' প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রথম জর্জ ৫৪ বছর বয়সে ইংলন্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তের বছর রাজত্ব করার পর ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।



জর্জ দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৭২৭-১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলন্ডের রাজা ছিলেন। দ্বিতীয় জর্জ জার্মানীর হ্যানোভার বংশোদ্ভূত ছিলেন। পিতা প্রথম জর্জের মৃত্যুর পর ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলন্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিরিশ বছরেরও অধিককাল রাজকার্য পরিচালনা করেন। তিনিও পিতার ন্যায় ইংরেজী ভাষা না বোঝার দরুন মন্ত্রিসভার অধিবেশনগুলোতে অনুপস্থিত থাকতেন। তাঁর রাজত্বকালের প্রথম পনের বছর হুইগ দলের নেতা রবার্ট ওয়ালপোলই প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় উভয়ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার ছিলেন বলা চলে। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ালপোলের পদত্যাগের পর কার্টারেট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই সময় ইংলন্ড অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সূত্রে যোগদান করে। দ্বিতীয় জর্জ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে ডেটিঞ্জেনের যুদ্ধে ফরাসী বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। ইউরোপে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভারতের কর্ণাট নামক স্থানে এবং আমেরিকায় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এই-লা-স্যাপেলের সন্ধির মাধ্যমে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধের উপর যবনিকা পড়ে। এই ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের মূল কারণ ছিল বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ। এই-লা-স্যাপেলের চুক্তি এই সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় কয়েক বছরের মধ্যেই ইউরোপ দুই পরস্পর বিবদমান যুদ্ধশিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ ঘটে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কূটনৈতিক বিপ্লব এবং তার পরই শুরু হয় সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইংলন্ড সব ফ্রন্টেই জয়লাভ করে। এই যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় দ্বিতীয় জর্জ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।



জর্জ তৃতীয়

[শাসনকাল ১৭৬০-১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ]

ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। তৃতীয় জর্জ ছিলেন জার্মানীর হ্যানোভার বংশোদ্ভূত। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় জর্জের পৌত্র। দ্বিতীয় জর্জের পুত্র ফ্রেডারিক অকালে প্রাণত্যাগ করায় তিনি দ্বিতীয় জর্জের মৃত্যুর পর ১৭৬০ খ্রীঃ ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং সুদীর্ঘ ষাট বছর ধরে রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তৃতীয় জর্জ জাতিতে জার্মান হলেও ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এব ছেলেবেলা থেকে ইংলণ্ডের পরিবেশে মানুষ হবার দরুণ কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, সাজ-পোশাক সবকিছুতেই একজন ইংরাজ হয়ে উঠে-ছিলেন। তিনি ছিলেন জেদী, সংকীর্ণমনা এবং অত্যন্ত ক্ষমতালিপ্সু। তিনি সব ক্ষমতা নিজের কুক্ষিগত করার প্রয়াসী ছিলেন। তৃতীয় জর্জ বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও ইংলণ্ডকে নিজের মাতৃভূমি বলে মনে করতেন। সিংহাসনে বসেই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জের আমলে উভয় রাজার ঔদাসীন্য ও দুর্বলতার সুযোগে হুইগ দল শাসন ক্ষমতা নিজেদের অনেকখানি হস্তগত করে নিয়েছিল। তৃতীয় জর্জ রাজতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটাবার চেষ্টা করেন এবং হুইগদের ক্ষমতা হ্রাসের জন্য দপ্তর বণ্টন, রাজকর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্য নিজহস্তে নেন। এইভাবে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হাউস অব্ কমন্সে তৃতীয় জর্জের সমর্থকদের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। টোরিদলের মধ্য থেকে একদল অনুচরকে নিয়ে রাজা একটি দল গঠন করলেন যারা 'কিংস ফ্রেণ্ডস' নামে অভিহিত হত। নিজ সমর্থক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে তৃতীয় জর্জ সদাই প্রস্তুত ছিলেন। তৃতীয় জর্জ সিংহাসনে আরোহণ করার দুবছরের মধ্যেই পিট ও নিউক্যাসল পদত্যাগ করায় ইংলণ্ডীয় রাজনীতিতে হুইগ দলের সুদীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী কালের একচেটিয়া প্রাধান্যের অবসান হয়। তৃতীয় জর্জ একবার নিজের ক্ষমতাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রাক্তন গৃহশিক্ষক লর্ড বুটকে তাঁর প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বুটের প্রচেষ্টায় প্যারিসের শান্তি চুক্তির মাধ্যমে সপ্ত-বর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটে। বুটের পদত্যাগের পর গ্রেনভিল মন্ত্রিসভা ১৭৬৫ খ্রীঃ 'স্ট্যাম্প' আইন প্রবর্তন করলে আমেরিকার ইংরাজ উপনিবেশগুলো বিদ্রোহী হয়ে

ওঠে। তৃতীয় জর্জের দীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে বহুবার মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটেছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংলণ্ডের পরাজয় ও নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জয়লাভের ফলস্বরূপ ভিয়েনাচুক্তি সম্পাদন ছিল তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালের দুই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এছাড়া এই সময় ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যথেষ্ট প্রসারতা লাভ করেছিল। ১৮২০ খৃঃ তৃতীয় জর্জের জীবনাবসান ঘটে।

জর্জ চতুর্থ

[শাসনকাল ১৮২০-১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংলণ্ডের একজন রাজা। তিনি জার্মানীর হ্যানোভার বংশোদ্ভূত ছিলেন। পিতা তৃতীয় জর্জের মৃত্যুর পর ১৮২০ খৃীষ্টাব্দে চতুর্থ জর্জ পিতার স্থানাভিষিক্ত হন এবং পরবর্তী দশ বছর রাজকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পান। তিনি ছিলেন স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী, দুর্নীতিগ্রস্ত, ও জেদী প্রকৃতির মানুষ। তিনি তাঁর রাণী ক্যারোলিনের সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ আইন প্রণয়নের চেষ্টা করলে জনগণের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর করতে পারেননি। চতুর্থ জর্জের আমলে বেশ কয়েকবার মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৮২৯ খৃীষ্টাব্দে ডানিয়েল ও কোনেলের নেতৃত্বে আয়ারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক জনগণ ধর্মাচরণের স্বাধীনতার দাবিতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে বাধ্য হয়ে ওয়েলিংটন মন্ত্রিসভাকে ইংলণ্ড ও' আয়ারল্যাণ্ডের ক্যাথলিকদের জন্য 'ক্যাথলিক মুক্তি আইন' পাস করতে হয়। ১৮৩০ খৃীষ্টব্দের জুলাই মাসে ফ্রান্সে এক বিপ্লব শুরু হলে এই বিপ্লবের ঢেউ ইউরোপের আরও অনেক দেশের মত ইংলণ্ডেও এসে পৌঁছয়। এক শ্রেণীর জনগণ পার্লামেণ্টের সংস্কার সাধনের দাবি করে। ঐ বছরেই চতুর্থ জর্জ মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৮৩০)।



জর্জ পঞ্চম

[শাসনকাল ১৯১০-১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। পঞ্চম জর্জ পিতা সপ্তম এডোয়ার্ডের মৃত্যুর পর ১৯১০ খৃীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং

সুদীর্ঘ ২৫ বছরের অধিককাল রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ইংলণ্ড তথা সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসের এক তীব্র সংকটকাল। তাঁর সিংহাসনে বসার কয়েক বছরের মধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও তার মিত্রবাহিনী জয়লাভ করলেও ইউরোপ তথা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত ইংলণ্ডেও এক ভয়াবহ পরিস্থিতির আবির্ভাব হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত প্রথম মহাযুদ্ধ চলতে থাকে। এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আর্থিক ও বাণিজ্যিক সংকট, বেকারত্ব প্রভৃতি তীব্রভাবে ইংলণ্ডের জনজীবনকে গ্রাস করে। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জীবনেও এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী লিবারেল দলের প্রভাব এই সময় থেকে দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং লেবার পার্টি বা শ্রমিকদলের অভ্যুদয় ঘটে। এইদল পরবর্তীকালে ইংলণ্ডীয় রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এছাড়া পঞ্চম জর্জের আমলে ল্যয়েড জর্জ মন্ত্রিসভা ২১ বছর বয়স্ক পুরুষের ভোটাধিকারের দাবিকে আইনগত স্বীকৃতি জানায়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম জর্জ পরলোক গমন করেন।

জারাক্সেস প্রথম

[শাসনকাল ৪৮৬-৪৬৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন পারস্যের একজন শক্তিমান শাসক ছিলেন। পিতা প্রথম দারায়ুসের মৃত্যুর পর জারাক্সেস পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর পিতার সময়ে পারস্যের সাথে গ্রীকদের যুদ্ধ চলছিল। রাজা হয়ে তিনি নবোদ্যমে সেই যুদ্ধ শুরু করেন। এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে জারাক্সেস ৪৮০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে হেলেসপন্ট অতিক্রম করেন এবং থার্মোপাইলে নামক স্থানে তাঁর বাহিনীর অগ্রগতি ব্যাহত হলেও এথেন্স নগরী ধ্বংস করতে সমর্থ হন। স্যালামিসের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তাঁর নৌবাহিনী গ্রীকদের হাতে পরাজয় স্বীকার করে। তিনি তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনীর একাংশ নিয়ে পারস্যে ফিরে আসেন। ৪৭৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে প্লেটিয়ার যুদ্ধে পারসিক বাহিনী পুনরায় গ্রীকদের কাছে পরাজিত হয়। এই ঘটনার অল্পদিনের মধ্যেই এক তীব্র ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জারাক্সেসকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয় (৪৬৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)।

জারাক্সেস দ্বিতীয়

[শাসনকাল ৪২৪-৪২৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

বিখ্যাত পারসীক সম্রাট প্রথম দারায়ুসের দৌহিত্র। দ্বিতীয় জারাক্সেস ৪২৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পারস্যের রাজা হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি বেশিদিন রাজত্ব করবার সুযোগ পাননি। মাত্র ৪৫ দিন রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকার পর আততায়ী হস্তে দ্বিতীয় জারাক্সেসের জীবনাবসান হয়।

জালালউদ্দিন খলজী

[শাসনকাল ১২৯০-১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দ]

মুইজুদ্দিন কাইকোবাদ ছিলেন দাস বংশের শেষ সুলতান। শাসনকার্য পরিচালনা করার কোন যোগ্যতা তাঁর ছিল না। বয়সে তরুণ এই ব্যক্তি অধিকাংশ সময় বিলাস ব্যসন ও হালকা আমোদ-প্রমোদে মেতে থেকে দিন কাটাতেন এবং রাজকার্য বিশেষ কিছুই দেখতেন না। স্বভাবতঃই গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে চরম বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং এই সুযোগে দিল্লীদরবারের তুর্কী গোষ্ঠী ও খলজী গোষ্ঠীর ওমরাহদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত খলজী গোষ্ঠীর নেতা মালিক জালালউদ্দিন ফিরুজ বিরোধীপক্ষকে পরাস্ত করেন এবং দুর্বল অসুস্থ কায়কোবাদকে হত্যা করে দিল্লীর মসনদ দখল করেন। ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে নতুন খলজী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৭০ বছর। দুর্বলচিত্ত ও উদার প্রকৃতির মানুষ জালালউদ্দিন ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তিনি মোট ৬ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর এই স্বল্পকাল স্থায়ী রাজত্বের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা ঘটে। কিন্তু একমাত্র সিদি মৌলা নামক একজন ভণ্ড দরবেশকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ছাড়া অপর সকল বিদ্রোহীকে তিনি ক্ষমা করেন। তাঁর রণথম্ভোর অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তাঁর আমলে যে মোঙ্গল আক্রমণ হয়েছিল তা প্রতিহত করতে অবশ্য তিনি সফল হন। কিন্তু এই ধরনের শান্তি-প্রিয় সুলতানের মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছিল। জালালউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন তাঁর বিরুদ্ধে এক নিপুণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন।

জালালউদ্দিন ফথ

[শাসনকাল ১৪৮১-১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ]

জালালউদ্দিন ফথ ছিলেন বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান। ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববর্তী শাসক শামসউদ্দিন ইউসুফের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে বসেন এবং ছয় বছর রাজত্ব করার পর ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। জালাল-উদ্দিনের আসল নাম ছিল হুসেন। তিনি নতুন নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমসাময়িক লেখকদের লেখা থেকে জানা যায় ফথ ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও উদার প্রকৃতির সুলতান। তিনি অতীত ঐতিহ্য ও পুরনো রীতিনীতিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং পূর্ববর্তী শাসকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শাসনকার্য পরিচালনা

করতেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রজাগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করত। কিন্তু এই সময় দরবারের হাবসী খোজারা এক বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে। পূর্ববর্তী শাসকদ্বয় বরবক ও ইউসুফের ক্রমাগত পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে তারা অনেক উচ্চপদও অধিকার করে। ক্রমশঃ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। ক্ষমতা তাদেরকে উদ্ধত ও হিংস্র করে তোলে। স্বভাবতঃই ফথ তাদের শক্তিহ্রাসে মনোযোগী হন। ফিরিস্তার মতে চরম অবাধ্য ও বেপরোয়া ব্যক্তিদের সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হয়। বিক্ষুব্ধ হাবসীগণ রাজপ্রাসাদের প্রধান খোজা শাহজাদাকে হাত করে। এই শাহজাদা ছিলেন প্রাসাদ রক্ষীবাহিনী বা পাইকদের নেতা। সুলতান জালালউদ্দিনের একান্ত অনুগত হাবসী সেনানায়ক আমীর-উল্-উমরা মালিক আন্দিল একটি সমরাভিযান উপলক্ষে দেশের বাইরে গেলে সেই সুযোগে শাহজাদা ফথকে ষড়যন্ত্র করে গোপনে হত্যা করেন। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে ফথের মৃত্যুর সাথে সাথে বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের উপর চিরকালের মত যবনিকা নেমে আসে।

জাস্টিন দ্বিতীয়

[শাসনকাল ৫৬৫-৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দ]

বাইজেনটাইন (বাইজেনসিও) সাম্রাজ্যের একজন রাজা। তিনি বিখ্যাত সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জাস্টিন নামগ্রহণ ক'রে সিংহাসনে বসেন। সম্পর্কে তিনি ছিলেন জাস্টিনিয়ানের ভ্রাতা। উত্তরাধিকার সূত্রে জাস্টিনিয়ান প্রতিষ্ঠিত এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের তিনি অধীশ্বর হন। সুতরাং এই বিশাল সাম্রাজ্য সফলভাবে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছিল যা পালন করা তাঁর পক্ষে ছিল অসাধ্য। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে জাস্টিন যে সফল হয়েছিলেন একথা বলা চলে না। তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে বিবাদের সুযোগ নিয়ে তিনি পারস্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সমঝোতা আনয়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হওয়ায় তিনি নির্মম দমননীতি চালাতে শুরু করলে পরিস্থিতি পূর্বাপেক্ষা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ৫৭৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় জাস্টিনের তের বছর স্থায়ী রাজত্বকালের অবসান ঘটে।



জাস্টিনিয়ান

[শাসনকাল ৫২৭-৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ]

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বিখ্যাত সম্রাট। সম্রাট জাস্টিনের মৃত্যুর পর ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ানের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং ৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মোট আটত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। একজন যথার্থ রোমান সম্রাট হিসাবে প্রাচীন রোমের পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধারের কাজে তিনি ব্রতী হন। সিংহাসনে আরোহণের পরই তিনি এই উদ্দেশ্যে ভ্যাণ্ডাল, গথ, ভিসিগথ প্রভৃতি জাতিগুলোকে যুদ্ধে পরাজিত করে উত্তর আফ্রিকা, ইতালী ও দক্ষিণ স্পেনের অংশবিশেষ জয় করেন। জার্মান উপজাতিদেরও তিনি শায়েস্তা করেন। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের কাজে তিনি অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন। তবে পূর্ব দিকে পারসিকদের ঘন ঘন আক্রমণ সামাল দিতে তাঁকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। জাস্টিনিয়ান ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল বহু শতাব্দী ধরে সৃষ্ট রোমান আইনগুলোকে একত্রিত করে 'কোড' বা 'আইনবিধি' প্রণয়ন। এই 'কোড জাস্টিনিয়ান' তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। এই আইন বিধির জন্য পরবর্তী যুগের মানুষ তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। কারণ বিভিন্ন দেশের আইন প্রণয়নে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। স্থাপত্য শিল্পেও জাস্টিনিয়ানের অবদান কম উল্লেখযোগ্য নয়। তাঁর আমলে কনস্টান্টিনোপল সমসাময়িক বিশ্বের সুন্দরতম শহরে পরিণত হয়েছিল। তাঁর আমলে বহু বড় বড় অট্টালিকা, প্রাসাদ, উদ্যান, রাস্তাঘাট, মঠ, গির্জা দুর্গ প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল। এদের মধ্যে সেণ্ট সোফিয়া গির্জা হল এক অনন্য-সাধারণ সৃষ্টি। এই সময় বাইজানটাইন চিত্র শিল্পেরও এক অভূতপূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। জাস্টিনিয়ানের প্রাসাদ ও গির্জাগুলোর দেওয়ালে নামকরা শিল্পীদের আঁকা ছবি শোভা পেত। এ ছাড়া সম্রাটের আনুকূল্যে কনস্টান্টিনোপল সেই সময় বিশ্বের অন্যতম প্রধান ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। জাস্টিনিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চাও যথেষ্ট প্রসারলাভ করে। তাঁর

আমলে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কনস্টান্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্মতত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, অলঙ্কার শাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি বহু বিষয়ের পাঠ নেওয়া যেত। ৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ানের মৃত্যু হয়। তাঁর রাজত্বকাল বাস্তবিকই ছিল রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ।



জাহাঙ্গীর

[শাসনকাল ১৬০৫-১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ]

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী নাম ধারণ করে ১৬০৫ খ্রীঃ মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁকে পিতার উপযুক্ত পুত্র কোনোমতেই বলা চলে না, কারণ আকবরের ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা, কূটনৈতিক জ্ঞান, প্রশাসন ক্ষমতা কোনোটিরই তিনি অধিকারী ছিলেন না। অল্প বয়স থেকে সুরা-নারী বিলাসিতা তাঁর সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জাহাঙ্গীর এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন অস্থিরচিত্ত ও খামখেয়ালী। একজন বিদেশী লেখক টেরি মন্তব্য করেছেন যে তাঁর চরিত্রে দুই পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। আকবরের রাজত্বকালে একবার তাঁর মধ্যে বাদশাহ হবার প্রবল বাসনা জাগ্রত হওয়ায় তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। আকবরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঐতিহাসিক আবুল ফজলকে তাঁরই নির্দেশে হত্যা করা হয়েছিল। সিংহাসনে বসার অব্যবহিত পরই জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহ জাহাঙ্গীর দমন করেন এবং খসরুকে কারাগারে প্রেরণ করে অন্ধ করে দেওয়া হয়। জাহাঙ্গীর যুবরাজ খুররমকে (শাহজাহান) দাক্ষিণাত্য অভিযানে প্রেরণ করে ১৬১৬ খ্রীঃ আহম্মদনগর জয় করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পারস্যের সম্রাট শাহ আব্বাস কান্দাহার মোগলদের হাত থেকে কেড়ে নিতে সমর্থ হন। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে নূরজাহানের সাথে বিবাহ হল জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বিবাহের পর থেকে আস্তে আস্তে সাম্রাজ্য পরিচালনার সকল ক্ষমতা এই প্রতিভাময়ী রমণীর হস্তগত হয় এবং পানাসক্ত জাহাঙ্গীর প্রিয়তমা মহিষীর ছত্রছায়ায় বাকী জীবন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন থেকে

অতিবাহিত করেন। জাহাঙ্গীর শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন এবং আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' রচনা করেন। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জাহান্দার শাহ

[শাসনকাল ১৭১২-১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মোগল সম্রাট ছিলেন। ১৭১২ খ্রীঃ বাহাদুর শাহের মৃত্যু হলে পুনরায় সিংহাসন নিয়ে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিবতা শুরু হয়ে যায়। এই ভ্রাতৃ বিরোধের ফলে তিনজন নিহত হন এবং জাহান্দার শাহ জুলফিকার খানের সহায়তায় মোগল সিংহাসন লাভ করেন। জুলফিকার খান দেশের প্রধান মন্ত্রী হন। জাহান্দার ছিলেন একজন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি। তিনি হারেমের প্রিয় রমণী লালকুমারীর প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন। ঐতিহাসিক কাফি খান মন্তব্য করেছেন যে জাহান্দারের স্বল্পকাল স্থায়ী রাজত্বকালে দেশে বিশৃংখলা অবাধে রাজত্ব করতে থাকে এবং এটা ছিল কবি, গায়ক, নর্তক-নর্তকী ও অভিনেতাদের পক্ষে এক চমৎকার সময়। তিনি বেশিদিন সিংহাসনে থাকার সুযোগ পাননি। এক বছর রাজত্ব করার মধ্যেই তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে আজিম-উস-শানের পুত্র ফারুকশিয়রের নির্দেশে আগ্রা দুর্গে হত্যা করা হয় (১৭১৩)।

জেন গ্রে

[শাসনকাল ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দ]

জেন গ্রে পূর্ববর্তী রাজা ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের মৃত্যুর পর ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি মাত্র দশদিন রাজত্ব করার সুযোগ পান। ষষ্ঠ এডোয়ার্ড ক্ষীণ স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন এবং অল্প বয়সে অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। এডোয়ার্ড মৃত্যু শয্যায় থাকাকালে ওসার উইকের আর্ল অত্যন্ত প্রভাবশালী নর্দাম্বারল্যাণ্ড এডোয়ার্ডের ভগিনী লেডী জেন গ্রে কে তাঁর উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করে যাবার জন্য এডোয়ার্ডের সম্মতি আদায় করেন। নর্দাম্বারল্যান্ড জেন গ্রে কে সিংহাসনে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন কারণ জেন ছিলেন তাঁর পুত্রবধূ এবং একজন প্রটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী। অপর দিকে সিংহাসনের আর একজন দাবিদার ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের জ্যেষ্ঠা ভগিনী মেরি ছিলেন ক্যাথলিক এবং নর্দাম্বারল্যাণ্ডের শত্রু। ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের মৃত্যুর সাথে সাথে নর্দাম্বারল্যাণ্ড লেডী জেন গ্রে কে সিংহাসনে স্থাপন করলেন। কিন্তু জনমত তাঁর বিপক্ষে গেল। ইংলণ্ডের জনগণ মেরির প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেখানোয় নর্দাম্বারল্যাণ্ড নিঃসঙ্গ ও শক্তিহীন হয়ে পড়েন।

অতঃপর বিপুল জনসমর্থন পেয়ে মেরি সিংহাসনে আরোহণ করেন। নর্দাম্বারল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাঁকে হত্যা করা হয় এবং সেই সঙ্গে জেন গ্রে কে কারাগারে নিক্ষেপ করার সাথে সাথে তাঁর স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালের দুর্ভাগ্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটে।



জেফারসন

[শাসনকাল ১৮০১-১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। টমাস জেফারসন ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জিনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আমেরিকার একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা এবং গণতন্ত্র ও উদারনৈতিক ভাবধারার সমর্থক। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সংগ্রামী। জর্জওয়াশিংটনের নেতৃত্বে জেফারসন ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিদেশ সচিব নিযুক্ত হন। আমেরিকার বিখ্যাত 'ডিক্লারেশন অব্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' বা 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' জেফারসনই রচনা করেছিলেন। তিনি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে জন এ্যাডাম্স্-এর পর মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন এবং কার্যভার গ্রহণ ক'রে উদ্বোধনী ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর সরকারী নীতি ঘোষণা ক'রে বলেন, "আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য হ'ল সকল মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, সকল জাতির সাথে আন্তরিক সুসম্পর্ক স্থাপন এবং যে কোনো দেশের সাথেই অতিরিক্ত হৃদ্যতা পরিহার করা।" তিনি নানাবিধ শাসন সংস্কারের মাধ্যমে দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন (বিশেষতঃ অর্থনৈতিক) ঘটান। তিনি ত্রিপোলির যুদ্ধে অংশগ্রহণ ক'রে সফল হন এবং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের কাছ থেকে লুইসিয়ানা নামক স্থান ক্রয় করেন। ঐ বছর নতুন স্টেট্ ওহিওর অন্তর্ভুক্তির ফলে দেশে বহু রাস্তাঘাটও তিনি নির্মাণ করান। তাঁর সময়ে নেপোলিয়নের 'কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম' বা 'মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা'কে কেন্দ্র ক'রে ইংরাজ

সরকারের সাথে তাঁর বিরোধ বাধে যা পরবর্তী রাষ্ট্রপতি জেমস ম্যাডিসনের আমলে চরমে ওঠে। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে জেফারসনের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়। তারপরও তিনি আরো সতের বছর জীবিত ছিলেন এবং ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিরাশি বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

জেমস প্রথম

[শাসনকাল ১৬০৩-১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ]

সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে ইংলন্ডের স্টুয়ার্ট বংশের রাজা ছিলেন। তিনি ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইংলন্ডের সিংহাসন লাভের পূর্বে তিনি ষষ্ঠ জেমস নামে স্কটল্যান্ডের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ফলে ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ড যুক্ত হল। প্রথম জেমস সুপন্ডিত ও মেধাবী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৩৭ বছর বয়সে ইংলন্ডের রাজা হন। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন দয়ালু, রসিক ও বিচক্ষণ। কিন্তু তাঁর যথেষ্ট পান্ডিত্যাভিমানও ছিল। ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল এবং সেই ধর্মীয় সংকীর্ণতা-বিবাদের যুগেও তিনি ছিলেন পরম সহিষ্ণু। কিন্তু তাঁর চরিত্রের প্রধান ত্রুটি হল পরিস্থিতি অনুযায়ী চলবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তিনি সবক্ষেত্রেই রাজক্ষমতা ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত এই তত্ত্ব চালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রজাসাধারণের কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়েন। এইজন্য তাঁকে খ্রীষ্টান জগতের সবচেয়ে জ্ঞানীমূর্খ বলে অভিহিত করা হত। প্রথম জেমস স্বৈরাচারী শাসন চালাবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দেশবাসী ও পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে চান। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা রাণী এলিজাবেথের মতই মধ্যপন্থা অনুসরণ করে চলতেন। কিন্তু সেই সময় ইংলন্ডে উগ্র প্রোটেস্টান্ট বা পিউরিটানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জেমসের সাথে তাদের বিরোধ লাগল। তিনি বহু পিউরিটানকে যাজক পদ থেকে খারিজ করে দিলেন। স্বভাবতঃই রোমান ক্যাথলিকদের প্রতি তাঁর কিছুটা সহানুভূতি প্রকাশ পেল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ক্যাথলিকরা জেমসের আচরণে বিরক্ত হয়ে উঠল। জেমসের আমলে ইংলিশ পার্লামেন্ট ছিল রীতিমত শক্তিশালী। পার্লামেন্টের মাধ্যমে ইংরাজ জাতি এই সময় গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে রীতিমত সচেতন হয়ে উঠেছিল। ফলে 'রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি' এই পুরানো মতবাদে বিশ্বাসী রাজার সাথে পার্লামেন্টের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্বভাবতঃই বিরোধ দেখা দিল। পার্লামেন্টের চাপে পড়ে তাঁকে ক্যাথলিক স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল। এই যুদ্ধ চলাকালীন প্রথম

জেমস মৃত্যুবরণ করেন (১৬২৫)। প্রথম জেমসকে গ্রেট ব্রিটেনের প্রথম রাজা বলা চলে। কারণ তার আমলেই সর্বপ্রথম স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড একজন রাজার শাসনাধীনে পরিচালিত হয় এবং সেই সময় থেকেই স্কট জনগণ ইংলন্ডের নাগরিক হবার মর্যাদা লাভ করে।

জেমস দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৬৮৫-১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দ]

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলন্ডের স্টুয়ার্ট বংশের রাজা ছিলেন। দ্বিতীয় জেমস তাঁর ভাই দ্বিতীয় চার্লসের পরবর্তী শাসক হিসাবে ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডের সিংহাসনে বসেন এবং মাত্র তিন বছর রাজকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পান। দ্বিতীয় জেমস ছিলেন একজন গোঁড়া ক্যাথলিক এবং ইংলন্ডে ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃ স্থাপনে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি দেশ শাসনের ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক নীতি পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তিনি দেশে সম্পূর্ণ স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেন। ক্যাথলিক ধর্মকে ফিরিয়ে আনা ও রাজক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় জেমস প্রচলিত আইন কানুন বাতিল করে নিজের সুবিধামত আইনের প্রচলন করতে প্রয়াসী হন। তাঁর স্বৈরাচারী কার্যকলাপের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলে জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ তাঁর প্রতি বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এমন কি ইংলন্ডের দুই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ও (অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ) তাঁর অন্যায় হস্তক্ষেপে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। অবশেষে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম ও মেরি ইংলন্ডে আগমন করে গণ-সমর্থন পেয়ে সহজেই রাজ-সিংহাসন দখল করে বসেন। দ্বিতীয় জেমস জনগণের কাছে এত বেশি অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁকে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় ফ্রান্সে পলায়ন করতে হয়েছিল (১৬৮৮)। এইভাবে যুদ্ধ ছাড়াই বিনা রক্তপাতে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়। এই ঘটনা ইংলন্ডের ইতিহাসে 'গৌরবময় বিপ্লব' নামে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে কারণ এর দ্বারা রাজার বিশেষ অধিকার ও ক্ষমতার পরিবর্তে জনগণের অধিকারও মতামত অধিক গুরুত্ব লাভ করে। ফলে ইংলন্ডের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই সময় থেকে ইংলন্ড স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভ ক'রে শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের নতুন যুগে প্রবেশ করে।

জেসন

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী]

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে থেসালীর স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। লিউকট্রার যুদ্ধে থিবস-এর বিরুদ্ধে স্পার্টা পরাজিত হয় এবং স্পার্টার রাজা ক্লিওমব্রোটাস যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে গ্রীসের শ্রেষ্ঠত্ব স্পার্টার হাত থেকে থিবসের হাতে চলে যায়। এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে স্পার্টার অধীনস্থ বহু রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অধিকন্তু আর্কেডিয়ার শহরগুলো সম্মিলিত ভাবে স্পার্টার ধ্বংসসাধনে তৎপর হয়। এই সময় থেসালীর শাসক জেসনের সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে স্পার্টা এক বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পায়। জেসন ছিলেন তাঁর সময়ের একজন বিশিষ্ট শাসক। তাঁর সামরিক শক্তি ও সংগঠন প্রতিভাবলে তিনি থেসালীর সমস্ত বিচ্ছিন্ন, পরস্পর বিবদমান নগর রাষ্ট্রগুলোকে নিজ কর্তৃত্বাধীনে এনে ঐক্যবদ্ধ করেন। জেসনের লক্ষ্য ছিল সমগ্র গ্রীসের অধীশ্বর হওয়া। থিবসের জনগণ তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। কিন্তু স্পার্টাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শাসক জেসন বুঝেছিলেন যে স্পার্টার পতন হলে থিবস বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে তাঁর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তিনি পরাজিত স্পার্টানদের মুক্তি দেবার জন্য থিবানদের প্ররোচিত করেন। এর কিছুদিন পর জেসন আততায়ী হস্তে নিহত হলে থিবানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

টাইটাস

[শাসনকাল ৪০-৮১ খ্রীষ্টাব্দ]

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমের রাজা ভেসপাসিয়ানের পুত্র টাইটাস ৪০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দীর্ঘ চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়ে প্রভূত গৌরব অর্জন করেন। তিনি শত্রুবাহিনীকে পরাজিত ক'রে জেরুজালেম শহর অধিকার করে নেন এবং স্থানটির উপর ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালান। টাইটাস প্রথমে ছিলেন একজন দুশ্চরিত্র স্বৈরাচারী শাসক, কিন্তু পরবর্তীকালে বহু জনহিতকর কাজকর্মের মাধ্যমে প্রজাগণের সন্তোষ বিধান করেন। বিখ্যাত কলোসিয়ামের নির্মাণকার্য তিনিই সম্পূর্ণ করেন। এছাড়া তিনি বহু সুন্দর সুন্দর পথঘাট, স্নানাগার, উদ্যান, পার্ক প্রভৃতি নির্মাণ করেন। ৮১ খ্রীষ্টাব্দে টাইটাসের মৃত্যু হয়।



টিগলাথ পাইলেসার প্রথম

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী]

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে একজন প্রবল পরাক্রমশালী রাজার নেতৃত্বাধীনে প্রাচীন আসিরিয় সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য উজ্জীবন ঘটে। তিনি ঝড়ের বেগে অভিযান চালিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় উপনীত হন এবং উত্তর সিরিয়া ও ফিনিশিয়ার বহু শহর জয় করেন। তুরস্কের অভ্যন্তরে আনাতোলিয়া পর্যন্ত তাঁর বিজয়ী সৈন্যদল অগ্রসর হয়েছিল। টিগলাথ পাইলেসার অসাধারণ উদ্যমের পরিচয় দিয়ে বছরের পর বছর নতুন নতুন এলাকা জয়ের উদ্দেশ্যে অভিযান চালাতেন। শোনা যায় তিনি ২৮বার ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করেছিলেন এবং ৪২টি দেশ বা রাজ্য জয় করেছেন বলে দাবি করতেন। বিজিত দেশগুলোর ধনসম্পদে তিনি অসুরে তাঁর রাজপ্রাসাদকে সুশোভিত করেন। কিন্তু তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে স্থায়ী করার উপযোগী কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করে যাননি। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

টিগলাথ পাইলেসার তৃতীয়

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী]

প্রাচীন আসিরিয় সাম্রাজ্যের একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন। সেনাবাহিনীর এক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ৭৪৫ খৃীঃ তিনি রাজক্ষমতা দখল করেন। এই ক্ষমতাবান শাসক উত্তর সিরিয়ার উপর আসিরিয় কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজয়ী রাজ্যগুলোতে তিনি এক উন্নত ও সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তৃতীয় পাইলেসার আসিরিয়ার পশ্চিম দিকস্থ বহু রাজ্য জয় করেন। তিনি ব্যাবিলনিয়াও অভিযান করেছিলেন। টিয়ানা, সিডন, সিলিসিয়া, সামারিয়া ও আরবের রাজগণ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে কর প্রদান করতেন। তিনি দামাস্কাস জয় করে ঐ অঞ্চলে একজন আসিরিয় শাসক নিযুক্ত করেন।

তৃতীয় টিগলাথ পাইলেসার সঠিক কত বছর রাজত্ব করেন তা নিয়ে মতভেদ আছে।



টিপু সুলতান

[শাসনকাল ১৭৮২-১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ]

শৌর্য বীর্যের দিক দিয়ে টিপু সুলতান ছিলেন পিতা হায়দর আলির উপযুক্ত পুত্র যদিও পিতার মত দূরদর্শিতা ও কূটনৈতিক জ্ঞানের অধিকারী তিনি ছিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর টিপু ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং ইংরেজদের হাত থেকে ম্যাঙ্গালোর পুনরধিকার করেন। বাধ্য হয়ে মাদ্রাজের ইংরাজ গভর্নর লর্ড ম্যাকার্টনে টিপু সুলতানের সাথে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন (১৭৮৪)। কিন্তু এই সন্ধি ছিল সাময়িক কারণ দক্ষিণ ভারতে মহীশূর রাজ্যটি ছিল ইংরেজ কোম্পানীর ভারতবর্ষে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথে কণ্টকস্বরূপ। হায়দরের মত টিপুরও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতক্রোধ ছিল। আর ইংরেজ পক্ষও টিপুর স্বাধীন অস্তিত্ব ধ্বংস না করা পর্যন্ত স্বস্তিবোধ করেনি। তাই তাদের দিক থেকে প্রয়োজন হল আরও দুটি যুদ্ধের। তৃতীয় যুদ্ধের সময়ই টিপুর অবস্থা বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং তিনি ইংরেজদের সাথে বিরাট ক্ষতি স্বীকার করে শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হন (১৭৯২)। কয়েক বছর পর ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলী ইংরাজ নিজাম ও মারাঠা বাহিনী সহযোগে মহীশূর আক্রমণ করলে টিপু বীরের মত যুদ্ধরত অবস্থায় প্রাণ বিসর্জন দেন। টিপুর মৃত্যুর সাথে সাথে মহীশূরের স্বাধীন নবাবিরও অবসান ঘটে। শক্তিশালী ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য টিপু সুলতানের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও আত্মদানের জন্য তিনি দেশবাসীর হৃদয়ে শহীদের সম্মান লাভ করেছেন।

টিবেরিয়াস দ্বিতীয়

[শাসনকাল ৫৭৮-৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের একজন রাজা। দ্বিতীয় টিবেরিয়াস ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় জাস্টিনের উত্তরাধিকারী হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁর

রাজত্বকাল মাত্র চার বছর স্থায়ী হয়েছিল। তিনি প্রকৃতই ছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় রোমক সাম্রাজ্যের একজন গ্রীক সম্রাট। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি উপলব্ধি করেন যে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সর্বাগ্রে ধর্মীয় বিরোধগুলোর নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করেন এবং ধর্মের নামে সকল প্রকার হানাহানি ও অত্যাচার বন্ধ করেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় টিবেরিয়াস খুব একটা সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তিনি অবাধ্য পারসীকদের দমন করার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হন কিন্তু তাঁর প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। তিনি অভর ও তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারেননি। দ্বিতীয় টিবেরিয়াস ৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

ট্রাজান

[শাসনকাল ৯৮-১১৭ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন রোমের একজন সম্রাট। তিনি ৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১১৭ খ্রীঃ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কুখ্যাত রোমান সম্রাট নীরোর মৃত্যুর তিরিশ বছর পর ট্রাজান রোমের সম্রাট হন। বহুগুণের অধিকারী ট্রাজান ছিলের প্রাচীন রোমের একজন স্মরণীয় শাসক। তিনি ছিলেন উদার হৃদয় ও প্রজাদরদী। যোদ্ধা হিসাবেও তিনি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিলেন। নির্মাতা হিসাবে তাঁর পরিচিতি কোনো অংশে কম নয়। তিনি রোমে বহু সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, অট্টালিকা, পাঠাগার ও আইনসভা নির্মাণ করেছিলেন।

ডাইয়োনিসিয়াস

[শাসনকাল ৪০৫-৩৬৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন সিয়াকুসের একজন স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। ডাইয়োনিসিয়াস ৪০৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সিরাকুসের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ৩৬৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রবল পরাক্রমের সাথে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। সিরাকুসের ইতিহাসের এক অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে তিনি দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় একদিকে হানিবল কর্তৃক সিরাকুস আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং অপরদিকে দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থাও দুর্বল হয়ে পড়ে। ডাইয়োনিসিয়াস এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে বসেন (৪০৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)। ক্ষমতা লাভের পর তাঁর প্রথম কাজ ছিল নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তিনি কার্থেজের সাথে সাময়িক-

ভাবে সন্ধি স্থাপন করেন এবং এই সুযোগে তাঁর দেশকে সামরিক দিক দিয়ে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করার দিকে নজর দেন। এরপর তিনি সাম্রাজ্যবাদী অভিযান শুরু করেন। তিনি একে একে ন্যাক্সোস, কোটন, লিওনটিনি প্রভৃতি স্থান জয় করেন এবং কার্থেজের সাথে চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ করে তিনি গ্রীক শহরগুলোকে কার্থেজের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হন। শেষ পর্যন্ত কার্থেজ সিসিলির সমগ্র গ্রীক রাজ্যের উপর সিরাকুসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ডাইয়োনিসিয়াসের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা এতেই পরিতৃপ্ত হয়নি। তিনি দক্ষিণ ইতালীর বহু স্থান জয় করে অ্যাড্রিয়াটিকের উভয় তীরে তাঁর উপনিবেশ স্থাপন করেন। এমনকি গ্রীসের মাটিতেও তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন। এপিরাসের রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং শক্তিশালী স্পার্টাও তাঁর সাহায্য কামনা করে। এইভাবে ডাইয়োনিসিয়াসের নেতৃত্বে এক বিস্তীর্ণ এলাকা সিরাকুসের অধীনে আসে এবং ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় সিরাকুস প্রধান ইউরোপীয় শক্তিতে পরিণত হয়।

নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে দেশে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় এবং অতিরিক্ত করভারে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ডাইয়োনিসিয়াস ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারান। তিনি বিদ্যোৎসাহী শাসক ছিলেন এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমাদর করতেন। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এক সময় তাঁর অতিথি হিসাবে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। ৩৬৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ডাইয়োনিসিয়াস মৃত্যুবরণ করেন।

ডাইয়োনিসিয়াস দি ইয়ংগার

[খ্রীষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দী]

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সিরাকুসের শাসক ছিলেন। তিনি বিখ্যাত ডাইয়োনিসিয়াসের পুত্র। ডাইয়োনিসিয়াসের মৃত্যুর পর ৩৬৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি সিরাকুসের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বলচিত্ত ও পিতার অযোগ্য পুত্র। পিতার সামরিক প্রতিভার সামান্যতম স্ফুরণও তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যায় না। রাজত্বকালের প্রথম দিকে তিনি পিতার বিশ্বস্ত মন্ত্রী ডিয়নের পরামর্শ অনুসারে শাসন পরিচালনা করতেন। তিনি পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোকে নিজ প্রাসাদে আমন্ত্রণ করে তাঁকে সম্মানিত করেন। কিন্তু কিছুকাল পর ডাইয়োনিসিয়াস কিছু সভাসদের পরামর্শে ডিয়নকে সিরাকুস থেকে বিতাড়িত করেন এবং শাসনকার্যে চূড়ান্ত স্বৈরাচারী মনোভাব দেখান। ফলে তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণের বিক্ষোভ ক্রমশ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। ডিয়ন এই সুযোগে এক সৈন্যবাহিনী

নিয়ে সিরাকুসে প্রত্যাবর্তন করলে নাগরিকেরা তাঁকে মুক্তিদাতা হিসাবে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। ডাইয়োনিসিয়াস সিরাকুস পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ডিয়ন শাসন ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু আততায়ী হস্তে ডিয়ন নিহত হলে রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ডাইয়োনিসিয়াস এই সুযোগে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে কৌশলে পুনর্বার শাসক হয়ে বসেন। কিন্তু তিনি বেশিদিন স্বস্তিতে রাজত্ব করতে পারেননি এবং সিসিলির অধিকাংশ শহরই সিরাকুসের কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকৃত হয়।



ডি ভ্যালেরা

[শাসনকাল বিংশ শতাব্দী]

বর্তমান শতাব্দীতে আয়ারল্যাণ্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত জননেতা এবং একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক ইয়েমন ডি ভ্যালেরা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারল্যাণ্ডের বিদেশমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং কয়েক বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর পদলাভ করেন। তিনি ১৯৪৮ খ্রীষ্টব্দে পর্যন্ত একাদিক্রমে দশ বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইয়েমন ডি ভ্যালেরা ১৯১৭ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত আয়ারল্যাণ্ডের বিখ্যাত বিপ্লবী সমিতি সিন্ ফিন্-এর প্রেসিডেণ্ট থাকার গৌরব অর্জন করেন। এই সিন্ ফিন্ সমিতি বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে তাদের কার্যকলাপের দ্বারা বাংলার বিপ্লবীদের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল। ডি ভ্যালেরা ১৯২১ সালে আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন। ফিয়ানা ফেইল প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি ঐ সংস্থার প্রেসিডেণ্ট পদে মনোনীত হন এবং ১৯২২ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত আইরিশ পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের নেতা হিসাবে কার্য করেন। তিনি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে লীগ অব্ নেসন্স-এ আয়ারল্যাণ্ডের প্রতিনিধি হিসাবেও যোগদান করেছিলেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ডি ভ্যালেরা পুনরায়

প্রধানমন্ত্রীর পদলাভ করেন এবং ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আয়ারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৮৪ বছর বয়সে এই আত্মত্যাগী, জনদরদী নেতার জীবনাবসান হয়।



ডাফরিন

[শাসনকাল ১৮৮৪-১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হয়েছিলেন। লর্ড ডাফরিনের শাসনকাল পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তিনি ভারতে ভাইসরয় পদে অধিষ্ঠিত হবার আগে একাধিক দেশে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করেছিলেন। এছাড়া ভারতবর্ষ সম্পর্কেও তিনি যথেষ্টরকম ওয়াকিবহাল ছিলেন। লর্ড ডাফরিনের রাজত্বকালে বেশ কয়েকটি প্রজাসত্ব আইন পাশ হয় ও 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন' গঠিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫) হ'ল তাঁর আমলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ডাফরিনের সময়েই ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশ বছর রাজত্বকাল পূর্তি উপলক্ষে ভারতবর্ষে রীতিমত আড়ম্বর সহকারে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হয়েছিল।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ডাফরিনের লক্ষ্য ছিল আফগানিস্থানে রুশ ও ব্রহ্মদেশে ফরাসী প্রভাব খর্ব করা। তিনি রাশিয়ার সাথে যৌথভাবে আফগানিস্থানের সীমানা চিহ্নিত করেন এবং আফগান শাসক আবদুর রহমানকে ভারতবর্ষে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। ডাফরিনের আমলে তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্মযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে ব্রহ্মের উত্তরাংশ ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডাফরিন পদচ্যুত হন এবং লর্ড ল্যান্সডাউনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়।



ডালহৌসী

[শাসনকাল ১৮৪৮-১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী ও ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী আট বছর ধরে এই পদে বহাল থাকেন। তাঁর শাসনকাল যে ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। একজন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসাবে ডালহৌসীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে কোনো উপায়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটানো। এ ব্যাপারে তিনি নীতি-বিগর্হিত কাজ করতে কিছুমাত্র সংকোচবোধ করতেন না। ডালহৌসীর শাসনকালে খণ্ড বিচ্ছিন্ন সুবিশাল ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম এক সরকারী শাসনাধীনে ঐক্যবন্ধ হয়। তাঁর সময়ে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং পেগু প্রদেশ ইংরেজদের অধিকারে আসে। তিনি দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে শিখশক্তিকে পরাস্ত করে পঞ্জাব অধিকার করেন। ডালহৌসীর সবচেয়ে কুখ্যাত কাজ হল 'স্বত্ববিলোপ নীতি' প্রয়োগের মাধ্যমে দেশীয় রাজ্যগুলিকে কোম্পানীর অধিকারভুক্ত করা। এই নীতি অনুযায়ী ডালহৌসী সাঁতারা, ঝান্সী, নাগপুর প্রভৃতি বেশ কয়েকটি দেশীয় রাজ্যকে গ্রাস করলেন। সেইসঙ্গে তিনি কর্ণাটকের নবাব; তাঞ্জোরের রাজার দত্তক পুত্রদের এবং দ্বিতীয় বাজীরাও এর দত্তক পুত্র নানা সাহেবের বৃত্তি গ্রহণ বন্ধ করে দেন। ফলে তাঁর পীড়নমূলক শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে এবং শীঘ্রই তা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এক মহাবিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়ে। অনেক ঐতিহাসিকই লর্ড ডালহৌসীকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহা অভ্যুত্থানের জন্য অনেকাংশে দায়ী করেছেন। লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদী নীতির দ্বারা দেশীয় রাজন্যকুল যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাঁর আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারের দ্বারা দেশবাসী খুবই উপকৃত হয়েছিল। তাঁর নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য তিনি 'আধুনিক ভারতের নির্মাতা' হিসাবে অভিনন্দিত হয়েছেন। আইন ও রাজস্ব বিভাগের সংস্কার সাধন, পঞ্জাবের পুনর্গঠন, রেলপথ, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ, ডাক ও তার বিভাগ স্থাপন, গঙ্গার খাল খনন, গ্রাণ্ডট্রাংক রোডের

পুনর্গঠন, শিক্ষার মান উন্নয়ন, বন্দরগুলোর অবস্থার উন্নতি বিধান, পূর্তবিভাগ গঠন প্রভৃতি বহু জনহিতকর কাজের মাধ্যমে লর্ড ডালহৌসী ভারত ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান লাভ করেছেন। তাঁর আমলে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস উডের বিখ্যাত শিক্ষা সংক্রান্ত 'ডেসপ্যাচ' বা নির্দেশপত্র অনুযায়ী শিক্ষা বিভাগের সৃষ্টি করা হয় এবং ভারতের বহুস্থানে স্কুল কলেজ প্রভৃতি স্থাপন করা হয়। ডালহৌসীর পৃষ্ঠপোষকতায় বেথুন সাহেব ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগ্ম প্রয়াসে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় (বেথুন স্কুল) প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যি বলতে, লর্ড ডালহৌসীর আমলে ভারতবর্ষ তার মধ্যযুগীয় বন্ধনদশা কাটিয়ে আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। লর্ড ডালহৌসী ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা শাসক এবং তাঁর কর্মশক্তি ছিল বিস্ময়কর। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন এবং মাত্র ৪৮ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

ডিউক অব্ ওয়েলিংটন

[শাসনকাল ১৮২৮-১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ]

ভারতে নিযুক্ত প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেল মার্কুইস অব্ ওয়েলেসলির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ব্রিটিশ জেনারেল। 'নেপোলিয়ন বিজয়ী' ডিউক অব্ ওয়েলিংটন নামেই তিনি অধিক পরিচিত। আর্থার ওয়েলেসলি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টও ঐ একই বছর পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগদান ক'রে ভারতবর্ষে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পেনিনসুলার যুদ্ধে তিনি সেনাপতি হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্যারিসে ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত মনোনীত হন। এই সময় নেপোলিয়ন এল্বা দ্বীপ থেকে গোপনে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। আর্থার ওয়েলেসলি মূলত প্রাশিয়ার সহযোগিতায় নেপোলিয়নের ফরাসী বাহিনীকে ওয়াটার্লুর ঐতিহাসিক যুদ্ধে পরাজিত করে রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়নের পতন হয়। ফ্রান্স তথা ইউরোপের ইতিহাসে নেপোলিয়নের যুগের অবসান ঘটে এবং এক নতুন যুগের সূচনা হয়। আর্থার ওয়েলেসলি ইংলণ্ডে জাতীয় বীরের মর্যাদালাভ করেন এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেন। তিনি ১৮২৮ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিলাতে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন থাকেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে কার্য পরিচালনা করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিরাশি বছর বয়সে ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের জীবনাবসান হয়।

ডিমিট্রিয়াস

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী]

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের প্রথমদিকে ম্যাসিডনের রাজা ছিলেন। ডিমিট্রিয়াস ছিলেন বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডারের একজন সেনাপতি অ্যান্টিগোনাসের পুত্র। শাসক ক্যাসান্ডারের মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন ধরে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দিলে সেই সুযোগে ডিমিট্রিয়াস ম্যাসিডনের সিংহাসন দখল করে বসেন। পরবর্তীকালে তিনি 'ফিলোক্রেটিস' (শহর সমূহের অবরোধকারী) এই উপাধি লাভ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এপিরাসের রাজা পাইরাস তাঁকে ম্যাসিডন থেকে বিতাড়িত করলে তাঁর শাসক জীবনের অবসান ঘটে।

ডিজরেলী

[শাসনকাল ১৮৬৮, ১৮৭৪-৮০ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের একজন অন্যতম রাজনীতিবিদ্। ডিজরেলী দুবার ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি চরিত্রগত দিক থেকে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং ইংলণ্ডের অপর প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, সুযোগ-সন্ধানী, রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন একজন মানুষ। বক্তা হিসাবেও ডিজরেলী অত্যন্ত সুনামের অধিকারী ছিলেন। ডিজরেলী ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং সাতাত্তর বছর জীবিত ছিলেন। তিনি প্রথমে সাহিত্যিক হিসাবেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মাত্র একুশ বছর বয়সে তাঁর রচিত উপন্যাস 'ভিভিয়ান গ্রে' প্রকাশিত হ'লে ডিজরেলী লেখক হিসাবে ইংলণ্ডবাসীর বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠেন। 'কনিংসবি' এবং 'সাইবিল' নামক দুখানি রাজনৈতিক উপন্যাসকে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান ও ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ্। তাঁর পিতার নাম ছিল আইজ্যাক্ ডিজরেলী। ইহুদী বংশোদ্ভূত ডিজরেলী কোনো স্কুল-কলেজে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না পেলেও অদম্য মনোবল ও অধ্যবসায়ের জোরে ব্যক্তিগত প্রয়াসের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন এবং তাঁর উজ্জ্বল, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের সাহায্যে অল্পকালের মধ্যেই ইংলণ্ডীয় রাজনীতির অন্যতম প্রধান পুরুষে পরিণত হন।

একজন উদারপন্থী হিসাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেও ডিজরেলী পরবর্তী কালে অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার উদারনৈতিক ভাবধারা ও সংস্কারের বিরোধী টোরী দলের নেতা। ১৮৫২

খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডার্বির মন্ত্রিসভায় ডিজরেলী অর্থমন্ত্রীর পদলাভ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডার্বির বিদায়ের পর ডিজরেলী প্রথমবার প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন। এই মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বকাল ছিল মাত্র কয়েক মাস। পরবর্তী ছয় বছর বিরোধীপক্ষের নেতা হিসাবে থাকার পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগ লাভ করেন। এই সময় ডিজরেলী বেশ কয়েকটি সামাজিক সংস্কার আইন পাস করেন। তিনি 'লোকাল গভর্ণমেণ্ট বোর্ড' গঠন ক'রে স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়ের দায়িত্ব এর উপর অর্পণ করেন। তিনি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে 'বাসস্থান আইন' ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে 'জনস্বাস্থ্য আইন' এর প্রবর্তন করেন।

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ডিজরেলীর বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুয়েজ খাল কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় ক'রে ইংলণ্ডকে বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যবাদী উভয় দিক দিয়েই যথেষ্ট লাভবান করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক আইন পাসের মাধ্যমে রাণী ভিক্টোরিয়াকে 'কাইজার-ই-হিন্দ' (ভারত-সম্রাজ্ঞী) উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন এবং অল্প দিনের মধ্যে নিজেও 'আর্ল অব বেকন্সফিল্ড' উপাধিতে ভূষিত হন। এ ছাড়া ডিজরেলী বার্লিন চুক্তির ১৮৭৮) মাধ্যমে সাইপ্রাস লাভ করেন এবং রুশ অগ্রগতি রোধে সমর্থ হন। ডিজরেলীর চূড়ান্ত সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের ফলস্বরূপ বুয়র ও জুলু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার্থে আফগানিস্থানে রুশ প্রভাব খর্ব করার জন্য তিনি লর্ড লিটনকে আফগান যুদ্ধে লিপ্ত হবার জন্য প্ররোচিত করেন। যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই ডিজরেলী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন (১৮৮০)। পরের বছরই ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ডিজরেলীর জীবনাবসান হয়।

ডেগোবার্ট

[শাসনকাল ৬২৯-৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বিতীয় ক্লোটারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম ডেগোবার্ট ফ্রাঙ্কিস রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। মেরোভিঞ্জিয় বংশের তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী রাজা। যদিও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন কলুষমুক্ত ছিলনা তবুও তিনি ব্যক্তিত্ববান পুরুষ ছিলেন এবং যোগ্যতার সাথে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন মেরোভিঞ্জিয় বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা যার মধ্যে সিংহাসনে বসার অন্তত কিছুটা যোগ্যতা ছিল। তিনি মেরোভিঞ্জিয় সাম্রাজ্য আর ফ্রাঙ্কিস শক্তিকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেন। তিনি স্পেনীয় সিংহাসনের একজন দাবিদার সিসিন্যান্দকে সাহায্য করেন, লম্বার্ডদের বিরুদ্ধে সম্রাট

হেরাক্লিয়াসের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেন এবং পূর্বদিকস্থ স্লাভদের সাথে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হন। এলবের তীরে তিনি ফ্রাঙ্ক বংশীয় সামোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ডেগোবার্ট মারা যান।

তুতেনখামেন

[শাসনকাল ১৩৯৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন মিশরের অষ্টাদশ বংশের একজন ফারাও বা সম্রাট। তুতেনখামেন তিন হাজার বছরেরও অধিককাল পূর্বে মিশরের শাসক ছিলেন। তিনি ফারাও ইখ এন আটনের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইখ এন আটন 'আটন' বা সূর্যদেবতাকে মিশরীয়দের প্রধান দেবতার মর্যাদাদান করেন। তুতেনখামেন ফারাও হয়ে আটনের পরিবর্তে 'আমন'কে মিশরীয় ধর্মের প্রধান দেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এইভাবে 'আমন' শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তুতেনখামেন মিশরের রাজধানী থিব্স্-এ স্থানান্তরিত করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ কার্টারের নেতৃত্বে থিব্স্-এ খননকার্যের ফলে তুতেনখামেনের সমাধি আবিষ্কৃত হয়। এটা ছিল নিঃসন্দেহে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। বাস্তবিকই তুতেনখামেনের সমাধিক্ষেত্র থেকে যে পরিমাণ মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে আর কোনো ফারাওয়ের সমাধিক্ষেত্র থেকে তা পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া মমিটিও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তুতেনখামেন বেশিদিন রাজত্ব করার সুযোগ পাননি। সম্ভবতঃ অল্পবয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল।

তৈমুরলঙ্গ

[শাসনকাল ১৩৬৮-১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দ]

ইতিহাসে 'খোঁড়া তৈমুর' হিসাবে অতি পরিচিত এই মুসলমান শাসক ছিলেন একজন মস্ত বড় সমরনায়ক ও যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকুলের নির্মম বিজেতা। চেঙ্গিস খানের মতই তাঁর সময়ে তিনি সমগ্র এশিয়ার জনগণের মনে চরম ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন। তৈমুর ছিলেন চাঘতাই তুর্কী বংশোদ্ভূত এবং দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিসখানের যোগ্য উত্তরসূরী। তৈমুর ট্রান্স-অক্সিয়ানার কেশ নামক স্থানে ১৩৩৫ কিংবা ১৩৩৬ খ্রীঃ জন্ম-গ্রহণ করেন এবং ৩৩ বছর বয়সে সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর তিনি একে একে পারস্য, তুর্কীস্থান, সিরিয়া প্রভৃতি জয় করেন। ভারতবর্ষের বিপুল ঐশ্বর্য তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে এবং তিনি ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থান অভিযান করেন। তৈমুর দিল্লী ও তার আশপাশ এলাকা জয় করেন এবং হাজার হাজার নির-পরাধ অসহায় মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর এশিয়ার এক

'বিভীষিকা' তৈমুর মাত্র এক পক্ষকাল দিল্লীতে অবস্থান করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে শহরটিকে তিনি প্রায় শ্মশানে পরিণত করে প্রচুর ধনরত্ন ও মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীসহ তাঁর রাজধানী সমরখন্দে ফিরে যান। ভারতবর্ষ অভিযানের কয়েক বছর পর চীন অভিযানের প্রস্তুতি চালাবার সময় ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুর হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তোড়মান

[শাসনকাল ৪৯০-৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন হূণজাতির রাজা ছিলেন। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে। ষষ্ঠ শতাব্দীর সূচনায় এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হূণনেতা তোড়মান ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি পঞ্জাব, গন্ধার, গুজরাট, মালব প্রভৃতি স্থান অতি দ্রুত জয় ক'রে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেন। তিনি সম্ভবতঃ ৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে বীরবিক্রমে রাজত্ব চালান। তিনি ভারতবর্ষে রাজপদ লাভ করে 'মহারাজা' উপাধি ধারণ করেন এবং বহু রাজ্যকে তাঁর অধীনস্থ করদ রাজ্যে পরিণত করেন।



থথ্মেস তৃতীয়

[শাসনকাল ১৫২৫-১৪৯১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন মিশরের একজন বিশিষ্ট ফারাও বা সম্রাট ছিলেন। তৃতীয় থথ্মেস ছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ও দিগ্বিজয়ী বীর। একজন সুদক্ষ সমরনায়ক হিসাবে তিনি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। একের পর এক সামরিক অভিযান চালিয়ে এশিয়ার বহু অঞ্চল তিনি তাঁর বশীভূত করে রাখেন বলে জানা যায়। তিনি সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করার সুযোগ পান এবং তাঁর সময়ে মিশরের সাম্রাজ্যসীমা যথেষ্ট বিস্তারলাভ করেছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ সাফল্যের জন্য তৃতীয় থথুমেসকে 'মিশরের নেপোলিয়ন' বলে অভিহিত করা হয়। তৃতীয় থথুমেস একজন কুশলী প্রশাসকও ছিলেন। দৃঢ় ও নিপুণভাবে শাসনকার্য পরিচালনা ক'রে তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সমর্থ হন। কিন্তু বংশধরদের অযোগ্যতার দরুণ তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য তার মৃত্যুর পর ক্রমশঃ সংকীর্ণ আকার ধারণ করে এবং উপনিবেশগুলো মিশরের কর্তৃত্ব উপেক্ষা ক'রে স্বাধীন হয়ে যায়।

থিয়োজিনিস

[খ্রীষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দী]

প্রাচীন গ্রীসের একজন স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। থিয়োজিনিস খ্রীঃ পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে মধ্যগ্রীসের মেগারা নামক স্থানে একটি স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁর সময়ে মধ্যগ্রীসের করিন্থ, সিসিয়ন প্রভৃতি রাজ্যগুলোতেও 'টির‍্যানি' বা 'স্বৈরতন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু থিয়োজিনিসের প্রতিষ্ঠিত স্বৈরশাসন দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি এবং তাঁর শাসনের অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অভিজাত সম্প্রদায় ও সাধারণ প্রজাদের মধ্যে এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়।

থিয়োডরিক দি গ্রেট

[শাসনকাল ৪৯৩-৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন অস্ট্রোগথ জাতির একজন প্রতিভাবান রাজা ছিলেন। থিয়োডরিকের দীর্ঘ ৩৩ বছর স্থায়ী রাজত্বকাল সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক উভয় দিক দিয়েই স্মরণীয়। তিনি ছিলেন একজন উন্নত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বার্বেরিয় শাসক। থিয়োডরিকের সামরিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে পশ্চিমী দেশগুলো শঙ্কিত হয়েছিল। ইতালী অভিযান ও ইতালী বিজয় নিঃসন্দেহে তাঁর রাজত্বকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বিজয়ের পর থিয়োডরিক তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ববলে গথ ও রোমান এই দুই সম্পূর্ণ বিজাতীয় সংস্কৃতিসম্পন্ন জনগণের মধ্যে এক সুষ্ঠ সমন্বয় সাধনে সমর্থ হন। থিয়োডরিক সামরিক বলের সাহায্যে ইতালী জয় করলেও তিনি একজন দক্ষ ও রুচিবান শাসক ছিলেন। তাঁর অধীনে ইতালীর জনগণ এক উন্নত মানের শাসন ব্যবস্থার পরিচয় লাভ করে। থিয়োডরিকের বিশেষ কৃতিত্ব হ'ল তার তেত্রিশ বছর স্থায়ী শাসনকালের মধ্যে তাঁর সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবেই বজায় ছিল। তিনি ইতালীতে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিবিধান প্রভৃতি বহু

জনকল্যাণকর কাজকর্মের মাধ্যমে ইতালীকে পুনর্গঠিত করেন। থিয়োডরিক র‍্যাভেন্নাতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি প্রাচীন শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের দ্বারা শহরটিকে সুসজ্জিত করে তোলেন।

কুটনীতিবিদ্ হিসাবেও থিয়োডরিক তাঁর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি ভ্যান্ডাল, থুরিঙ্গিয়, ভিসিগথ, বার্গান্ডী, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি জাতিগুলোর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নিজের হাত শক্ত করেন। থিয়োডরিক একজন আরিয়ান খ্রীষ্টান ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করেন। অধিকন্তু তিনি গোঁড়া খ্রীষ্টানদের হাত থেকে ইহুদীদের রক্ষা ক'রে বিস্ময়কর উদারতার পরিচয় দেন। তাঁর সুশাসনের দ্বারা তিনি ভিসিগথ ও রোমান উভয় জাতের মানুষের কাছেই প্রিয় হয়ে ওঠেন। থিয়োডরিক ছিলেন একজন ন্যায় ও বিবেকবান বিচারক। তিনি বহু প্রজাকল্যাণকর আইনের প্রবর্তন করেছিলেন এবং বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে তাঁর সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে সমর্থ হন। অধিকন্তু সামরিক অভিযান চালিয়ে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে প্রসারিতও করেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার জন্য ইতিহাসে তিনি থিয়োডরিক 'দি গ্রেট' নামে পরিচিতি লাভ করেছেন।

দলীপ সিংহ

[শাসনকাল ১৮৪০-১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ]

'পঞ্জাব কেশরী' রণজিৎ সিংহের পুত্র। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর সময় দলীপ সিংহ ছিলেন নিতান্তই বালক। রণজিতের মৃত্যুর পর শিখ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গৃহবিবাদ ও অরাজকতা তীব্র আকার ধারণ করে। রণজিতের খালসা বাহিনী এই অবস্থার হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের উদ্দেশ্যে রণজিৎ সিংহের পাঁচ বছর বয়স্ক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে বসায়। মহারাণী ঝিন্দন তাঁর নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা হিসাবে মন্ত্রিদ্বয় লাল সিংহ ও তেজ সিংহের সহায়তায় শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড ডালহৌসী গুজরাটের যুদ্ধে শিখদের পরাজিত করে পঞ্জাবকে ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিলে দলীপ সিংহ সিংহাসনচ্যুত হন। ইংরাজ কোম্পানি তাঁকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করে এবং ইংলণ্ডে প্রেরণ করে।



দরায়ুস প্রথম

[শাসনকাল ৫২২-৪৮৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন পারস্যের একজন বিশিষ্ট সম্রাট ছিলেন। প্রথম দরায়ুস বা ডেরিয়াস 'দি গ্রেট' ৫২২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পারস্যের অ্যাকামেনিড বংশের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দীর্ঘ ৩৬ বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন। তিনি বহু স্থান জয়ের মাধ্যমে এশিয়ায় এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতবর্ষেরও কিছু কিছু অঞ্চল তিনি জয় করে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন দরায়ুস ছিলেন একজন শক্তিশালী ও দক্ষ শাসক। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে কুড়িটি স্যাট্রাপী বা প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং এক উন্নত, সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এইসব প্রদেশ তাঁর অধীনস্থ গভর্নরদের দ্বারা শাসিত হত। তিনি তাঁর সাম্রাজ্য মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটান, কর ব্যবস্থার সংস্কার সাধন এবং এক উন্নত মানের মুদ্রার প্রচলন করেন। তাঁর আমলে আইন ও বিচার ব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছিল। সেই সময় পারস্য সাম্রাজ্য যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এশিয়ায় শ্রেষ্ঠ ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। দরায়ুস সিথিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং থেস, ম্যাসিডোনিয়া প্রভৃতি স্থান বিধ্বস্ত করে সমগ্র গ্রীস দেশ জয়ের জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ম্যারাথনের যুদ্ধে (৪৯০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) গ্রীকদের কাছে পরাজয় বরণ করার ফলে তাঁর এই আশা অপূর্ণ থেকে যায়। প্রথম দরায়ুস ৪৮৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দরায়ুস দ্বিতীয়

[শাসনকাল ৪২৩-৪০৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন পারস্যের অ্যাকামেনিড বংশের একজন রাজা ছিলেন। দ্বিতীয় দরায়ুস ৪২৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁর রাজত্ব মোট কুড়ি বছর স্থায়ী হয়েছিল। দ্বিতীয় দরায়ুসের শাসন ছিল দুর্নীতিপূর্ণ এবং প্রথম দরায়ুসের তুলনায় তাঁকে রীতিমত অযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি গ্রীসের দুই প্রধান রাষ্ট্র এথেন্স ও স্পার্টার পারস্পরিক শত্রুতার সুযোগ নেবার চেষ্টা করেন এবং এথেন্সের বিরুদ্ধে স্পার্টার পক্ষাবলম্বন করে গ্রীসে নিজ প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় দরায়ুস ৪০৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দরায়ুস তৃতীয়

[শাসনকাল ৩৩৬-৩৩০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন পারস্যের অ্যাকামেনিড বংশের শেষ স্বাধীন শাসক ছিলেন। তৃতীয় দরায়ুস মাত্র ছয় বছর রাজত্ব করার সুযোগ পান। তিনি একজন প্রবল পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন এবং এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি ছিলেন বিশ্ববিজয়ী গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক। আলেকজাণ্ডারের কাছে একাধিক যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় তাঁর স্বাধীন অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। তৃতীয় দরায়ুস ৩৩০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আততায়ী হস্তে নিহত হন।

দাহির

[শাসনকাল অষ্টম শতাব্দী]

মহম্মদ বিন্ কাশিমের নেতৃত্বে ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে আরবরা সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে। সেই সময় সিন্ধুদেশে দাহির নামে একজন হিন্দু রাজা রাজত্ব করছিলেন। আরবরা এক বিশাল বাহিনী নিয়ে দাহিরের রাজ্য আক্রমণ করে। দাহিরের সৈন্যসংখ্যা তুলনায় অনেক কম ছিল। সিন্ধুদেশে সেই সময় আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও গৃহযুদ্ধ চলছিল, ফলে দাহির আরবদের কাছে পরাজিত হন। চাচনামা গ্রন্থ থেকে জানা যায় দাহির ও তাঁর বড়ভাই সিংহাসনের দাবি নিয়ে তাঁদের পিতৃব্য দুরাজের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। দুরাজের মৃত্যুর পর সিন্ধুদেশ দুইভাই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। অবশেষে বড় ভাইয়ের মৃত্যু হ'লে দাহির সেখানকার একছত্র অধিপতি হন। কিন্তু তিনি আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারের বিশেষ সুযোগ পাননি, কারণ তাঁকে প্রতিবেশী রাজার সাথে সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। অধিকন্তু, রাজা দাহিরের ব্যক্তিগত শৌর্য-বীর্যের অভাব না থাকলেও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সামরিক শক্তির অভাব ছিল। আরব রণতরীগুলোকে প্রতিরোধ করার মত উল্লেখযোগ্য কোনো নৌবহর তাঁর ছিল না। দাহির বীরের মত সংগ্রাম চালিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেন (৭১২ খ্রীষ্টাব্দ)। সিন্ধুদেশে ইসলামের জয়পতাকা প্রোথিত হয়। ভারতবর্ষের মাটিতে মুসলমানদের এটাই প্রথম সামরিক অভিযান বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করে থাকেন।

দেবপাল

[শাসনকাল ৮১০-৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন বাংলার পাল বংশের একজন রাজা ছিলেন। দেবপাল ছিলেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপালের উপযুক্ত পুত্র। তিনি ৮১০ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর পাল-

বংশের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁর রাজত্বকাল দীর্ঘ চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। দেবপাল উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন এবং নিজ যোগ্যতাবলে তা আরও বিস্তৃত করেন। সুদীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে তিনি উৎকল, হূণ, গুর্জর, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতিগুলোর বিরুদ্ধে বহু সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। বাদল লৌহ শিলালেখতে তাঁকে সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, শোনা যায় তাঁর নাম ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। একজন আরব পর্যটক সুলেমানও দেবপালের সামরিক শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। জাভা ও সুমাত্রার শৈলেন্দ্র রাজা বঙ্গে বৌদ্ধমঠ স্থাপনের অনুমতি চেয়ে তাঁর রাজসভায় দূত পাঠিয়েছিলেন। পিতার মত দেবপালও বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে নালন্দা ছিল বৌদ্ধশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র।

দেবরায় প্রথম

[শাসনকাল ১৪০৬-১৪২২ খ্রীষ্টাব্দ]

সঙ্গম বংশীয় দ্বিতীয় হরিহরের মৃত্যুর পর প্রথম দেবরায় বিজয়নগর রাজ্যের রাজা হন (১৪০৬ খৃীঃ)। দ্বিতীয় হরিহরের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম দেবরায় জয়ী হয়ে সিংহাসন দখল করেন। তিনি ছিলেন একজন দুর্বল রাজা। তাঁর আমলে বাহমনী রাজ্যের সাথে বিজয়নগর রাজ্যের তীব্র বিরোধ শুরু হয়। প্রথম দেবরায় একাধিক যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে পরাজয় বরণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ষোল বছর স্থায়ী হয়েছিল। প্রথম দেবরায় ১৪২২ খৃীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

দেবরায় দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৪২২-১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দ]

সঙ্গম বংশীয় বিজয়নগর রাজ্যের একজন রাজা। দ্বিতীয় দেবরায় ১৪২২ খৃীষ্টাব্দে বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে বসার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে প্রতিবেশী বাহমনী রাজ্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। মুসলিমদের হাতে পরাজয় বরণ করলেও দ্বিতীয় দেবরায় একজন দক্ষ ও শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। বাহমনী রাজ্যের সাথে সংগ্রামে জয়ী হবার উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিমদের তাঁর সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে বিজয়-নগরের ব্যবসা-বাণিজ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং আভ্যন্তরীণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

পারস্যের পর্যটক আবদুর রজ্জাক এই সময় বিজয়নগর পরিদর্শনে এসে দ্বিতীয় দেবরায় ও তাঁর সাম্রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে নানা বিবরণ দিয়েছেন। এই সময় বিজয়নগর সাম্রাজ্য সমগ্র দক্ষিণ ভারতে একেবারে সিংহলের সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় দেবরায় ২৪ বছর রাজত্ব করার পর ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

দোস্ত মহম্মদ

[শাসনকাল ১৮২৬-১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ]

আফগানিস্থানের একজন রাজা ছিলেন। দোস্ত মহম্মদ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্থানের আমীর পদে অধিষ্ঠিত হন। ভারতের শিখদের সাথে তাঁর খুবই তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁকে প্রায়শই শিখদের সাথে বিবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে হ'ত। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতের ইংরাজ কোম্পানীর সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি দেখা দেয়, যার ফলস্বরূপ ১৮৩৯-৪২ এর মধ্যে প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। দোস্ত মহম্মদ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেশ ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন। পরে ইংরেজদের সাথে তার সম্পর্কের উন্নতি হওয়ায় তাদের সাহায্যে তিনি পুনরায় আফগানিস্থানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দোস্ত মহম্মদের সাথে ইংরাজ কোম্পানীর মৈত্রীসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু পারস্যের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হওয়ায় তিনি ইংরেজদের প্রতি কঠিন মনোভাব প্রদর্শন ক'রে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

দোস্ত মহম্মদ মোটের উপর একজন শক্তিশালী ও সমর্থ শাসক ছিলেন এবং আফগানিস্থানের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের ব্যাপারে যথাসাধ্য প্রয়াস চালান। দোস্ত মহম্মদ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

ধননন্দ

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী]

প্রাচীন ভারতে নন্দবংশের একজন রাজা। বৌদ্ধ গ্রন্থ মহাবোধিভামসা অনুযায়ী জানা যায় শেষ নন্দরাজার নাম ছিল ধননন্দ। তিনি সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক ছিলেন। গ্রীক লেখকেরা তাঁকে আগ্রামেস বা জান্দ্রামেস বলেও উল্লেখ করেছেন। ধননন্দ উত্তরাধিকার সূত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী গঠিত ছিল ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০,০০০ পদাতিক, ২,০০০ রথী এবং ৩,০০০ হস্তী নিয়ে। এছাড়াও ধননন্দের কোষাগার ছিল ধনসম্পদে পরিপূর্ণ। সমসাময়িক

গ্রন্থগুলো থেকে জানা যায় ধননন্দ প্রজা সমর্থন হারিয়েছিলেন। বিচক্ষণ চন্দ্রগুপ্ত এই সুযোগে নন্দরাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে মগধে নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এই ব্যাপারটি হয়ত একেবারে বিনা রক্তপাতে ঘটানো সম্ভব হয়নি। মিলিন্দপনহো নামক গ্রন্থ থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কথা জানা যায়। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত বিজয়ী হন এবং ৩১৭ থেকে ৩১৪ খৃীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে কোনো এক সময় নন্দবংশের শাসনের অবসান ঘটে।

ধর্মপাল

[শাসনকাল ৭৭০-৮১০ খ্রীষ্টাব্দ]

ধর্মপাল হলেন প্রাচীন বাংলার পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর আমলে বাংলাদেশ উত্তর ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তিনি ৭৭০ খৃীঃ থেকে ৮১০ খৃীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকাল বাস্তবিকই ছিল বাংলার ইতিহাসে গৌরবময় কাল। তিনি সামরিক শক্তি ও কূটনৈতিক বুদ্ধির সাহায্যে পিতার আমলের ক্ষুদ্র রাজ্যসীমাকে রীতিমত বিস্তৃত করেন এবং শুধু বঙ্গদেশেই নয়, উত্তর ভারতের এক বিশাল অংশের উপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর কৃতিত্ব এই কারণে বিশেষ স্মরণীয় যে তাঁকে তদানীন্তন কালের দুই শক্তিশালী রাজবংশের সাথে সংগ্রাম করতে হয়েছিল (প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট)। তিনি ছিলেন বাংলার অপর শক্তিশালী রাজা শশাঙ্কের যোগ্য উত্তর পুরুষ। শশাঙ্কের সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্নকে তিনি অনেকটা বাস্তবায়িত করেন। তাঁর কৃতিত্বের চিহ্নস্বরূপ ধর্মপাল পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। উত্তর ভারতে তাঁর সাফল্যের চিহ্নস্বরূপ তিনি কনৌজে এক বিশাল দরবার আহবান করেন।

শুধুমাত্র একজন সাম্রাজ্যবাদী পুরুষ হিসাবেই ধর্মপালের পরিচয় সীমাবন্ধ নয়। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের একান্ত অনুরাগী। মগধের প্রসিদ্ধ বিক্রমশীলা বিহার ও সোমপুরা বিহার তাঁরই দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত হরিভদ্র ছিলেন ধর্মপালের সমসাময়িক।

বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হলেও তিনি অন্যান্য সব ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতেন। তাঁর আমলে বাংলার মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করত।

ধ্রুব

[শাসনকাল ৭৮০-৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন রাষ্ট্রকূট বংশের একজন শক্তিশালী রাজা। ধ্রুব তাঁর বড়ভাই দ্বিতীয় গোবিন্দকে গৃহযুদ্ধে পরাস্ত ক'রে সিংহাসন দখল করেন। ধ্রুবর রাজত্বকাল থেকে

রাষ্ট্রকূটদের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ধ্রুব তাঁর অপ্রতিহত সামরিক শক্তির জোরে নিজেকে দক্ষিণ ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি করেন। তিনি উত্তর ভারতের প্রভু হবারও প্রয়াস চালান। উত্তর ভারতে সামরিক অভিযান চালালেও তিনি সেখানে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেননি। তাই শুধুমাত্র দক্ষিণের উপরই তাঁর একাধিপত্য বজায় ছিল। ধ্রুবর রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূট বংশ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। তিনি সমসাময়িক ভারতের প্রায় সব বড় রাজাকেই যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন বলে জানা যায় এবং কেউই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব উপেক্ষা করতে পারেননি। ধ্রুব মোট দশ বছর রাজত্ব করেন।

নজমউদ্দৌলা

[শাসনকাল ১৭৬৫-১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ]

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নজমউদ্দৌলা বাংলার মসনদ লাভ করেন। ষোল বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে বসেন। এই সময় ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার সর্বময় প্রভু হয়ে বসেছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে তারা রাজা সৃষ্টিকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অনভিজ্ঞ কিশোর নজমউদ্দৌলাকে নবাব করার বিনিময়ে ইংরাজ কোম্পানী তার সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ঠিক হয় নবাব নামে নবাব থাকবেন এবং তাঁর হয়ে নায়েব নাজিম শাসনকার্য দেখাশোনা করবেন। নায়েব-নাজিম নিযুক্তিকরণের ভারও থাকবে ইংরাজদের উপর। প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাব কোম্পানীর আজ্ঞাবহ হাতের পুতুলের মত কালাতিপাত করতে থাকেন। এক বছর নামে মাত্র নবাব থাকার পর ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নজমউদ্দৌলার দুর্ভাগ্যজনক শাসনের অবসান ঘটে।

নর্থব্রুক

[শাসনকাল ১৮৭২-১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ]

লর্ড নর্থব্রুক ৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং মোট চার বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি কুশাসনের অজুহাতে বরোদার গাইকোয়াড় মলহর রাওকে গদীচ্যুত করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ-আইন প্রবর্তন করে নর্থব্রুক ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনেন। তাঁর সময়ে ইংলণ্ডের তদানীন্তন যুবরাজ (পরবর্তীকালে রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড) ভারতভ্রমণে এসেছিলেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে নর্থব্রুক পূর্ববর্তী শাসকদের নিরপেক্ষতানীতি অনুসরণের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সময় আফগানিস্থানে রুশীয় অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা দেখা দিলে পরিস্থিতি জটিলাকার ধারণ করে। আফগান শাসক শের আলী

নর্থব্রুকের সাহায্য প্রার্থনা করে বিফল হন। ফলে ইংরেজ-আফগান সুসম্পর্ক বিনষ্ট হয়। এই পন্থা অবলম্বনের জন্য নর্থব্রুক বিলাতীয় কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করেন।

নন্দীবর্মন দ্বিতীয়

[শাসনকাল ৭৮০-৮০০ খ্রীষ্টাব্দ]

পল্লব বংশের একজন রাজা। দ্বিতীয় নন্দীবর্মন ৭৮০ খ্রীঃ পূর্ববর্তী রাজা দ্বিতীয় পরমেশ্বর বর্মণের পর পল্লব সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন প্রাপ্ত হননি, কারণ তিনি প্রত্যক্ষভাবে পল্লব রাজবংশজাত ছিলেন না। দেশের বিশিষ্ট নাগরিকেরা তাঁকে সর্ব সম্মতিক্রমে রাজা মনোনীত করে। কিন্তু দ্বিতীয় নন্দীবর্মণের কাছে সিংহাসন আদৌ সুখের বস্তু ছিলনা। রাজা হয়েই তাঁকে ক্রমাগত বহিঃশত্রুর আক্রমণের শিকার হতে হয়েছিল। তাঁকে একে একে পাণ্ড্যরাজ রাজসিংহ, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ও রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গের হাতে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। সম্ভবতঃ একমাত্র গঙ্গবংশীয় রাজার বিরুদ্ধে তিনি সামরিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং গঙ্গদের কিছু রাজ্যাংশ তাঁর হস্তগত হয়েছিল। সুতরাং সামরিক দিক দিয়ে তিনি যে যথেষ্ট দুর্বল ছিলেন তা নিঃসন্দেহ। দ্বিতীয় নন্দীবর্মণ একজন ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ মুক্তেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেন। মোট কুড়ি বছর রাজত্ব করার পর ৮০০ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

নরসিংহদেব প্রথম

[শাসনকাল ১২৩৮-১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দ]

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার গঙ্গবংশের একজন বিশিষ্ট রাজা ছিলেন। প্রথম নরসিংহদেব ১২৩৮ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ছাব্বিশ বছর রাজত্ব পরিচালনা করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। কোণারকের বিখ্যাত সূর্যমন্দির নির্মাণ তাঁর রাজত্বকালের এক স্মরণীয় ঘটনা। পুরী থেকে প্রায় বিশ মাইল উত্তর-পূর্বে এই মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও দর্শকদের কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু।

নরসিংহবর্মণ প্রথম

[শাসনকাল ৬৩০-৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রথম নরসিংহবর্মণ ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং 'মহামল্ল' উপাধি ধারণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা এবং তাঁর রাজত্বকালে পল্লব

শক্তি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। প্রথম নরসিংহবর্মণের আমলে পল্লবদের সামরিক শক্তির প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং চালুক্য, চোল, চের, পাণ্ড্য প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্যগুলো নরসিংহবর্মণের ক্ষাত্রতেজ উপলব্ধি করে। নরসিংহবর্মণের আর একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল সিংহলে একটি নৌ-অভিযান প্রেরণ।

নরসিংহবর্মণ ছিলেন একজন বড় নির্মাতা। তিনি দেশের প্রধান বন্দর মামল্লপুরমকে নতুনভাবে সুসজ্জিত করেন এবং ত্রিচিনোপল্লীতে বেশ কিছু পাহাড় খোদাই করে মন্দির নির্মাণ করেন।

৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর রাজ্য পরিদর্শন করেন। হিউয়েন সাঙের লেখা থেকে পল্লব রাজ্যের অনেক মূল্যবান বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বিশেষ করে কাঞ্চি শহরটি ও তার জনগণের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সম্ভবতঃ ৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম নরসিংহবর্মণের মৃত্যু হয়।

নরসিংহ সালুভ

[শাসনকাল ১৪৮৬-১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ]

বিজয়নগর রাজ্যের একজন রাজা। তিনি সালুভ বংশোদ্ভূত ছিলেন। নরসিংহ পূর্ববর্তী শাসক দ্বিতীয় বিরূপাক্ষকে সিংহাসনচ্যুত করে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের রাজা হন এবং বিজয়নগরের ইতিহাসে সালুভ বংশের শাসনের পত্তন করেন। নরসিংহ সালুভ একজন যোগ্য শাসক ছিলেন। তাঁর পূর্বসূরীর আমলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছিল। নরসিংহ রাজা হয়েই অল্পদিনের মধ্যেই জনগণের আস্থা অর্জন করেন এবং তাঁর রাজত্বকালের মধ্যে অধিকাংশ বিদ্রোহী প্রদেশগুলোকে পুনরায় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন। শুধু রায়চুর-দোয়াব বাহমনী রাজ্যের এবং উদয়গিরি উড়িষ্যা রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে থাকে। নরসিংহ ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

নসরৎ শাহ

[শাসনকাল১৫১৯-১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ]

হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রাজধানী গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠান করেন। তিনি মোট তের বছর রাজত্ব করেন। তিনি পিতার মত সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না সত্য কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার বেশ কিছু চারিত্রিক গুণের তিনি অধিকারী হয়েছিলেন। নসরৎ শাহ পিতার রাজত্বকালের সুনাম ও ঐতিহ্য বজায় রাখেন এবং সুশৃঙ্খল ও সুচারুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পিতার মত তিনিও ছিলেন উদার প্রকৃতির মানুষ এবং শিল্প-

সংস্কৃতির একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। তাঁর নির্দেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অনুবাদ করেন এবং কবিশেখর দেবকীনন্দন সিংহ নসরতের বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। নসরতের ১৩ বছর ব্যাপী শাসনকাল ছিল বাংলায় শান্তিপর্ব। ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে নসরৎ শাহ'র জীবনাবসান হয়।



নাদির শাহ

[শাসনকাল ১৭৩২-১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে পারস্যের সম্রাট ছিলেন। খুব সামান্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও এবং বহু প্রতিকূল অবস্থার শিকার হওয়া সত্ত্বেও নিজ যোগ্যতাবলে তিনি পারস্যের সম্রাট পদলাভ করতে সমর্থ হন। নাদিরের কর্মশক্তি, সাহস ও আত্মবিশ্বাস ছিল বিস্ময়কর। তিনি শাহ তামাস্পকে আফগানদের হাত থেকে পারস্য পুনরুদ্ধারে যথেষ্ট সহায়তা করেন এবং প্রভুর দুর্বলতার সুযোগে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে শাসক হয়ে বসেন। ভারতবর্ষের প্রাচুর্য ও ধন-সম্পদ তাঁকে প্রলুব্ধ করে এবং ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। তদানীন্তন দিল্লীর মোগল বাদশাহ মুহম্মদ শাহের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ এবং দিল্লীর দরবারে পারসীক দূতের প্রতি দুর্ব্যবহারের অজুহাতে নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোগল শাসনের দুর্বলতার সুযোগে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সহজেই গজনী, কাবুল ও লাহোর জয় করেন। নাদির শাহ তাঁর সৈন্য-বাহিনী নিয়ে প্রায় বিনা বাধায় দিল্লীর অনতিদূরে উপস্থিত হন। বাস্তবিকই সেই সময় মোগল শাসন যে অবনতির কোন্ স্তরে এসে পেঁছেছিল তা এই ঘটনা থেকে সহজেই অনুমেয়। মুহম্মদ শাহের অবশেষে চৈতন্যোদয় হওয়ায় তিনি বৈদেশিক আক্রমণ-কারীকে প্রতিহত করার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু পাণিপথের কুড়ি মাইল উত্তরে কার্ণাল নামক স্থানে মোগল বাহিনী সহজেই শত্রুবাহিনীর হস্তে পরাজিত হয় (১৭৩৯)। মুহম্মদ শাহ বাধ্য হয়ে নাদিরের কাছে সন্ধির জন্য আবেদন করেন। বিজয়ী নাদির 'দিওয়ান-ই-খাস্'-এ প্রবেশ ক'রে বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন দখল করেন। এই সময় নাদিরের মৃত্যু হয়েছে বলে এক মিথ্যা সংবাদ দ্রুত দিল্লীবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে

পড়ায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং কিছু পারসীক সৈন্য জনতার হাতে মারা পড়ে। এই ঘটনায় নাদির রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর সৈনিকদের নির্বিচারে লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক গণহত্যার আদেশ দেন। প্রায় দু'মাস দিল্লীতে অবস্থানের পর নাদির অবশেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। যাবার সময় নাদির বিখ্যাত কোহিনুর হীরা, শাহজাহানের তৈরি ময়ূর সিংহাসন, পনের কোটি টাকা, তিনশো হাতি, দশ হাজার ঘোড়া ও বেশ কয়েক হাজার উট এবং প্রভুত পরিমাণ সোনা-রূপা মণি মাণিক্য ও বহুমূল্য নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। ফলে পারসীক আক্রমণ পতনশীল মোগল সাম্রাজ্যকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে রীতিমত নিঃস্ব করে রেখে যায়। সিন্ধু, কাবুল, পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ প্রভৃতি স্থান পারসীকদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অধিকন্তু বহির্বিশ্বে এতদিন মোগল সম্রাটের যে সামান্য মর্যাদাটুকু ছিল তাও এই আক্রমণের ফলে বিনষ্ট হয়। নাদিরের সাফল্য শীঘ্রই আর একজন আফগান শাসক আহম্মদ শাহ দুররানীকে (যিনি প্রথমে ছিলেন নাদিরের অধীনস্থ একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার) ভারত অভিযানে প্রলুব্ধ করে। পনের বছর রাজকার্য পরিচালনা করার পর ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ আততায়ী হস্তে নিহত হন।

নারায়ণ পাল

[শাসনকাল ৮৫৪-৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ]

বাংলার পাল বংশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি পিতা প্রথম বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন (৮৫৪ খ্রীষ্টব্দ)। নারায়ণ পাল ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ শান্তিপ্রিয় মানুষ। তিনি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় রাজত্ব করেন। কিন্তু স মরিক দিক থেকে তিনি ছিলেন দুর্বল। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনি কোনো সামরিক অভিযান পরিচালনা করে তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করেননি। বরং তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহারগণ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে বেশ কিছু কিছু এলাকা তাদের হস্তগত করে। কামরূপ ও উড়িষ্যার নৃপতিগণও সুযোগ বুঝে পালদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে এবং স্বাধীন হয়ে যায়। দীর্ঘ ৫৪ বছর রাজত্ব পরিচালনা করার পর ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণ পাল পরলোকগমন করেন।

নাসিরউদ্দিন খুসরু শাহ

[শাসনকাল ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে ভারতের খলজী বংশের শেষ শাসক ছিলেন। আলাউদ্দিনের পুত্র মুবারক শাহের মৃত্যুর পর ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিন খুসরু শাহ খলজী বংশের

সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাসিরউদ্দিন ছিলেন গুজরাটের একজন নিম্নবংশোদ্ভূত মুসলমান তিনি মুবারক শাহের আমলে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রভুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। সিংহাসনে বসেই তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের উপহার ও উচ্চপদ বিতরণ করেন। যে সমস্ত মালিক ও আমীর তাঁর রাজক্ষমতা দখলের বিরোধিতা করেছিল তাদেরকে অর্থ দিয়ে বশীভূত করতে গিয়ে এবং খেয়ালখুশিমত ব্যয় করে নাসিরউদ্দিন অত্যন্ত অল্পদিনের মধ্যেই রাজকোষ শূন্য করে ফেলেন। তিনি মৃত সুলতানের পরিবারের লোকজন ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অনেককেই নির্মমভাবে হত্যা করে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেন। তাঁর আচরণে দরবারের প্রভাবশালী আলাই অভিজাতগোষ্ঠী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। তাদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে গাজী মালিক (পরবর্তীকালে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক) দিল্লীতে এক যুদ্ধে নাসিরউদ্দিনকে পরাজিত ক'রে নতুন তুঘলক শাসনের সূচনা করেন। অবিলম্বে নাসিরউদ্দিনের শিরশ্ছেদ করা হলে (১৩২০ খ্রীঃ) তাঁর স্বল্পস্থায়ী অগৌরবময় শাসনের উপর যবনিকা পড়ে।

নাসিরউদ্দিন মামুদ

[শাসনকাল ১২৪৬-১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দ]

দাস বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মামুদ ১২৪৬ খ্রীঃ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ। সম্রাট হয়েও তিনি যে ধরনের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন তা আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। শাসনকার্য পরিচালনায় তাঁর বিশেষ মনোযোগ বা দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না। নাসিরউদ্দিনের সময়ে চল্লিশ বান্দাচক্রের প্রধান গিয়াসউদ্দিন বলবন সুলতানের দুর্বলতার সুযোগে রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়ে ওঠেন। শাসনকার্য প্রকৃতপক্ষে বলবনই পরিচালনা করতে থাকেন। প্রায় কুড়ি বছর নামেমাত্র দিল্লীর সুলতান হিসাবে জীবন অতিবাহিত করার পর ১২৬৫ খ্রীঃ নাসিরউদ্দিন পরলোক গমন করেন।

নাসিরউদ্দিন মামুদ প্রথম

[শাসনকাল ১৪৪২-১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের একজন রাজা। বাংলাদেশে এক অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে ব্যাপক জনসমর্থন পেয়ে নাসিরউদ্দিন মামুদ ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে বসেন। সইফউদ্দিন হামজা শাহের দুর্বল শাসনে বাংলার সিংহাসন ইলিয়াস শাহী বংশের হাতছাড়া হয়ে যায় (১৪১০ খ্রীঃ)। সুদীর্ঘ ৩২ বছর পর নাসিরউদ্দিনের

সিংহাসনারোহণের সাথে সাথে এই বংশ পুনরায় বাংলাদেশে রাজত্ব করতে শুরু করে। নাসিরের রাজত্বকালে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ কিংবা সামরিক অভিযানের কথা জানা যায় না। তাঁর রাজত্বকালের বহুসংখ্যক শিলালিপি পাওয়া গেছে। সেগুলো থেকে মসজিদ, সেতু, সমাধিক্ষেত্র, ফটক প্রভৃতি নির্মাণের কথা জানা যায়। সুতরাং তাঁর রাজত্বকালে যে দেশে শান্তি-শৃংখলা বর্তমান ছিল তা একরকম ধরে নেওয়া চলে। নাসিরের আমলে বাংলার রাজধানী গৌড়ের গুরুত্ব ও সমৃদ্ধি বাড়ে এবং স্থাপত্যশিল্পের প্রসার ঘটে। তাঁর আমলে নির্মিত কোতোয়ালী দরওয়াজা এখনও অতীতের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে বর্তমান। আনুমানিক ১৭ বছর রাজত্ব করার পর ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিন মামুদ পরলোক গমন করেন।

নাসিরউদ্দিন মামুদ দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৪৯০-১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে বাংলার একজন হাবসী শাসক ছিলেন। নাসিরউদ্দিন মামুদ ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সইফুদ্দিনের মৃত্যুর পর বা লার সিংহাসনে বসেন। তাঁর মুদ্রা কিংবা শিলালিপির কোথাও তাঁর পিতার নাম পাওয়া যায় না। সিংহাসনে আরোহণকালে নাসিরউদ্দিন ছিলেন অল্পবয়স্ক। তাই তাঁর হয়ে অন্য ব্যক্তি রাজকার্য পরিচালনা করতেন। মামুদের আমলে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলোতে কোনো তারিখ নেই। খুব সম্ভব তিনি এক বছর সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন। এই এক বছরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছু ঘটেছিল বলে জানা যায় না। প্রাসাদরক্ষী বাহিনীর সাথে যোগসাজস স্থাপন করে সিদি বদর নামক জনৈক হাবসী গোলাম এক রাত্রিতে বালক সুলতানকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে বসেন (১৪৯১)।

নাহাপনা

[শাসনকাল ১১৯-১২৪ খ্রীষ্টাব্দ]

মহাক্ষত্রপ নাহাপনা ছিলেন পশ্চিম ভারতীয় ক্ষত্রপদের শ্রেষ্ঠ রাজা। ১১৯ থেকে ১২৪ খ্রীষ্টাব্দ তাঁর শাসনকাল বলে ধরা হয়ে থাকে। তিনি 'ক্ষত্রপ', 'মহাক্ষত্রপ', 'রাজন' প্রভৃতি খেতাব অবলম্বন করেছিলেন। নাহাপনার মুদ্রাগুলো থেকে তাঁর সাম্রাজ্যসীমা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর প্রভাব উত্তরে রাজপুতানার আজমীর থেকে দক্ষিণে মহারাষ্ট্রের নাসিক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর আমলের শিলালেখগুলোও এইসব এলাকার উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণের সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়া তিনি মালব দেশ জয় করে তাঁর সাম্রাজ্যসীমা আরও বিস্তৃত করেন। একজন

শক শাসক হয়েও তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি যথেষ্ট আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। নাহাপনার রাজত্বকালের সমৃদ্ধির প্রমাণ হল তাঁর রৌপ্য মুদ্রাগুলো। রাজত্ব কালের শেষ দিকে নাহাপনা গৌতমীপুত্রের হাতে পরাজিত ও নিহত হলে শক শাসনের অবসান ঘটে।



নিকোলাস প্রথম

[শাসনকাল ১৮২৫-১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ]

জার প্রথম নিকোলাস ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল তিরিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংকীর্ণমনা, রক্ষণশীল ও স্বৈরাচারী শাসক। তিনি স্বৈরতন্ত্রের রক্ষাকল্পে দেশের বাইরেও সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং দেশের অভ্যন্তরে যে কোনো ধরনের উদারনৈতিক ভাবধারা অবদমনের জন্য সেনাদলকে সদা প্রস্তুত রাখেন। বিদেশ থেকে যাতে কোনো উদারপন্থী মতবাদ রাশিয়ায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য নিকোলাস দর্শন ও রাজনীতি সংক্রান্ত পুস্তকের আমদানি নিষিদ্ধ করে দেন। রুশ জনগণের অন্যদেশ ভ্রমণের অধিকারকে রীতিমত সংকুচিত করা হয়, সংবাদপত্রগুলোর মুখবন্ধ করে দেওয়া হয় এবং স্বাধীনভাবে লেখা কিংবা মতামত প্রকাশের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করা হয়। সরকারী সমালোচনা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন ঘটানো হয় এবং নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। দেশে সামরিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত হয় এবং পুলিশদের হাতে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করার ঢালাও অধিকার দেওয়া হয়। জনগণের মন থেকে রাজনৈতিক চেতনাকে মুছে ফেলার জন্য রুশ সাহিত্য পাঠে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং পশ্চিমী দেশগুলোর উদার ভাবধারার প্রভাবকে অস্বীকার করার জন্য স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জার প্রথম নিকোলাসের আমলে বাস্তবিকই সমগ্র রুশদেশ এক সামরিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। এই রকম অস্বস্তিকর, অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে আসে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রুশবাহিনীর পরাজয়ের খবর। এটা ছিল পশ্চিমের উদার-তন্ত্রের কাছে রুশ স্বৈরতন্ত্রের পরাজয়। ইতিমধ্যে অসৎ রাজকর্মচারীরা রাজকোষ শূন্য

করে ফেলেছিল। রুশ জনগণ এই অস্বস্তকর, দমি আটকানো পরিস্থিতির হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে অবশেষে আন্দোলন শুরু করে। এই সময় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জার প্রথম নিকোলাসের মৃত্যু হলে রুশ জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।



নিকোলাস দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৮৯৪-১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ]

পিতা জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় নিকোলাস রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন (১৮৯৪)। পিতার মত তিনিও ছিলেন একজন স্বৈরাচারী শাসক এবং তাঁর অত্যাচারী শাসনে রুশ জনগণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তাঁর আমলে বহু মানুষকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছিল। সেই সময় রাশিয়ায় ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিলনা এবং সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দলগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হত। দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে রাশিয়া প্রকৃতপক্ষে একটি অত্যাচারী পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। জার দ্বিতীয় নিকো-লাসের শাসনকার্য পরিচালনার কোনো যোগ্যতা ছিলনা। তাঁর ব্যক্তিত্বও বিশেষ ছিলনা। তিনি তাঁর রানী ও রাসপুটিন নামে এক ভণ্ড, প্রতারক সন্ন্যাসীর পরামর্শে চলতেন। ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় ঘটলে (১৯০৪-৫) দ্বিতীয় নিকোলাস জনগণের কাছে আরও অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে নিকোলাস জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত্রিশক্তি আঁতাতে যোগ দিয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করলে তাঁর বিরুদ্ধে রুশ জনগণের অসন্তোষ ও অভিযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। জারতন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগে রাশিয়ায় বলশেভিক, মেনশেভিক প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি লেলিন, ট্রটস্কি. স্ট্যালিন প্রভৃতি নেতার পরিচালনায় যথেষ্ট সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ পেট্রোগ্রাড শহরে জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে বলশেভিক দল জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন করে। জার দ্বিতীয় নিকোলাস বাধ্য হয়ে ডুমা

বা জাতীয় প্রতিনিধিসভার হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিলে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের পতন হয় এবং কেরেনস্কি'র নেতৃত্বে এক অস্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। অবশেষে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি রাশিয়ায় এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন করে। রাশিয়ার ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা হয়।



নীরো

[শাসনকাল ৫৪-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ]

কুখ্যাত রোমান সম্রাট নীরো ৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রোমের রাজা হন। তিনি তাঁর মা অগ্রিপ্পিনার সহায়তায় পূর্ববর্তী সম্রাট ক্লডিয়াসের আইনতঃ উত্তরাধিকারী ব্রিটানিকাসকে বঞ্চিত করে নিজে রাজসিংহাসনে বসেন। নীরো ছিলেন যীশুখ্রীষ্ট ও সন্ত-পলের সমসাময়িক। নীরো দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত ছিলেন এবং তাঁর স্বভাবটাও ছিল অদ্ভুত। হিংস্র আচরণের মাধ্যমে তিনি স্বর্গসুখ অনুভব করতেন। নীরো নিজেকে গ্রীক দেবতা এপোলো বলে মনে করতেন এবং মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতেন। যে সব উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে তিনি অপছন্দ করতেন তাদের একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতেন। এইভাবে সম্রাট হবার পর পথের কণ্টক দূর করার জন্য তিনি অসংখ্য ব্যক্তিকে হত্যা করেন। একবার রোম নগরীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়। শোনা যায় এই অগ্নিকাণ্ড নীরোই বাধিয়েছিলেন। অগ্নিকাণ্ডে যখন নগরবাসী বিষয়-সম্পত্তি ও প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে ব্যতিব্যস্ত সেই সময় নীরো এক পাহাড়ের চূড়ায় বসে খোসমেজাজে বেহালা বাজাতে থাকেন। নীরোর এক উপপত্নী পপিয়া স্যাবাইনা নীরোর নিজের মা'র বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার এক মিথ্যা অভিযোগ আনেন। নীরো উপপত্নীর কথায় বিশ্বাস করে তাঁর মাকে গলা টিপে হত্যা করার আদেশ দেন ৫৯ খৃঃ) এবং এই ঘটনার পর হঠাৎ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি তাঁর গর্ভিনী উপপত্নী স্যাবাইনাকে পদাঘাতে হত্যা করেন। চোদ্দ বছর অত্যন্ত শয়তানসুলভ ভাবে রাজত্ব চালাবার পর রোমান সেনেট নীরোর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে। এই দণ্ডাদেশ কার্যকর হবার আগেই নীরো তয়োয়াল দিয়ে নিজের জীবনের অবসান ঘটান। নীরো সঙ্গীতের খুব অনুরাগী ছিলেন বলে জানা যায়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আক্ষেপের সুরে মন্তব্য করেন: "হায়, কি পরিতাপের বিষয়, এমন একজন শিল্পীকে এভাবে মরতে হচ্ছে!"



নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বা নেপোলিয়ন প্রথম

[শাসনকাল ১৭৯৯-১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ]

বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যজয়ী বীরপুরুষ ও প্রতিভাবান শাসকদের একজন। এই অনন্যসাধারণ মানুষটিকে আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সীজার, হানিবল, শার্লেমান প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীরদের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র বিজেতা হিসাবেই নয়, একজন দক্ষ শাসক ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হিসাবে সম্রাট নেপোলিয়ন বিশ্ববাসীর হৃদয়ে এক বিশেষ স্থানলাভের অধিকারী। বাস্তবিকই নেপোলিয়নের ঘটনাবহুল জীবন ঐতিহাসিক ও জীবনীকারদের কাছে এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয় এবং নেপোলিয়নকে নিয়ে সমগ্র বিশ্বে আজ পর্যন্ত যত বই প্রকাশিত হয়েছে, ইতিহাসের আর কোনো সম্রাট বা রাষ্ট্রনায়কের জীবন নিয়ে তার অর্ধেকও রচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ! নেপোলিয়নের বহুমখী ব্যক্তিত্ব আমাদের মুগ্ধ না ক'রে পারেনা। আধুনিক যুগের ইতিহাসে তিনি এক উজ্জ্বল ও অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। বহু অসাধারণ দোষ ও গুণের এক আশ্চর্য সমন্বয় তাঁর চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে তিনি নিজেই একবার মন্তব্য করে-ছিলেন যে তাঁর জীবনটা যথার্থই এক রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মত। অপরিসীম ছিল তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিশ্ববিজয়ী হবার দুর্লভ সম্মান অর্জন ছিল তাঁর জীবনের প্রধান স্বপ্ন এবং রাজ্যজয় ও সাম্রাজ্যবিস্তার ছিল তাঁর কাছে নেশার মত। ফরাসী জনগণের ভালবাসা ও ঘৃণা উভয়ই তিনি লাভ করেছেন চরম মাত্রায়. সমগ্র ইউরোপ একসময় তাঁর ভয়ে ছিল কম্পমান। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে শেষ জীবন তাঁর কেটেছিল বন্দী অবস্থায় অত্যন্ত নিঃসঙ্গ, অসহায়ভাবে।

ঐতিহাসিক রেড্ডাওয়ে মন্তব্য করেছেন যে ১৭৯৯ থেকে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস মূলতঃ ফ্রান্সের ইতিহাস, আর ফ্রান্সের ইতিহাস হল নেপো-লিয়ন বোনাপার্টের জীবনী। এই পর্বে ইউরোপের ইতিহাস প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটির দ্বারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল যে ঐতিহাসিকেরা এই সময়টাকে 'নেপো-লিয়নের যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন। 'নেপোলিয়নের যুগ'কে মোটামুটিভাবে তিনটি

পর্বে ভাগ করা যায়ঃ (ক) ১৭৯৯-১৮০২ কনসালেটের শাসন ; (খ) ১৮০২-১৮০৪ প্রথম কনসালের শাসন। এই সময় নেপোলিয়ন চিরজীবনের জন্য প্রথম কনসালপদে অধিষ্ঠিত হন এবং প্রজাতান্ত্রিক শাসন-কাঠামোর আড়ালে সম্পূর্ণ তাঁর একনায়কতন্ত্র কায়েম করেন ; (গ) ১৮০৪-১৮১৪ সম্রাটের শাসন। এই পর্বে নেপোলিয়ন একের পর এক দেশজয়ের মাধ্যমে ইউরোপের এক বিশাল অংশ ফ্রান্সের হস্তগত করেন এবং সেইসঙ্গে ফরাসী-বিপ্লবের ভাবধারাও সেইসব অধিকৃত দেশে প্রসারলাভ করে। নেপোলিয়ন পনের-ষোল বছরের মধ্যেই ইউরোপের ইতিহাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন।

বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো একবার মন্তব্য করেছিলেন যে ক্ষুদ্র দ্বীপ কর্সিকা একদিন গোটা ইউরোপকে বিস্মিত করবে। রুশোর এই ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্যজনকভাবে সফল হয়ে ওঠে যখন কয়েক বছর পরই ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের পনেরই আগস্ট ফরাসী অধিকৃত কর্সিকার রাজধানী অ্যাজাকিও নামক স্থানে ভূমিষ্ঠ হয় নেপোলিয়ন নামে এক শিশু। তাঁর প্রবলতম সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইংলণ্ডের ডিউক অব্ ওয়েলিংটনও ঘটনাচক্রে ঐ একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নেপোলিয়নের পিতার নাম ছিল কার্লো বোনাপার্ট ও মাতার নাম লেটিজিয়া। তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষের আভিজাত্য তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হ'ত যদিও সেই সময় তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিলনা। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন ইতালীয়। তিনি জন্মসূত্রে ছিলেন কর্সিকান এবং পরবর্তীকালে ঘটনাচক্রে ফ্রান্সের ভাগ্যবিধাতায় পরিণত হন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন যখন ডাইরেক্টরীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে ফ্রান্সের অধীশ্বর হয়ে বসেন তখন তাঁর বয়স তিরিশ বছর। ছোটবেলা থেকেই নেপোলিয়ন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং প্রথম জীবনে ফ্রান্সের অধীনতাপাশ থেকে মাতৃভূমি কর্সিকাকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখতেন। পরবর্তীকালে ফ্রান্সের ইতিহাসের সাথে তাঁর ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাওয়ায় তাঁর এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে।

নেপোলিয়ন প্রথমে ফ্রান্সের এক সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ক'রে সাব-লেফ্‌টেন্যান্টের পদে অধিষ্ঠিত হন। তারপর একজন সামরিক অফিসার হিসাবে ন্যাশনাল কনভেনশনের আমলে তিনি তাঁর সামরিক প্রতিভার পরিচয় রাখেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অসাধারণ সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তুলঁ বন্দর থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের উন্মত্ত জনতার হাত থেকে তিনি ডাইরেক্টরীকে রক্ষা করেন। তিনি জ্যাকোবিন দলের সমর্থকে পরিণত হয়ে শীঘ্রই ব্রিগেডিয়ারের পদে উন্নীত হন। তিনি এইসময় ফ্রান্সের অভিজাত সমাজে মেলামেশা শুরু করেন এবং জোসেফাইন বুহার্নে'স নামক এক বিধবা অভিজাত মহিলাকে বিবাহ করেন। পরবর্তীকালে তিনি জোসেফাইনের সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে অস্ট্রিয়ার রাজকন্যা মেরি

লুইজাকে বিবাহ করেছিলেন। ডাইরেক্টরীর প্রতিরক্ষামন্ত্রী কার্ণো নেপোলিয়নকে ইতালী অভিযানের নেতৃত্বপদ প্রদান করলে নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম একজন প্রতিভাবান জেনারেল হিসাবে ইউরোপবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইতালী অভি-যানের সাফল্যই তাঁর পরবর্তী জীবনের শুভ সূচনা বলা চলে। নেপালিয়ন ঝটিকা অভিযান চালিয়ে ইতালীকে পরাজিত করেন এবং ক্যাম্পো ফর্মিওর চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। এই ঘটনার পর তিনি রাতারাতি ফ্রান্সে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ও জাতীয় বীরের মর্যাদালাভ করেন। ডাইরেক্টরী তাঁর সাফল্যে ভীত হয়ে তাঁকে পুনরায় মিশর অভিযানে প্রেরণ করে। কিন্তু নীলনদের যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি নেলসনের হাতে ফরাসী নৌবহরগুলোর শোচনীয় পরিণতি ঘটলে নেপোলিয়ন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে ডাইরেক্টরীর কুশাসনে জনসাধারণ রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। নেপোলিয়ন ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করলে জনগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তিনি এই সুযোগে ডাইরেক্টরীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশে কনসালেটের শাসন প্রবর্তন করেন (১৭৯৯)। ১৭৯৯ থেকে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কনসালেটের শাসন স্থায়ী হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় তিনজন কনসালের হাতে ফ্রান্সের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। নেপোলিয়ন ছিলেন প্রথম কনসাল এবং কার্যতঃ তিনিই ছিলেন সকল ক্ষমতার অধিকারী ফ্রান্সের প্রকৃত শাসনকর্তা। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন কনসালেটের অবসান ঘটিয়ে নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন। এইভাবে বিপ্লবোত্তর কালে ফ্রান্সে পুনরায় রাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করার পূর্ব পর্যন্ত (এলবা দ্বীপে নির্বাসিত জীবন কাটানোর সময়টুকু ছাড়া) এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন নেপোলিয়ন মিশর অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন সেইসময় ইংলণ্ড অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সহযোগিতায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিসংঘ গঠন ক'রে। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে নেপোলিয়ন ম্যারেঙ্গো ও হোহেনলিণ্ডেনের যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করেন এবং অস্ট্রিয়াকে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে লুনেভিলের সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। অতঃপর নেপোলিয়নের সাথে ইংলণ্ডের আমিয়েন্সের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (১৮০২)। কিন্তু এই চুক্তির মেয়াদ ছিল নিতান্তই সাময়িক। বরং বলা চলে এই চুক্তি উভয় পক্ষকে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার সময় ও সুযোগ দান করেছিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দেই আমিয়েন্সের চুক্তিভঙ্গ হয় এবং এইসময় নেপোলিয়ন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম ক'রে ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য জোর প্রস্তুতি চালাতে থাকেন। ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট্‌ও পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তৃতীয় শক্তিজোট গঠন করেন। নেপোলিয়ন এই শক্তিজোট ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে পুনরায়

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ঝটিকা অভিযান চালিয়ে উল্‌ম্‌ এর যুদ্ধে অস্ট্রিয় বাহিনীকে পরাস্ত করেন (১৮০৫)। কিন্তু এই সময় ট্রাফালগারের বিখ্যাত নৌযুদ্ধে ইংরাজ এ্যাডমিরাল নেলসনের হাতে ফ্রান্সের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। নেপোলিয়ন অবশ্য স্থলযুদ্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হন। তিনি অস্টারলিজের যুদ্ধে (১৮০৫) অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সম্মিলিত বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেন। অস্ট্রিয়া তৃতীয় শক্তিজোট থেকে সরে আসতে এবং ফ্রান্সের সাথে প্রেসবার্গের সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হয়। তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়ামের নেতৃত্বে প্রাশিয়া শক্তিজোটে যোগদান করলে নেপোলিয়ন জেনার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রুশিয় বাহিনীকে পরাজিত ক'রে বার্লিন অধিকার করে নেন। এরপর নেপোলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে ফ্রিডল্যাণ্ডের যুদ্ধে (১৮০৭) জয়লাভ করেন। জার প্রথম আলেকজাণ্ডার বাধ্য হয়ে নেপোলিয়নের সাথে টিলজিটের সন্ধি স্থাপন করেন। টিলজিটের সন্ধির সময় নেপোলিয়নের ভাগ্যরবি মধ্যগগনে আরোহণ করে। বাস্তবিকই এই সময় নেপোলিয়ন ক্ষমতা, যশ, সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রভৃতি সবদিক দিয়েই ভাগ্যের চরম শিখরে উপনীত হন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই আস্তে আস্তে তাঁর ভাগ্যরবি অস্তাচলের পথ ধরে। নেপোলিয়নের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও অপরিসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরবর্তীকালে তাঁর পতনের পথ প্রস্তুত করে। মানুষের শক্তিরও যে একটা সীমা আছে সেকথা ক্রমাগত সাফল্য অর্জনের ফলে নেপোলিয়ন ভুলতে বসেছিলেন। 'অসম্ভব' শব্দটা একমাত্র মূর্খদের অভিধানেই পাওয়া যায়—এরকম মন্তব্য তাঁর মুখ থেকেই শোনা গিয়েছিল।

নেপোলিয়ন জানতেন প্রধান শত্রু ইংলণ্ডের শক্তি চূর্ণ করার পথে প্রবল অন্তরায় তার নৌশক্তি। নৌবলে বিশ্বশ্রেষ্ঠ হবার জন্যই জগৎজোড়া সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবার কৃতিত্ব ইংলণ্ড অর্জন করতে পেরেছে। তাই তিনি 'দোকানদারের জাত'কে (নেপোলিয়ন এই নামে ইংলণ্ডকে সম্বোধন করতেন) অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পঙ্গু করবার উদ্দেশ্যে এক নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যা ইতিহাসে 'কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম' বা 'মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা' নামে পরিচিত। তিনি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে ইংলণ্ডের বাণিজ্য বন্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বার্লিন ডিক্রি' ও 'মিলান ডিক্রি'র মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, কোনো দেশের জাহাজ ইংলণ্ডের সাথে বাণিজ্যে লিপ্ত হ'লে সেই জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইংলণ্ডও এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসাবে 'অর্ডারস ইন কাউন্সিল' নামে এক ঘোষণা জারি করে। ইউরোপের প্রায় সব দেশই ছিল বাণিজ্যিক দিক দিয়ে ইংলণ্ডের উপর কমবেশি নির্ভরশীল। ফলে নেপোলিয়নের এই ব্যবস্থা গ্রহণে অনেক রাষ্ট্রই তা মানতে অস্বীকৃত হয়। স্বয়ং পোপ এবং ইংল্যাণ্ড, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি রাষ্ট্র নেপোলিয়নের এই নীতিকে অস্বীকার করলে নেপোলিয়ন একে একে এদের বিরুদ্ধে

সামরিক অভিযান শুরু করেন। নেপোলিয়ন পোপের রাজ্য আক্রমণ ক'রে রোম জয় ক'রে নেন এবং পোপকে বন্দী করেন। তিনি স্পেন ও পর্তুগাল জয় করে নেন এবং স্পেনের সিংহাসনে তাঁর ভ্রাতা যোসেফকে স্থাপন করেন। কিন্তু স্পেন ও পর্তুগাল ইংলণ্ডের সহায়তায় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে এক মরণপণ সংগ্রাম শুরু করে যা ইতিহাসে 'পেনিনসুলার যুদ্ধ' নামে খ্যাত। এই যুদ্ধে নেপোলিয়নের সামরিক ও আর্থিক শক্তি অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সেণ্ট হেলেনায় নির্বাসিত থাকাকালীন নেপোলিয়ন স্বীকার করেন যে প্রধানতঃ 'স্পেনের ক্ষত'ই তাঁর পতনের জন্য দায়ী ছিল।

এদিকে রাশিয়ার জার টিলজিটের সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ ক'রে ইংলণ্ডের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করায় নেপোলিয়ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কয়েক লক্ষ্য সৈন্য নিয়ে মস্কো পর্যন্ত অভিযান করেন (১৮১২)। কিন্তু দুর্দান্ত শীতের প্রকোপ ও কসাক বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীর এক বিশাল অংশ রাশিয়ায় প্রাণ হারায়। নেপোলিয়ন মাত্র পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে অতিকষ্টে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। নেপোলিয়নের রুশদেশ অভিযানের ব্যর্থতায় আশান্বিত হয়ে অস্ট্রিয়া, সুইডেন, প্রাশিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলো রাশিয়ার সাথে সম্মিলিতভাবে নেপোলিয়নকে চূড়ান্ত আঘাতদানের জন্য প্রস্তুত হয় এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চতুর্থ শক্তিসংঘ গঠন করে। লিপ্‌জিগ্‌ নামক স্থানে নেপোলিয়ন একা ইউরোপের সম্মিলিত বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে পরাজয় বরণ করেন (১৮১৩ খ্রীঃ)। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। ইউরোপীয় রাষ্ট্রপ্রধানগণ নেপোলিয়নকে এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত করেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে এসে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। এল্‌বা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর নেপোলিয়ন ঠিক 'একশো দিন 'রাজত্ব করার সুযোগ পান। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ওয়াটালুর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংলণ্ড ও প্রাশিয়ার মিলিত বাহিনীর কাছে পরাজয় বরণ ক'রে তাঁকে পুনরায় সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হতে হয়। সেখানকার অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছয় বছর অতিবাহিত করার পর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ৫২ বছর বয়সে নেপোলিয়নের জীবনাবসান হয়।

শুধুমাত্র সামরিক প্রতিভার দিক দিয়েই নয়, একজন অত্যন্ত উচ্চস্তরের শাসক হিসাবেও নেপোলিয়ন বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর শাসন সংস্কারের দ্বারা শুধু ফ্রান্সই নয়, সমগ্র ইউরোপ উপকৃত হয়েছিল। রেম্ভাওয়ে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে ইউরোপের যেখানেই নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করেছে, সেখানেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ ক'রে তাঁর প্রবর্তিত 'লিজিয়ন অব্‌ অনার', বংশ গরিমার পরিবর্তে যোগ্যতা অনুযায়ী উচ্চপদ প্রদান, আইন সমূহের সংকলন (কোড নেপোলিয়ন) এবং নানাবিধ শিক্ষা সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক সংস্কার তাঁকে শাসক হিসাবে ইতিহাসে অমর

ক'রে রেখেছে। ঐতিহাসিক ফিশারের কথার প্রতিধ্বনি করে বলা চলে যে নেপোলিয়নের রাজ্যজয় স্থায়ী না হলেও তাঁর শাসন সংস্কারগুলো ইতিহাসে স্থায়ী প্রভাব রাখতে সমর্থ হয়েছে।

নেপোলিয়ন দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ]

বিখ্যাত ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বা প্রথম নেপোলিয়নের পুত্র। বোনাপার্টের দ্বিতীয় মহিষী অস্ট্রিয় রাজকন্যা মেরি লুইজা'র গর্ভজাত সন্তান দ্বিতীয় নেপোলিয়ন ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে রোমের রাজা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের তীব্র আপত্তির ফলে তাঁকে রাজপদ পরিত্যাগ করে একটি ক্ষুদ্র এলাকার ডিউক হিসাবেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। দ্বিতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন রুগ্ন ও স্বল্পায়ু। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।



নেপোলিয়ন তৃতীয়

[শাসনকাল ১৮৪৮-১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের
কনিষ্ঠ ভ্রাতা লুই বোনাপার্টের পুত্র লুই নেপোলিয়ন নামধারণ ক'রে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টপদে অধিষ্ঠিত হন। অল্পবয়স থেকেই তিনি নিজেকে ফ্রান্সের
সিংহাসনের যোগ্য দাবিদার বলে মনে করতেন এবং ১৮৩৬ ও ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী
সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর উভয়
প্রয়াসই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। প্রথমবার তাঁকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত
করা হয় এবং দ্বিতীয়বার তাঁকে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে একটি দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়।
ছয় বছর পর তিনি দুর্গ থেকে পলায়ন ক'রে ইংলণ্ডে আশ্রয় নেন এবং ১৮৪৮
খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। লুই ফিলিপের পতনের পর

তিনি নির্বাচনে জয়লাভ ক'রে ফ্রান্সে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ অধিকার করেন (১৮৪৮)। কয়েক বছরের মধ্যেই লুই নেপোলিয়ন প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বিপুল জনসমর্থন পেয়ে তিনি প্রজাতন্ত্রের স্থলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৃতীয় নেপোলিয়ন উপাধি ধারণ করেন। তিনি ফরাসী জনগণের কাছে প্রথম নেপোলিয়নের গৌরবময় যুগকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি ফরাসী জনগণকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেও বহু কল্যাণকর শাসন সংস্কারের দ্বারা জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের চেষ্টা করেন। তিনি একদিকে যেমন দেশের অভ্যন্তরে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিলোপ সাধন ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেন, তেমনি অপরদিকে দেশের সর্বত্র হাসপাতাল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা প্রভৃতি স্থাপন, কৃষিকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যহ্রাস, বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা তাঁর শাসনকে প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারে পরিণত করেন।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রথম নেপোলিয়নের রাজত্বকালের মত ফ্রান্সকে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখতেন। ফ্রান্সের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তিনি এক বলিষ্ঠ ও আগ্রাসী বৈদেশিক নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথম দিকে তৃতীয় নেপোলিয়ন বেশ সাফল্য অর্জন করতে থাকেন। তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ডের সাথে যোগ দিয়ে জয়ী হন। এ ছাড়া তিনি ফরাসী সৈন্যের সাহায্যে পোপকে রোমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইতালীর ঐক্য আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে পিড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ার প্রধান-মন্ত্রী কাভুরের সাথে প্লমবিয়ার্সের চুক্তি (১৮৫৮) সম্পাদন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর পররাষ্ট্রনীতি ক্রমশঃই চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে থাকে। তিনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন ক'রে রাশিয়ার জারের বিরাগভাজন হন। মেক্সিকোতে এক গৃহযুদ্ধের সুযোগে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাতে লিপ্ত হবার চেষ্টা করলে 'মনরো নীতি'র চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত অসম্মানজনকভাবে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হন। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানী ঐক্যসাধনে সচেষ্ট হলে তৃতীয় নেপোলিয়ন নিরপেক্ষ থেকে খুবই রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। স্যাডোয়ার যুদ্ধের পূর্বে বিসমার্কের কূটনীতির কাছে তিনি শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করেন এবং যুদ্ধ চলাকালীন নিরপেক্ষ থেকে নিজের বিপদ ডেকে আনেন। এই ঘটনার চার বছর পর সেডানের যুদ্ধক্ষেত্রে (১৮৭০) বিসমার্কের হাতে পরাজয় বরণের মধ্য দিয়ে তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালের অবসান ঘটে। ফরাসী

জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করলে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং 'তৃতীয় প্রজাতন্ত্র'সেই স্থান লাভ করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন লুই নেপোলিয়নের ধ্যান-জ্ঞান-আদর্শস্বরূপ। লুই বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষতঃ বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তাঁকে অনুকরণের চেষ্টা করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর পূর্বসূরীর বহুমুখী প্রতিভা ও বিস্ময়কর সামরিক ক্ষমতার আংশিক অধিকারীও তিনি ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাই ভিক্টর হুগো তাঁকে যথার্থই 'ক্ষুদে নেপোলিয়ন' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নেবুকাডনেজার প্রথম

[শাসনকাল ১১২৪-১১০৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন ব্যাবিলনের রাজা ছিলেন। প্রথম নেবুকাডনেজার ১১২৪ থেকে ১১০৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে রাজত্ব করতেন। দ্বিতীয় নেবুকাডনেজারের মত অতখানি বিখ্যাত না হলেও তিনি একজন শক্তিশালী ও যোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি এলাম জয় করেন এবং প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার (বর্তমান ইরাক) অধিকাংশ অঞ্চলকে তাঁর শাসনাধীনে আনতে সক্ষম হন।

নেবুকাডনেজার দ্বিতীয়

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী]

প্রাচীন ব্যাবিলনের একজন শক্তিশালী ও খ্যাতিমান শাসক ছিলেন। খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি ব্যাবিলনে রাজত্ব করতেন। দ্বিতীয় নেবুকাডনেজার ছিলেন প্রাচীন ব্যাবিলনের ইতিহাসে একজন স্মরণীয় সম্রাট। তাঁর আমলে ব্যাবিলনের সামরিক শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তিনি সামরিক অভিযান ও যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে তাঁর সাম্রাজ্যসীমাকে বিস্তৃত করেছিলেন। দ্বিতীয় নেবুকাডনেজারের আমলে ব্যাবিলনের উল্লেখযোগ্য আভ্যন্তরীণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তিনি প্রশস্ত পথ-ঘাট, বড় বড় অট্টালিকা, মন্দির, প্রাসাদ, প্রভৃতি নির্মাণের মাধ্যমে ব্যাবিলন শহরটিকে নতুনভাবে গড়ে তোলেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটান। মিশর, প্যালেস্টাইন, এশিয়া মাইনর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানের সাথে সেইসময় ব্যাবিলনের রীতিমত বাণিজ্যিক লেনদেন চলত। তিনি ইউফ্রেটিস নদীতে নৌ চলাচলেরও সুবন্দোবস্ত করেন।

নেবুকাডনেজার যে একজন অত্যন্ত উঁচুদরের নির্মাতা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মূলত নির্মাতা হিসাবেই তিনি ইতিহাসে চির-প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন।

তাঁর সুন্দরী রানী মিডিয়া রাজ্যের অ্যামাইটিসের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর প্রাসাদে এক অতীব মনোরম ভাসমান উদ্যান রচনা করেন যা দেখে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বিস্মিত হয়েছিলেন। হেরোডোটাস তাঁর লেখায় একে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য বলে উল্লেখ করেছেন।

পরান্তক প্রথম

[শাসনকাল ৯০৭-৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ]

দক্ষিণ ভারতের চোল বংশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী চোল শাসক আদিত্যের মৃত্যুর পর ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে চোল সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দীর্ঘকাল রাজকার্য পরিচালনা করেন। প্রথম পরান্তক একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি পাণ্ড্য রাজা রাজসিংহ ও সিংহলরাজের সম্মিলিত বাহিনীকে যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। তিনি পাণ্ড্যরাজ্য, মাদুরা প্রভৃতি জয় করেন এবং বল্লাল নামক স্থানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর রাষ্ট্রকূট রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণকে পরাজিত ক'রে চোলবংশকে দক্ষিণ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। প্রথম পরান্তক ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

পলিক্রেটস

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী]

পলিক্রেটস ছিলেন প্রাচীন সামোসের একজন স্বৈরাচারী শাসক। তিনি প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সাইরাসের পুত্র ক্যাম্বিসিসের সমসাময়িক ছিলেন। পলিক্রেটস একজন রীতিমত শক্তিশালী শাসক ছিলেন এবং তাঁর সামরিক শক্তিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো সমীহ করে চলত। পলিক্রেটস তাঁর নৌ শক্তির সাহায্যে গ্রীক সমুদ্রগুলোর উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন। তিনি পারস্যের শক্তিকে উপেক্ষা করেন এবং স্পার্টা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলে দৃঢ়হস্তে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। কিন্তু পলিক্রেটসের পরিণতি শুভ হয়নি। পারস্যের সাথে তাঁর সম্পর্ক আদৌ ভাল ছিল না। পারস্যরাজের নিপুণ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পলিক্রেটস বন্দী হন এবং তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

পারসিয়াস

[শাসনকাল ১৭৮-১৬৮খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ম্যাসিডনের রাজা ছিলেন। পিতা চতুর্থ ফিলিপের মৃত্যুর পর ১৭৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পারসিয়াস সিংহাসনে বসেন এবং মোট দশ বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন। পিতার আমলে হাতছাড়া হওয়া গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলোর

পনর্দখল ও পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পারসিয়াস রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালান। কিন্তু পাইডনার যুদ্ধে (১৬৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) পরাজিত হলে ম্যাসিডনের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। তিনি ছিলেন ম্যাসিডনের শেষ স্বাধীন শাসক। এরপর রোমানরা ম্যাসিডনকে চারটি পৃথক এলাকায় বিভক্ত করে নেয় এবং ম্যাসিডন রোমের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।



পিটার দি গ্রেট

[শাসনকাল ১৬৮২-১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ]

রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন পিটার দি গ্রেট। তাঁর আমলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দুর্বল রাশিয়া ইউরোপের এক অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পিটার ছিলেন একজন মস্ত বড় সমরনায়ক ও সংগঠক। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি রুশদেশের এক উল্লেখযোগ্য আভ্যন্তরীণ উন্নতি ঘটান। রুশ জনগণের জীবনযাত্রার মান তাঁর সময়ে যথেষ্ট উন্নীত হয়। সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লসের বিরুদ্ধে পোল্টাভা নামক স্থানে এক যুদ্ধে জয়ী হয়ে পিটার সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়ার সম্মান ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে রাশিয়া উত্তর ইউরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত হয়। প্রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলো রুশ সামরিক শক্তির প্রভাব উপলব্ধি করে এবং শীঘ্রই তাঁর মিত্ররাজ্যে পরিণত হয়। পিটার বহু স্থান ও দুর্গ রাশিয়ার জন্য জয় করেন। কিন্তু একজন সাম্রাজ্যজয়ী বীর যোদ্ধা হিসাবেই পিটারের পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়, তিনি একজন প্রজাদরদী দক্ষ প্রশাসকও ছিলেন। প্রজাকল্যাণ ছিল তাঁর বিশেষ লক্ষ্য এবং তাঁর আমলে বাস্তবিকই বহু সংস্কারকর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল যেগুলো জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ঘটায় ও তাঁদের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করে। পিটার স্ত্রীলোক-দের বেশ কিছু স্বাধীনতা দেন। তিনি রুশ জনগণকে প্রাচ্যদেশীয় পোশাক ছেড়ে ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করতে বলেন। তিনি জনগণকে দাড়ি রাখতে নিষেধ করেন। সেই সময় পর্যন্ত সেপ্টেম্বর মাস থেকে রুশ বছর শুরু হত; পিটার তা পরিবর্তিত করে জানুয়ারী করেন। তিনি প্রচলিত ধর্মীয় আচার-আচরণের ক্ষেত্রে বেশ

কিছু সংস্কার প্রবর্তন করেন। পিটার রাশিয়ার জন্য যা করেন, সত্যি বলতে, রাশিয়ার খুব কম শাসকই তা করেছেন। পিটারের রাজত্বকালের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপে রাশিয়ার কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সময়ে রাশিয়া ইউরোপের এক অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হয় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো একে বন্ধু হিসাবে পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আধুনিক রাশিয়ার জনক তাঁকেই বলা চলে। তাঁর এই অবদানের জন্য ইতিহাসে তিনি পিটার 'দি গ্রেট' বা 'মহান' পিটার নামে পরিচিত।

পিপিন অব হেরিস্টাল

[শাসনকাল ৬৯৪-৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন ফ্রাঙ্কস বংশের একজন শক্তিশালী রাজা। হেরিস্টালের পিপিন ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করলে ফ্রাঙ্কস ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। তিনি রাজা হবার পূর্বে ফ্রাঙ্কস সাম্রাজ্য এক অরাজক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। হেরিস্টালের পিপিন ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী শাসক। তিনি সিংহাসনে বসেই অবাধ্য ও বিক্ষুব্ধ অভিজাত গোষ্ঠীকে বশীভূত করেন এবং জনগণের সমর্থন, ভালবাসা ও সহানুভূতি অর্জনে সফল হন। জনগণ সেই অরাজক পরিস্থিতিতে তাঁকে তাদের উদ্ধার কর্তা বলে মনে করল। স্যাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে পিপিন অতঃপর ফ্রাঙ্কস সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। পিপিনের নেতৃত্বে ফ্রাঙ্কস শক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটল এবং খণ্ড-বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য আবার ঐক্যবদ্ধ হল। পিপিন জার্মান গোষ্ঠীগুলোর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন এবং সমগ্র ইউরোপ জয়ের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি ৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রিসিয়ান ও সোয়াবিয়ানদের পরাজিত করেন। পিপিন খ্রীষ্টধর্মের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। শান্তিপূর্ণভাবে খ্রীষ্টধর্মের উন্নতি ও প্রসার ঘটানোর কাজে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। ৭১৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পিপিন অব্ হেরিস্টালের গৌরবময় জীবনের অবসান ঘটে।

পিপিন দি শর্ট

[শাসনকাল ৭৪১-৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন ফ্রাঙ্কস বংশের একজন রাজা। পিপিন দি শর্ট ছিলেন বিখ্যাত চার্লস মার্টেলের পুত্র। চার্লস মার্টেল মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্য তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যান। পিপিন উত্তরাধিকার সূত্রে নিউস্ট্রিয়া, বার্গাণ্ডী, প্রভেন্স প্রভৃতি অঞ্চল লাভ করেন (৭৪১)। ৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পিপিনের অপর ভ্রাতা কার্লোমান সন্ন্যাসী হয়ে গেলে তাঁর অধীনস্থ রাজ্যগুলোও পিপিনের অধিকারে আসে। তিনি পিপিন দি

শর্ট নামে পরিচিত ছিলেন। পিপিন ফ্র্যাঙ্কিসদের চিরশত্রু স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে সমরাভিযান চালিয়ে তাদের নেতা থিয়োডরিককে পরাস্ত করেন। তিনি ব্যাভারিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করলে ব্যাভারিয়াবাসী ভীত হয়ে আত্মসমর্পন করে। পিপিন ভাল ব্যবহার প্রদর্শন করে তাঁর প্রতি ভবিষ্যৎ আনুগত্যের শর্তে তাদের রাজ্য জয় করা থেকে বিরত হন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন ডিউকদেরও তিনি দমন করেন। পিপিনের রাজত্বকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, তিনি রাষ্ট্রের স্বার্থে চার্চের সম্পত্তি ও বহু জমি ব্যবহার করেন। এর ফলে স্বভাবতঃই তাঁকে এক শ্রেণীর মানুষের কাছে অনেকখানি অপ্রিয় হতে হয়েছিল। সেই সময় চার্চ ছিল বিশাল সম্পত্তি ও জমিজমার মালিক। এইভাবে চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্রের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে তিনি ক্যারোলিঞ্জিয় শাসনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর রাজত্বকালের শেষদিকে পিপিন ইউরোপীয় রাজনীতির এক অন্যতম মুখ্য চরিত্র হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা পিপিনের রাজসভায় বিশেষ দূত প্রেরণ করেন, যাঁদের মধ্যে বাগদাদের আব্বাস বংশীয় খলিফা অন্যতম। পিপিনের চরিত্রে একজন সুযোগ্য শাসকের উপযুক্ত অনেক গুণই ছিল।

পিসিট্রেটাস

[শাসনকাল ৫৬০-৫২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

পিসিট্রেটাস ৫৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শাসনক্ষমতা দখল করে এথেন্সে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববর্তী শাসক সোলোন দেশান্তরে গমন করলে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে এথেন্সে পুরানো গৃহবিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই আভ্যন্তরীণ কলহের মধ্যে পিসিট্রেটাস নামক একজন উদীয়মান তরুণঅভিজাত রাষ্ট্র ক্ষমতা স্বীয় হস্তগত করেন। তিনি নিজেকে দরিদ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করে অনেক সমর্থক সংগ্রহ করেন। পাঁচ বছর পর একশ্রেণীর জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি পূর্ব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এথেন্সে তখন আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিলাকার ধারণ করেছিল। ফলে পিসিট্রেটাসকে পুনরায় একটি রাষ্ট্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়। পরবর্তী দশ বছর তিনি থ্রেস নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর ক্ষমতা পুনরধিকারের জন্য প্রস্তুতি চালান। এরপর তিনি বহু ভাড়াটিয়া সৈন্য নিয়ে স্বদেশে ফিরে এলে তাঁর সমর্থকরাও তাঁর সাথে মিলিত হয়। পিসিট্রেটাস বিরুদ্ধপক্ষকে পরাস্ত করে তৃতীয় বারের মত দেশের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন হন। তারপর থেকে আমৃত্যু তিনি তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম হন। পিসিট্রেটাস অত্যন্ত বিচক্ষণ, দৃঢ়চেতা ও দূরদর্শী শাসক ছিলেন।

সেই পরিস্থিতিতে স্বীয় ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে গেলে ব্যাপক গণসমর্থনের প্রয়োজন একথা উপলব্ধি করে তিনি বহু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। এথেন্সবাসীর জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে তিনি নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালান। তিনি এথেন্স শহরকে বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, রাস্তাঘাট, পার্ক ও উদ্যান প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা সুশোভিত করেন। পিসিস্ট্রেটাস শিল্পকলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ডাইয়োনিসাসের সম্মানে একটি নতুন উৎসবের প্রচলন করেন। এথেন্সের নাট্যকলার পরবর্তী গৌরবময় ইতিহাসের শুভ সূচনা তিনিই করে যান। তাঁর সময়ে কৃষ্ণসাগরীয় এলাকায় এথেন্সের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি এক বৃহদাকার পাঠাগার স্থাপন করে তা জনগণের ব্যবহার্থে উৎসর্গ করেন বলে জানা যায়। পিসিস্ট্রেটাসের তেত্রিশ বছরব্যাপী শাসনকালের মূল্যায়ন করতে গিয়ে একথা বলা চলে যে সমসাময়িক গ্রীসের ইতিহাসে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ স্বৈরাচারী শাসক এবং এথেন্সের পরবর্তী গৌরবময় যুগের পথ তিনিই প্রস্তুত করেন। ৫২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পিসিস্ট্রেটাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পুরু

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী]

তক্ষশিলার রাজা অম্ভির বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকারে উৎসাহিত হয়ে আলেকজাণ্ডার পৌরব রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করেন। বর্তমান ঝিলাম, গুজরাট ও সাপুর জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল পুরুর রাজ্য। আলেকজাণ্ডার দূত মারফৎ পুরুকে বশ্যতা স্বীকার করতে বললে তিনি উত্তর দেন যে গ্রীকবীরের দর্শনলাভের নিমিত্ত তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিজ রাজ্যে অপেক্ষা করছেন। মহারাজ পুরু অসংখ্য হস্তী ও রথযুক্ত এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঝিলাম নদীর তীরে আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে এক মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হন (৩২৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)। শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত আহত অবস্থায় তিনি শত্রু সৈন্যের হাতে ধৃত হন। বন্দী পুরুকে সম্রাট আলেকজাণ্ডার প্রশ্ন করেন, তিনি বিজয়ীর কাছে কি ধরনের ব্যবহার আশা করেন। উত্তরে পুরু নির্ভীক, বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন, একজন রাজার পক্ষে উপযুক্ত ব্যবহারই তিনি আশা করেন। আলেকজাণ্ডার নিজে বীর ছিলেন। তিনি বীরের মর্যাদা দিতে জানতেন। পুরুর বীরত্ব ও অনমনীয় মনোভাব তাঁকে পূর্বেই মুগ্ধ করেছিল। তাঁর এই উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি পুরুর সাথে সন্ধি স্থাপন করেন এবং তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দেন। পুরু আসলে কোনো রাজার নাম নয়, তিনি 'পৌরব' বা পুরু' বংশের রাজা ছিলেন। আসল নাম জানা যায় না। ঝিলাম নদীর যুদ্ধ (গ্রীক লেখকদের ভাষায় হাইডাস্‌পিসের যুদ্ধ) সেই প্রাচীন যুগে পুরু রাজার অসাধারণ বীরত্বের জন্য ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

পুরুগুপ্ত

[শাসনকাল ৪৬৭-৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন ভারতের গুপ্তবংশের একজন রাজা। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পুরুগুপ্ত গুপ্ত রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মোট ছয় বছর রাজত্ব করেন। পুরুগুপ্ত বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন একজন দুর্বল শাসক। তাঁর আমলে গুপ্তবংশ সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক উভয় দিক দিয়েই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পুরুগুপ্তের স্বল্প মেয়াদী রাজত্বকালের বছরগুলো অভ্যন্তরস্থ বিরোধী শক্তিগুলোর সাথে সংগ্রামে অতিবাহিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ সিংহাসন নিয়ে গুপ্ত রাজ পরিবারের মধ্যে গৃহবিবাদ এই সময় তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং পুরুগুপ্তের সিংহাসন লাভকে অনেকেই সুনজরে দেখেনি। স্বভাবত:ই এই অন্তর্দ্বন্দ্বে গুপ্ত শাসনের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। পুরুগুপ্তের আমলের কোনো রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়নি। পশ্চিম ভারতে এই মুদ্রার প্রচলন খুব বেশি ছিল। সুতরাং কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে পুরুগুপ্তের আমলে পশ্চিম ভারতের উপর গুপ্ত শাসন শিথিল হয়ে পড়েছিল। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পুরুগুপ্তের মৃত্যু হয়।

পুলকেশী প্রথম

[শাসনকাল ৫৩৫-৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দ]

বাতাপীর চালুক্যবংশের একজন রাজা। প্রথম পুলকেশী ছিলেন এই বংশের তৃতীয় রাজা। ৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চালুক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সুদীর্ঘ তিরিশ বছরেরও অধিককাল রাজত্ব করার পর তাঁর মৃত্যু হয়। প্রথম পুলকেশীকে চালুক্য বংশের প্রথম সফল ও উল্লেখযোগ্য শাসক বলা যায় তাঁর আমলে চালুক্যরা বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করে মহারাজা উপাধি ধারণ করেন। ৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পুলকেশী পরলোকগমন করেন।

পুলকেশী দ্বিতীয়

[শাসনকাল ৬১০-৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বিতীয় পুলকেশী ছিলেন পশ্চিম চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ৬১০ খ্রীঃ থেকে ৬৪২ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রথম জীবনে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তাঁকে অবিরাম সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তিনি গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে স্বীয় পিতৃব্যকে পরাস্ত করে চালুক্য সিংহাসন দখল করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল, এক চরম সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে সিংহাসনে বসে সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা

এবং দিগ্বিজয়ের নীতি অবলম্বন করে অল্পকালের মধ্যেই এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া যা পশ্চিমে গুজরাট থেকে দক্ষিণে মহীশূর এবং কলিঙ্গ থেকে দাক্ষিণাত্যের পূর্বাংশে অবস্থিত পাণ্ড্য রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পারস্যরাজের সাথে তার সুসম্পর্ক বজায় ছিল এবং দূতবিনিময় হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ্ তাঁর রাজত্বকালে মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন এবং দ্বিতীয় পুলকেশীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কথা তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন। পুলকেশীর রাজত্বে জনসাধারণ যে বেশ সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করত হিউয়েন সাঙ্ তারও উল্লেখ করেছেন। পুলকেশী ছিলেন হর্ষের প্রবলতম প্রতিপক্ষ এবং হর্ষকে তাঁর হাতে পরাজয় পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছিল। হর্ষবর্ধন যদি উত্তরভারতের প্রভু হয়ে থাকেন, তবে দ্বিতীয় পুলকেশীকে দাক্ষিণাত্যের প্রভু বলা চলে।

পুষ্যমিত্র সুঙ্গ

[শাসনকাল ১৮৭-১৫১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

পুষ্যমিত্র সুঙ্গ হলেন সুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৮৭ থেকে ১৮৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে কোন এক সময় মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর সেনাধ্যক্ষ পুষ্যমিত্র তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করেন এবং তাঁকে হত্যা করে নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পুষ্যমিত্রর প্রতিষ্ঠিত বংশকে সুঙ্গ বংশ বলা হয়। সুঙ্গ বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে আজও সঠিকভাবে কিছু জানা যায় নি। পুষ্যমিত্র সুঙ্গ দুটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন — প্রথমটি সিংহাসনে আরোহণের সময় এবং দ্বিতীয়টি মধ্যদেশে তাঁর আধিপত্য স্থাপন ও যবনদের (গ্রীক) বিরুদ্ধে জয়লাভের পর। পুষ্যমিত্র ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক।

বৌদ্ধ লেখকেরা পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধ ধর্মের বড় শত্রু বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে পুষ্যমিত্র বহু বৌদ্ধ মঠ ও স্তূপ ধ্বংস করেন এবং পাটলিপুত্র থেকে বৌদ্ধ শ্রমণদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু এই ঘটনার সত্যতা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয় নি।

দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর পুষ্যমিত্র আনুমানিক ১৫১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ নাগাদ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পৃথ্বিরাজ তৃতীয়

[শাসনকাল ১১৭৮-১১৯২খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে চৌহানরাজ পৃথ্বিরাজের নাম বিশেষ স্মরণীয়। তিনি হচ্ছেন শেষ বীর হিন্দুরাজা যিনি স্বদেশ রক্ষার জন্য মুসলমান শক্তির হাতে

যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দেন। তাঁর স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রাখার জন্য বেশ কিছু কাব্য, গাথা ও উপাখ্যান রচিত হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে 'পৃথিবরাজ বিজয়' এবং কবি চাঁদ বরদোই রচিত 'পৃথিবরাজ রাসো' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুসলমান লেখকের লেখা থেকেও তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে নানা কথা জানা যায়। পৃথিবরাজ ছিলেন এক বীর যোদ্ধা কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব ছিল। সাম্রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি যে খুব একটা সফল হয়েছিলেন এমন কথা বলা যায় না। তবে মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধে তিনি তাঁর শৌর্যবীর্যের পরিচয় রাখেন। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১ ৯১) অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে তিনি মহম্মদ ঘোরীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করলেও শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২) তাঁকে ঘোরীর হাতে পরাজয় ও মৃত্যুবরণ করতে হয়। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে মৃত্যুবরণ পৃথিবরাজকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। কেউ কেউ তাঁকে সমসাময়িক যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা বলে মনে করেন। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

পেরিক্লিস

[শাসনকাল ৪৪৩-৪২৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন এথেন্স তথা সমগ্র গ্রীসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্। একাধারে রাজনীতিবিদ্, শাসক, সেনানায়ক, সুপণ্ডিত, সুবক্তা ও শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী এই মানুষটি চোদ্দ বছর ধরে এথেন্সের কর্ণধার হিসাবে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। বাস্তবিকই ৪৪৩ থকে ৪২৯ খৃীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত পেরিক্লিস এথেন্সের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন বলা চলে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ববলে এথেন্স অল্পসময়ের মধ্যেই সবদিক দিয়ে সমগ্র গ্রীসের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। পেরিক্লিসের আমলে এথেন্সের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লক্ষ্য ক'রে ঐতিহাসিকেরা একে গ্রীসের ইতিহাসে 'সুবর্ণ যুগ' হিসাবে অভিহিত করেছেন। পেরিক্লিস ছিলেন জ্যানথিপাসের পুত্র। তিনি কাইমনের শাসনকালে এথেন্সের গণতন্ত্রী দলের নেতা হন। তিনি ছিলেন উচ্চ সংস্কৃতিবান, সুবক্তা ও রীতিমত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। বহুমুখী প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তি সেই সময় এথেন্সের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না।

রক্ষণশীল দলের নেতা কাইমনের প্রতিপক্ষ হিসাবে পেরিক্লিসের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। কাইমন স্পার্টার সাথে এথেন্সের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পেরিক্লিস এই নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন এবং এথেন্সের একক

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পক্ষে জোর প্রচার চালান। তারপর উপযুক্ত মুহূর্তে কাইমনকে ক্ষমতাচ্যুত ক'রে তিনি এথেন্সের নেতা হয়ে বসেন এবং এথেনীয় সংবিধানের বেশ কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার গণতান্ত্রিক শাসন সংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে রাতারাতি এথেন্সবাসীর মন জয় ক'রে নেন। অ্যারিওপেগাসের ক্ষমতাকে তিনি রীতিমত সঙ্কুচিত করেন এবং জুরি হিসাবে কার্য করার জন্য নাগরিকদের নিয়মিত পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা করেন। নাট্যাভিনয় দেখার জন্য জনগণকে 'পাবলিক ট্রেজারী' থেকে অর্থ প্রদানের নিয়ম প্রবর্তন ক'রে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি এইভাবে এথেনীয় গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণ ঘটান এবং বহু সংখ্যক নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ দান করেন।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পেরিক্লিসের লক্ষ্য ছিল ব্যাপক সমরাভিযান চালিয়ে সমগ্র গ্রীসের প্রভুত্ব অর্জন। এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। তিনি এথেন্স ও স্পার্টার যুগ্ম নেতৃত্বের ধারণাকে বাতিল করে দেন। সমগ্র গ্রীক দুনিয়ায় এথেন্সের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পেরিক্লিস আর্গস, থেসালি, মেগারা প্রভৃতি স্পার্টার শত্রু রাষ্ট্রগুলোর সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। তিনি একে একে করিন্থ, ঈজিনা ও বোয়েশিয়ানদের যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে মধ্যগ্রীসের প্রভুত্ব অর্জন করেন। শীঘ্রই এথেন্সের শক্তির দাপটে ভীত হয়ে ফোসিস এবং লোক্রিস এথেন্সের সাথে মিত্রতাস্থাপন ক'রে তার প্রভাবাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এইভাবে কখনও সন্ধিস্থাপন আবার কখনও বা সামরিকবলের সাহায্যে পেরিক্লিস এথেন্সকে গ্রীক দুনিয়ার প্রধান শক্তিতে পরিণত করেন। বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে এথেন্সের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে পেরিক্লিস দুটি বিশাল প্রাচীর নির্মাণ করান। পেরিক্লিস স্থলভাগে যে বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন দুর্ভাগ্যবশতঃ তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। করোনিয়া নামক স্থানে এক তীব্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর বোয়েশিয়ার কাছে এথেন্সকে পরাজয় স্বীকার করতে হয় যার ফলস্বরূপ ফোসিস ও লোক্রিস এথেন্সের প্রভাবমুক্ত হয়ে যায় এবং মেগারা ও ইউবোয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রতিকূল বিবেচনা ক'রে পেরিক্লিস বাধ্য হয়ে স্পার্টার সাথে ত্রিশ বছরের শান্তি স্থাপন করেন। স্থলভাগে এথেনীয় সাম্রাজ্য অনেকখানি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় পেরিক্লিস অতঃপর এথেন্সের সামুদ্রিক সাম্রাজ্যকে জোরদার করায় মনোযোগী হন। তিনি তাঁর উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলোর প্রতি কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেন এবং তাঁদের করভারে রীতিমত জর্জরিত করেন। তিনি বেশ কিছু অঞ্চলে এথেন্সের উপনিবেশ স্থাপন করেন যেগুলোর মধ্যে থুরি ও অ্যাম্ফিপোলিস বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পেরিক্লিসের আভ্যন্তরীণ শাসন অত্যন্ত সাফল্য অর্জন করেছিল এবং তিনি এথেন্সকে

গৌরবের সুউচ্চ শিখরে উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পারসীক অভিযানের ভগ্নস্তূপ থেকে তিনি এথেন্সকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে তোলেন। বহু সুন্দর অট্টালিকা, রাজপথ, উদ্যান, মন্দির প্রভৃতির সাহায্যে তিনি এথেন্সনগরীকে অত্যন্ত সুশোভিত করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এথেন্সে শিল্প-সাহিত্যের চরম বিকাশ ঘটে এবং এথেন্স সমগ্র গ্রীক সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। পেরিক্লিসের পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাস, নাটক, ভাস্কর্য শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠ ও অমর সৃষ্টিকর্মগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। এককথায় এটা ছিল প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় যার স্রষ্টা মূলতঃ ছিলেন পেরিক্লিস।

পেলোপোনেসীয় যুদ্ধ শুরু হলে পেরিক্লিস স্থলযুদ্ধে স্পার্টার বিরুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব বিবেচনা ক'রে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে যান। ফলে স্পার্টা এ্যাটিকার উপর ধ্বংসাত্মক অভিযান চালাবার সুযোগ পায় এবং এথেন্সবাসী সুবৃহৎ প্রাচীরের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়। এইসময় জনবহুল এথেন্সে প্লেগরোগ ভয়াবহ আকারে দেখা দিলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জনগণ এই পরিস্থিতির জন্য পেরিক্লিসকে দায়ী করে। তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীরা এই সুযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনয়ন করে। যদিও অনতিবিলম্বে পেরিক্লিস তাঁর পুরোনো জনপ্রিয়তা ফিরে পান, কিন্তু ৪২৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে প্লেগরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়।

পেরিয়াণ্ডার

[শাসনকাল খ্রীষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দী]

খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে করিন্থ নামক গ্রীক রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন। পেরিয়াণ্ডার পিতা সাইপসেলাসের মৃত্যুর পর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যোগ্য পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। সাইপসেলাসের আমলে করিন্থের সামরিক ও আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। পেরিয়াণ্ডারের আমলে করিন্থ আরও সবল ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পিতার মত তিনিও ছিলেন একজন দক্ষ শাসক এবং কঠোর হস্তে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করতেন। করিন্থকে একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করার জন্য তিনি যথাসাধ্য প্রয়াস চালান। পেরিয়াণ্ডার শুধুমাত্র যুদ্ধ বিশারদই ছিলেন না শিল্প-সাহিত্যেরও অনুরাগী ছিলেন। তাঁর আমলে করিন্থে শিল্পকলা ও সাহিত্য যথেষ্ট বিকাশ লাভ করে।

পৌসেনিয়াস

[শাসনকাল খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দী]

প্রাচীন যুগে স্পার্টার রাজা ছিলেন। পারস্যের হাত থেকে থ্রেস ও এশিয়া মাইনরের গ্রীক শহরগুলো উদ্ধার করার জন্য এক বিশাল নৌ-বাহিনী নিয়ে গ্রীক সৈন্য যুদ্ধাভিযানে বার হলে পৌসেনিয়াস সর্বসম্মতিক্রমে এই অভিযানের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। পৌসেনিয়াস সাইপ্রাস পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং অধিকাংশ গ্রীক শহরকে পারসীক অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত করেন। এরপর তিনি সুদীর্ঘকাল অবরোধের পর বাইজান-সিয়াম অধিকার করেন। একের পর এক যুদ্ধ জয় তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত করে এবং পারস্য সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ও পারস্য রাজপ্রাসাদের জাঁকজমকে প্রলুব্ধ হয়ে তিনি পারস্য সম্রাট জারাক্সেসকে এক গোপন পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রে তিনি তাঁর কন্যাকে বিবাহ করার বাসনা পোষণ করেন এবং বিনিময়ে গ্রীসের এক বিস্তীর্ণ এলাকা পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। পৌসেনিয়াসের উদ্ধত আচরণ গ্রীকদের ক্ষুব্ধ করে এবং তাঁর বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণের খবর স্পার্টায় পৌঁছলে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে বলা হয়। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে পৌসেনিয়াস শাস্তিভোগ থেকে রেহাই পান। দেশে ফিরে এসে পৌসেনিয়াস তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা কার্যকরী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এবারও তাঁর চক্রান্ত ফাঁস হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত পলাতক অবস্থায় অনাহারে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। পৌসেনিয়াস নিঃসন্দেহে একজন উঁচুদরের সমরনায়ক ছিলেন। কিন্তু তাঁর অপরিণামদর্শী আচরণের জন্য তাঁর পতন হয়। পৌসেনিয়াস প্লেটিয়ার গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে (খ্রীঃ পূর্ব ৪৭৬) পারসীক সেনাপতি আড়োনিয়াসকে পরাজিত করে গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষা করেন।

প্রতাপ সিংহ

[শাসনকাল ১৫৭২-১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে ভারত-ইতিহাসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক রাজা। পিতা উদয়সিংহের মৃত্যুর পর ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাণা প্রতাপ মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় দিল্লীর সিংহাসনে মোগল সম্রাট আকবর রাজত্ব করছেন। ইতিমধ্যেই অন্যান্য রাজপুত রাণারা একে একে মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু প্রতাপ সিংহ ছিলেন ব্যতিক্রম। পিতা উদয়সিংহের সময় থেকেই রাজধানী চিতোর মেবারের হাতছাড়া হয়ে যায়। রাণা প্রতাপ সৈন্যসামন্ত যোগাড় ক'রে সামান্য সামর্থ নিয়ে সুসংবদ্ধ ও সুবিশাল মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে এক অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ

হন। অন্যান্য রাজপুত রাজারা এমনকি তাঁর নিজের ভাই পর্যন্ত রাজপুত আদর্শ ও ঐতিহ্যের কথা ভুলে গিয়ে শত্রুশিবিরে যোগ দেন। কিন্তু কোনো প্রতিকূলতাই এই অসাধারণ দেশপ্রেমিককে তাঁর স্বদেশের জন্য মুক্তি সংগ্রাম থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর মানসিংহ ও আসফখানের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী রাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। গোগাণ্ডার নিকট হলদিঘাট নামক স্থানে রাণা প্রতাপের সাথে মোগল বাহিনীর এক ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হন এবং কোনওরকমে জীবনরক্ষা করেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রে পাহাড়ে আশ্রয় নেন এবং তাঁর অধীনস্থ এলাকাগুলো একে একে শত্রুসৈন্যের হস্তগত হতে থাকে। এই সময় প্রতাপ এবং তাঁর পরিবারের লোকজন অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে অনাহার, অর্ধাহারে পলাতক অবস্থায় দিন কাটান। অদম্য এই দেশপ্রেমিক সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে বহু অঞ্চল মোগলদের কাছ থেকে পুনরধিকার করতে সমর্থ হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্র অমর সিংহ ও অধীনস্থ রাজপুত প্রধানদের কাছ থেকে মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন।

১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাণা প্রতাপের মৃত্যু হয়। শুধু রাজপুতনায়ই নয় স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাণা প্রতাপের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও অসামান্য আত্মত্যাগের কাহিনী ভারত ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রাইমো ডি রিভেরা

[শাসনকাল ১৯২৩-৩০ খ্রীষ্টাব্দ]

স্পেনের একজন জেনারেল ও সর্বাধিনায়ক ছিলেন। প্রাইমো ডি রিভেরা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্পবয়সে স্পেনের সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং কিউবা, ফিলিপাইন ও মরক্কোতে নিজ যোগ্যতার বিশেষ পরিচয় দিয়ে দ্রুত পদোন্নতি লাভ করেন। রিভেরা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাডিজের গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি সামরিক অভ্যুত্থানের সাহায্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে দেশে এক সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান ও জনগণের বিভিন্ন প্রকার অধিকারকে তিনি বাতিল করে দেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটালেও প্রাইমো ডি রিভেরা দেশের সর্বেসর্বা ও একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। নিজের ক্ষমতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর স্বৈরাচারী শাসনে দেশের জনসাধারণের মধ্যে নানা অসন্তোষ ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে

দেশের উদারপন্থীগণ তাঁর বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহের আয়োজন করে। এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও দেশে চরম আর্থিক সংকট দেখা দেওয়ায় ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে প্রাইমো ডি রিভেরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং প্যারিসে নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ফারুখশিয়ার

[শাসনকাল ১৭১৩-১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ]

পূর্ববর্তী শাসক জাহান্দার শাহকে হত্যা করে ফারুখশিয়ার ১৭১৩ খ্রীঃ মোগল মসনদে আরোহণ করেন। তিনি দুইজন প্রভাবশালী সৈয়দ ভ্রাতা হুসেন আলী ও আবদুল্লার সহায়তায় এবং সুনিপুণ চক্রান্তের ফলে সিংহাসন লাভ করেন। ফারুখশিয়ার সম্রাট হবার পর এই দুই ভাই রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের কুক্ষিগত করে ফেলে। ফারুখশিয়ার ছিলেন একজন দুর্বল শাসক। তিনি তাদের কথামত চলতে বাধ্য হন। আবদুল্লা উজির ও হুসেন আলী সেনাবাহিনীর প্রধান হন। ফারুকশিয়ার এই অবস্থার হাত থেকে মুক্তিলাভের উপায় খুঁজতে থাকেন। কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি সাহসী হন নি। তাই তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধী পক্ষের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের শায়েস্তা করার প্রচেষ্টা চালান। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁর দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং অন্ধকার কারাগারে প্রেরণ করে। তারপর একসময় ফারুখশিয়ারকে হত্যা করা হয় (১৭১৯)।

ফার্দিনান্দ

[শাসনকাল ১৪৭৯-১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ]

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেনের সিংহাসনে বসেন। ফার্দিনান্দ ১৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শক্তিশালী রাজা। তাঁর রাজত্বকাল নানা কারণে স্মরণীয়। সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজনীতিতে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ফার্দিনান্দ সিংহাসনে বসার পূর্বে স্পেন ছিল দুর্বল ও অসংহত কতকগুলো খণ্ড-বিচ্ছিন্ন রাজ্যের সমষ্টি মাত্র। ফার্দিনান্দ সিংহাসনে বসার পর থেকেই স্পেনের ইতিহাসে এক গৌরবময় পর্বের সূচনা হয়। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অ্যারাগণের ফার্দিনান্দের সাথে ক্যাস্টাইলের ইসাবেলার বিবাহের মাধ্যমে স্পেনের দুই বৃহৎ রাজ্য একই শাসনের নেতৃত্বাধীনে আসে। স্পেনের ঐক্যের পথে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুরদের কাছ থেকে গ্র্যানাডা জয়। এরপর ফার্দিনান্দ সীমান্ত রাজ্য নাভারে জয় করলে তাঁর অধীনে স্পেনের ঐক্য সম্পূর্ণ হয়। ১৪৯২ খ্রীঃ স্পেনের ইতিহাসে বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাজা-রাণীর বিশেষ আনুকূল্য লাভ করে ঐ বছর ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। এছাড়া ফার্দিনান্দ ইতালীতে ফরাসী প্রভাব খর্ব করেন এবং নেপল্‌স্, সিসিলি ও সার্ডিনিয়ার উপর তাঁর অধিকার মানতে ফ্রান্সকে বাধ্য করেন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ফার্দিনান্দ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে নিজ প্রভাবাধীন রাখার চেষ্টা চালান। তিনি তাঁর কন্যাদের পর্তুগাল, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের রাজাদের সাথে বিবাহ দেন। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের অধীনে এক ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রগঠনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। ফার্দিনান্দ ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজকার্য পরিচালনা করেন।

ফিরুজশাহ তুঘলক

[শাসনকাল ১৩৫১-১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দ]

মহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পিতৃব্যপুত্র ফিরুজশাহ তুঘলক ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সামরিক দিক থেকে তিনি বিশেষ সুনামের অধিকারী ছিলেন না। তাঁর আমলে বাংলা ও দাক্ষিণাত্য হাতছাড়া হয়ে যায়। বাংলা, সিন্ধু ও গুজরাটে তিনি যে সমরাভিযান চালান তা তেমন সাফল্যলাভ করতে পারেনি। ফলে তাঁর রাজত্বকালে দিল্লীর সুলতানী শাসনের সীমা সংকুচিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ফিরুজ শাহ একজন প্রজাদরদী, ধর্মপ্রাণ, উদার ও ক্ষমাশীল শাসক হিসাবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি ছিলেন যথার্থই একজন সুশাসক। তাঁর আমলে বহু শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল এবং বহু জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের দ্বারা তিনি প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টা করেছিলেন। মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে যে সব মানুষ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ফিরুজ সরকারী তহবিল থেকে তাদের ক্ষতিপূরণ দেন। তিনি ভূমি-রাজস্বের হার কমিয়ে দেন, জমিতে জলসেচের সুবিধার্থে বহু খাল খনন করেন এবং কৃষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা নেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটান ও বাণিজ্যিক শুল্ক হ্রাস করেন। দরিদ্র জনগণের সাহায্যার্থে তিনি এক বিশেষ বিভাগ চালু করেন। প্রজাসাধারণের জন্য তিনি বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করেন ও কর্মহীন ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। ফিরুজ নিষ্ঠুর শাস্তিদান প্রথা রহিত করেন এবং অপরাধমূলক আইনের সংশোধন করেন। তিনি ফিরোজাবাদ, জৌনপুর, ফতেবাদ প্রভৃতি অনেক সুন্দর সুন্দর শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু সেতু, প্রাসাদ, উদ্যান, সরাইখানা, মসজিদ, বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। তিনি দাসদের প্রতি মানবিক আচরণের ব্যবস্থা করেন।

ফিরুজ শাহ ছিলেন তুঘলক বংশের শেষ বড় সুলতান। তাঁর শাসনে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল। মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি লোকে তাঁর সুশাসনে বিস্মৃত হয়েছিল। কিন্তু ফিরুজ যে একজন দূরদর্শী শাসক ছিলেন এমন কথা বলা চলে না। তিনি জায়গীর প্রথার পুনঃ প্রবর্তন করেছিলেন এবং হিন্দুদের প্রতি কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করতেন। তিনি তাঁর সামরিক বিভাগের কোনো সংস্কার করেননি এবং তাঁর আমলে সৈন্যবাহিনী বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ফিরুজের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও হিন্দুবিরোধী নীতি হিন্দুদের মনে তাঁর শাসন সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল। এইসব কারণে তুঘলক বংশের পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল।

ফিরুজ তুঘলক দীর্ঘ ৩৭ বছর রাজকার্য পরিচালনা করার পর ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ফিলিপ প্রথম

[শাসনকাল ১০৬০-১১০৮ খ্রীষ্টাব্দ]

ফ্রান্সের ক্যাপেসীয় বংশের একজন রাজা। প্রথম ফিলিপ ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম হেনরীর পরবর্তী শাসক হিসাবে সিংহাসনে বসেন এবং ১১০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ আটচল্লিশ বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন। সিংহাসনে বসেই ফ্রান্সের শক্তিশালী সামন্ত রাজ্যগুলোর সাথে তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এই প্রতিকূল পরিস্থিতি অবশ্য তিনি পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পোপ সপ্তম গ্রেগরী এই সময় ফরাসী চার্চের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হলে প্রথম ফিলিপ তাতে বাধা দেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রথম ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। কিন্তু তিনি এই ধর্মযুদ্ধে যোগদান করতে স্বীকৃত হয়ে পোপের রোষানলে পড়েন। তিনি পোপ গ্রেগরীর সমর্থক ফরাসী প্রিলেটদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন। তবে ফিলিপের একটি বড় কৃতিত্ব হল তিনি গ্যালিকান চার্চকে পোপের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শেষ জীবনে শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক শৈথিল্যহেতু শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এইসময় তাঁকে প্রভাবশালী ব্যারনদের এক তীব্র বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি এইসব বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হন এবং সাম্রাজ্যের এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে ১১০৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রথম ফিলিপের শেষ বয়সের ব্যর্থতা সত্ত্বেও বলা চলে তিনি ছিলেন ক্যাপেসীয় বংশের একজন শক্তিশালী ও যোগ্যতা সম্পন্ন সম্রাট।

ফিলিপ দ্বিতীয়

[শাসনকাল ৩৫৯-৩৩৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ছিলেন। ৩৫৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে দ্বিতীয় ফিলিপ গ্রীসের অন্তর্গত এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির অধিপতি হন এবং প্রায় পঁচিশবছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজকার্য পরিচালনা করেন। ফিলিপ ছিলেন একজন বিচক্ষণ, যোগ্যতাসম্পন্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন এবং সংস্কৃতিবান্। সিংহাসনে আরোহণ করেই ফিলিপ নিজ রাজ্যটিকে সুসংগঠিত করার দিকে মনোনিবেশ করেন। সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে তিনি এর শক্তিবৃদ্ধি ঘটান। তারপর শুরু হয় তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সামরিক অভিযান। তিনি একে একে গ্রীসের অনেকগুলি রাজ্য জয় করেন এবং অবশেষে ৩৩৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এথেন্সও তার মিত্রশক্তিগুলোর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে প্রায় সমগ্র গ্রীসের অধীশ্বর হয়ে বসেন। প্রকৃতপক্ষে এতদিন পর্যন্ত ম্যাসিডন ছিল এক ক্ষুদ্র, অখ্যাতনামা রাজ্য। দ্বিতীয় ফিলিপ সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকে একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে ম্যাসিডনের অভ্যুত্থান শুরু হয় যা পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য পুত্র আলেকজাণ্ডারের সময়ে উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। গ্রীসের প্রধান শত্রু পারস্যের বিরুদ্ধে সমগ্র গ্রীসের নেতৃত্বভার স্বভাবতঃই ফিলিপের উপর এসে পড়ে। তাঁর অগ্রবর্তী সৈন্যবাহিনী এশিয়া মহাদেশ অভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শীঘ্রই তাঁকে এক চক্রান্তের শিকার হয়ে আততায়ী হস্তে প্রাণ হারাতে হয় (৩৩৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)। রাণী অলিম্পিয়াস (আলেকজাণ্ডারের মাতা) ফিলিপের এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়ে থাকে কারণ ফিলিপ দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় তিনি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন।

ফিলিপের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হ'ল পুত্র আলেকজাণ্ডারকে ভবিষ্যত জীবনের জন্য প্রস্তুত করা। তিনি পুত্রের সামরিক ও অন্যান্য শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল যে আলেকজাণ্ডারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন তা ইতিহাস পাঠকমাত্রই অবগত আছেন।



ফিলিপ দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৫৫৬-১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ]

পঞ্চম চার্লস সিংহাসনচ্যুত হবার পর তাঁর পুত্র ফিলিপ ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি স্পেন, নেপলস্, মিলান, নেদারল্যাণ্ড ও আমেরিকার অধীশ্বর হন। দ্বিতীয় ফিলিপ ইংলণ্ডের রাণী মেরী টিউডরকে বিবাহ করে তাঁর সাম্রাজ্যসীমা আরও প্রসারিত করেন। তিনি চল্লিশ বছরেরও অধিককাল অত্যন্ত পরাক্রমের সাথে তাঁর রাজত্ব পরিচালনা করে নিজেকে সমসাময়িক কালের একজন অন্যতম শক্তিশালী সম্রাট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রকৃতিতে ফিলিপ ছিলেন একজন সংকীর্ণমনা, উদ্ধত ও দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। সামান্যতম বিরোধিতাও তাঁর কাছে অসহ্য মনে হত এবং তার সন্দেহপরায়ণ স্বভাবের জন্য তিনি তাঁর মন্ত্রীত্বের উপরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারতেন না। ধর্মীয় ব্যাপারে দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন একজন গোঁড়া ক্যাথলিক। তাঁর কর্মশক্তি ও উদ্যম ছিল বিস্ময়কর এবং শাসন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিষয়ের দেখাশুনা তিনি স্বয়ং করতেন। শাসক হিসাবে মূলতঃ তাঁর দুটি লক্ষ্য ছিল – স্পেনকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করা আর ক্যাথলিক রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করা। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ফিলিপ ছিলেন একজন স্বৈরাচারী শাসক। তিনি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন না এবং তাঁর অধীনস্থ রাজ্যগুলোকে সব রকম শাসনতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধালাভে বঞ্চিত করতেন।

প্রভাবশালী অভিজাত সম্প্রদায়কেও রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয়। রাজনৈতিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে 'ইনকুইজিশন'কে কাজে লাগান হয়। ধর্মীয় গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে তিনি ইহুদীদের নির্বাসিত করেন এবং মুরদের উচ্ছেদসাধন করেন। তাঁর স্বৈরাচারী শাসন ছিল সবরকম ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যবসায়িক স্বার্থের পরিপন্থী। ফিলিপের এইসব হঠকারী কার্যকলাপের ফলে সার্বিকভাবে স্পেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন সমসাময়িক বিশ্বের সবচেয়ে ঘৃণিত শাসক।

ফিলিপ তৃতীয়

[শাসনকাল ১২৭০-১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দ]

ফ্রান্সের ক্যাপেসীয় বংশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী শাসক নবম লুইয়ের উত্তরাধিকারী হিসাবে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১২৭০)। তৃতীয় ফিলিপের রাজত্বকাল পনের বছর স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল জনসাধারণে মধ্য থেকে রোমক আইনে পণ্ডিত ব্যক্তিদের বিচার ব্যবস্থায় নিয়োগ। ঘটনাটি নিঃসন্দেহে ছিল অভূতপূর্ব। তৃতীয় ফিলিপ স্পেনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং নাভারে নামক স্থান লাভ করেন। তিনি দক্ষিণ দিকে ফরাসী সীমান্ত বেশ কিছুটা বিস্তৃত করেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামন্ত প্রভুরা বিদ্রোহ করার চেষ্টা করলে তিনি কঠোর হস্তে তাদের দমন করেন। মোটামুটি দক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করার পর ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ফিলিপ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ফিলিপ চতুর্থ

[শাসনকাল ২২০-১৭৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ম্যাসিডনের রাজা হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪২ বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন। চতুর্থ ফিলিপের রাজত্বকালে রোমের ক্রমবর্ধমান শক্তির সঙ্গে ম্যাসিডনের সংঘর্ষ লাগে। সাইনোসিফেলের যুদ্ধে (১৯৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) রোমানদের হাতে ফিলিপ চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করেন। এরপর ম্যাসিডন গ্রীক রাষ্ট্রগুলোর উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা থেকে বিরত হয় কারণ রোমানরা সকল গ্রীক রাষ্ট্রকেই স্বাধীন ও মুক্ত বলে ঘোষণা করে। ১৭৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ফিলিপের মৃত্যু হয়।

ফিলিপ অগাস্টাস

[শাসনকাল ১১৮০-১২২৩ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে ফ্রান্সের ক্যাপেসীয় বংশের একজন রাজা ছিলেন। ফিলিপ অগাস্টাসের রাজত্বকাল নিঃসন্দেহে ফ্রান্সের ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। তিনি ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁর রাজত্বকাল দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। ফিলিপ অগাস্টাস একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে ফ্রান্স ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তিনি তাঁর সুদক্ষ সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন এবং বড় বড় সামন্ত প্রভুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব ক'রে রাজতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করে তোলেন। তাঁর

আমলে ক্যাপেসীয় সাম্রাজ্যের সীমা পূর্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির ফলে ক্যাপেসীয় রাজতন্ত্রের যথেষ্ট অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও ঘটে। চার্চ ও ক্ষুদ্র অভিজাতদের সমর্থন ছিল ফিলিপের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। এছাড়া শহরের ধনী বুর্জোয়াদের সমর্থনও তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর সময়ে রাজতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত প্রথারও ক্রমাবনতির যুগ শুরু হয়। ফিলিপের কৃতিত্ব শুধুমাত্র সামরিক অভিযান, যুদ্ধজয় ও সাম্রাজ্যবিস্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। তিনি একটি সুশৃংখল কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেন। রাজা সকল শক্তির উৎস হলেও বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। ফিলিপ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর সৃষ্টি ক'রে যোগ্য ব্যক্তিকে সেইসব দপ্তরের ভার অর্পণ করেন। ফিলিপ অগাস্টাস জানতেন যে তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে গেলে প্রচুর সৈন্যের প্রয়োজন। তাই তিনি বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করেছিলেন। বড় ও সমৃদ্ধশালী শহরের উৎপত্তি হ'ল তাঁর আমলের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এইসব শহর দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ফিলিপ অগাস্টাসের পৃষ্ঠপোষকতায় প্যারিস দ্রুত ফ্রান্স তথা সমগ্র ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শহরের মর্যাদালাভ করতে থাকে। ফিলিপ অগাস্টাসের সমস্ত বড় বড় শাসনতান্ত্রিক দপ্তর-গুলো প্যারিসে অবস্থিত ছিল। তাঁর আনুকূল্যে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনে পরিণত হয়। এ ছাড়া শিল্প-সংস্কৃতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রেও প্যারিস এই সময় ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ফিলিপ অগাস্টাস ধর্মযুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজপদে আসীন থাকেন। মধ্যযুগের ফ্রান্সের ইতিহাসে তিনি যে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন ঐতিহাসিকদের মধ্যে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

ফোকাস

[শাসনকাল ৬০২-৬১০ খ্রীষ্টাব্দ]

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের একজন সম্রাট। ফোকাস ৬০২ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববর্তী রাজা মরিসকে সামরিক বাহিনীর সহায়তায় সিংহাসনচ্যুত করে সম্রাট হন। মানুষ কিংবা শাসক হিসাবে তিনি বিশেষ উন্নত মানের ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে সিংহাসনে বসে তিনি এক সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করেন। বলকান ও এশিয়া মাইনরের অধিবাসীরা তাঁকে সম্রাট হিসাবে মানতে অস্বীকৃত হয়। তবে সামরিক বাহিনী ও মরিসের শত্রু পোপ গ্রেগরীর সমর্থন তাঁর পিছনে ছিল। কিন্তু তাঁর বিপদ ঘনিয়ে এল পূর্ব দিক থেকে। দ্বিতীয় কোসরোস তাঁর হিতকারী মরিসের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া এবং দারায়ুসের পারস্য

সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ফোকাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি রোমক আর্মেনিয়া অবরোধ করেন এবং দারা, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি স্থান দখল করে নেন। তিনি উত্তর এশিয়া মাইনরের হেলেসপণ্ট পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই সময় ফোকাস মোনোফিসাইটদের সঙ্গে এক ধর্মীয় বিবাদে লিপ্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অধিকন্তু, মরিসের একজন বিশ্বস্ত ও বয়স্ক সেনাধ্যক্ষ হেরাক্লিয়াস বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া ও মিশরকে সাম্রাজ্যের কবল থেকে মুক্ত করে নেন। ফলে কনস্টান্টিনোপলের খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎসপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এরপর হেরাক্লিয়াস সরাসরি কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে এক নৌ অভিযান চালান। ফোকাসকে হত্যা করা হয় (৬১০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং বৃদ্ধ হেরাক্লিয়াসের পুত্র রাজ-সিংহাসনে বসেন। ফোকাস মোট আট বছর রাজত্ব করেন।



ফ্রাঙ্কো

[শাসনকাল ১৯৩৯-১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ]

বর্তমান শতাব্দীতে স্পেনের রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সৈনিক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু ক'রে স্বীয় যোগ্যতাবলে ধাপে ধাপে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন। তিনি ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'চীফ অব্ জেনারেল স্টাফ' পদে মনোনীত হন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন এক তীব্র গৃহযুদ্ধের শিকার হয় যার জের ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। এই সময় ফ্রাঙ্কো জাতীয়তাবাদী দলের সৈনাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ফ্যালাঞ্জিস্ট দলের নেতা। গৃহযুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কো হিটলার ও মুসোলিনি উভয় রাষ্ট্র-প্রধানের সমর্থন লাভ করেন এবং তাঁদের সহায়তায় স্পেনে এক ফ্যাসিস্ট সরকার গঠন করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো স্পেনের প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত হন এবং শাসন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ সামরিক একনায়কতন্ত্র কায়েম করেন। তিনি ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এইপদে বহাল থাকেন।

ফ্রেডারিক প্রথম

[শাসনকাল ১৬৮৮–১৭১০ খ্রীষ্টাব্দ]

ফ্রেডারিক উইলিয়াম দি গ্রেট ইলেক্টরের মৃত্যুর পর ব্রাণ্ডেনবার্গের রাজ সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র প্রথম ফ্রেডারিক (১৬৮৮)। সেই বছর ইংলণ্ডে গৌরবময় বিপ্লব' শুরু হয়েছিল। প্রথম ফ্রেডারিক শাসক হিসাবে খুব একটা কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। সত্যি কথা বলতে, পিতার মত সামর্থ ও কর্মক্ষমতা তাঁর ছিলনা। অধিকন্তু তিনি ছিলেন ভোগ-বিলাসী। রাজকার্য পরিচালনা অপেক্ষা রাজপ্রাসাদের লঘু আমোদ-প্রমোদ তাঁর কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হত। প্রথম ফ্রেডারিকের রাজত্বকালের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ব্রাণ্ডেনবার্গের ইলেক্টরের পক্ষে রাজা খেতাব অর্জন। এই সম্মান তিনি অর্জন করেন স্পেনের আসন্ন উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে সম্রাট লিওপোল্ডকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতিদানের বিনিময়ে। এরপর থেকে ব্রাণ্ডেনবার্গের ইলেক্টর প্রাশিয়ার একজন রাজা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু তাই বলে তিনি সমগ্র প্রাশিয়ার রাজা ছিলেন না কেননা প্রাশিয়ার পশ্চিমাংশ তখনও পোল্যাণ্ডের দখলে ছিল। বাইশ বছর রাজত্ব করার পর ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ফ্রেডারিক মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ফ্রেডারিক দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১২২০-১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ]

হোহেনস্টফেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করতেন। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে একই সঙ্গে জার্মানীর রাজা হন এবং সিসিলি রাজ্যটির কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে রোমনগরীতে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। তিনি ছিলেন আধা জার্মান এবং আধা নর্মান। তিনি তাঁর প্রথম জীবন সিসিলিতে অতিবাহিত করেন এবং প্রধানতঃ সিসিলির রাজা হিসাবেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ অর্জন করেছেন। বাস্তবিকই দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের মতন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী পণ্ডিত রাজা ইতিহাসে দুর্লভ। তিনি একাধারে ছিলেন রাজনীতি-বিদ্, দার্শনিক, সেনাধ্যক্ষ, আইনবিদ্, কবি, স্থপতি, অংকশাস্ত্রবিদ্, ভাষাবিদ্ প্রভৃতি। সমসাময়িক কালে তিনি 'বিশ্বের বিস্ময়' বলে জনসমক্ষে পরিচিতি লাভ করেন। পোপের সাথে তাঁর মতান্তর ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তাঁর রাজত্বকালের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হোহেনস্টফেন বংশের তিনি ছিলেন শেষ শক্তিশালী সম্রাট এবং ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের মৃত্যুর সাথে সাথে হোহেনস্টফেন সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হয়।



ফ্রেডারিক দ্বিতীয় (গ্রেট)

[শাসনকাল ১৭৪০-১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বিতীয় ফ্রেডারিক বা ফ্রেডারিক 'দি গ্রেট' ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করলে প্রাশিয়া তথা ইউরোপের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক নিঃসন্দেহে ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সমসাময়িক কালের ইউরোপের তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজা। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, কূটনৈতিক বিচক্ষণতা, বুদ্ধিবৃত্তি, সামরিক শক্তি ও শাসনতান্ত্রিক দক্ষতা, অদম্য মনোবল ও অফুরন্ত কর্মশক্তি ..সবদিক দিয়েই দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ছিলেন ইউরোপের অন্যান্য রাজাদের চেয়ে যোগ্যতর।

দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সামরিক শক্তির সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সময় যখন তিনি ইউরোপের অনেকগুলো রাষ্ট্রের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে একা শক্ত হাতে সংগ্রাম চালান। তাঁর সামরিক প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় পেয়ে সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হয় এবং চরম প্রতিকূলতার মধ্যে মানসিক স্থৈর্য ও দৃঢ়তা বজায় রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার ক্ষমতা দেখে শত্রুরাও প্রশংসা না করে পারেনি। যুদ্ধ পরিচালনায় দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সাফল্যের উৎস ছিল গতিবেগ। তিনি ঝটিকা অভিযান চালিয়ে প্রতিপক্ষকে বশীভূত করে ফেলতেন এবং বিরোধী শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতেন। দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের এই রণনীতি অবলম্বন করে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন পরবর্তীকালে খুবই সাফল্য অর্জন করেছিলেন। রসবাখ ও লিউথেনের যুদ্ধে বিস্ময়কর সাফল্য ফ্রেডারিকের অসাধারণ সামরিক প্রতিভার পরিচয় বহন ক'রে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে ফ্রেডারিক কোনোরকম ন্যায়নীতির ধার ধারতেন না। এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন চরম সুবিধাবাদী। অবশ্য সমসাময়িক রাজনীতিতে সাফল্য অর্জন করতে গেলে এটা ছিল একমাত্র গ্রহণযোগ্য পন্থা। ফ্রেডারিক নিজেই মন্তব্য করেন, 'যা পার নিয়ে নাও, এতে দোষের কিছু নেই যদি তুমি তা ফেরৎ দিতে না বাধ্য হও।'

শুধুমাত্র একজন সমরবিশারদ হিসাবেই নয়, একজন প্রজাহিতৈষী শাসক হিসাবেও ফ্রেডারিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি ছিলেন সমসাময়িক ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনদরদী শাসক। তিনি স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন কিন্তু তার এই স্বৈরাচার ছিল জনস্বার্থের অনুকূল। তাঁর এই প্রজাদরদী স্বৈরাচার ছিল 'জ্ঞানদীপ্ত' স্বৈরাচার। প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন এবং নিজেকে 'রাষ্ট্রের প্রথম সেবক' হিসাবে অভিহিত করেন। ফ্রেডারিক বহু উন্নয়নমূলক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে প্রাশিয়াকে ইউরোপের একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তাঁর আমলে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষার প্রসার ঘটে, বহু নতুন পথঘাট, অট্টালিকা নির্মিত হয় ও বিচার ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। ফ্রেডারিক সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বজায় রাখেন। ফ্রেডারিকের আমলে সাইলেশিয়া ও পশ্চিম প্রাশিয়া তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় সাম্রাজ্যের আয়তন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। প্রাশিয়াকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত করা ছিল ফ্রেডারিকের প্রধান কীর্তি। তাঁর আনুকূল্যে প্রাশিয়ার জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করা যায় এবং জনগণ সুখী, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জীবনের আস্বাদ লাভ করে। তাঁকে যথার্থই 'গ্রেট' বা 'মহান' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। মোট ৪৬ বছর রাজত্ব করার পর ফ্রেডারিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ফ্রেডারিক উইলিয়াম প্রথম

[শাসনকাল ১৭১৩-১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রথম ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রান্ডেনবার্গের রাজা হন। মূলতঃ এক সুদক্ষ ও শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর স্রষ্টা হিসাবে তিনি ইতিহাসে স্মরণীয়। এই সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী গঠনের মধ্য দিয়ে তিনি প্রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা হিসাবে পরিগণিত হন। তাঁর শাসনতান্ত্রিক সংগঠন ছিল আমলাতান্ত্রিক ধরনের। তিনি বিভিন্ন বিভাগকে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত করেন। রাজস্ব ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি একটি জেনারেল ডাইরেক্টরী স্থাপন করেন। তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রেখে দেশের অর্থনীতিকে পরিচালিত করেন এবং উদ্বৃত্ত অর্থে বিশাল সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার রক্ষণে সমর্থ হন। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ফ্রেডারিক উইলিয়াম বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন না। তাঁর কূটনৈতিক জ্ঞান ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহের অভাব ছিল। ফলে তার আমলে প্রাশিয়ার সীমানা ও মর্যাদা বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি। তিনি শুধুমাত্র সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং সফল হন। এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে

তিনি বাল্টিক এলাকায় সেটিন নামক বন্দরটি লাভ করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়াম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ফ্রেডারিক উইলিয়াম চতুর্থ

[শাসনকাল ১৮৪০-১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাশিয়ার রাজা ছিলেন। চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের আমলে ফ্রান্সে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এক প্রবল বিপ্লব ঘটলে ইউরোপের অনেক দেশের মত জার্মানীর বিভিন্ন স্থানেও এই বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রাশিয়ার রাজা জনতার দাবি স্বীকার করে নেন। ফলে প্রাশিয়ায় নির্বাচিত পার্লামেন্ট, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতির প্রচলন হয়। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জার্মানীর অন্যান্য প্রদেশগুলোতেও উদারনৈতিক শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হয়। এরপর ফ্রাংকফুর্ট শহরে জার্মান জাতীয়তাবাদীরা জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এক পার্লামেন্ট আহবান করে। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ উইলিয়াম সর্বসম্মতিক্রমে এই নবগঠিত জার্মান রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক রাজা মনোনীত হন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্ট ভেঙ্গে যায়। চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি একটি উদারনৈতিক সংবিধান প্রবর্তন করে রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে কতকাংশে খর্ব করেন এবং প্রত্যক্ষ কর প্রদানকারীদের ভোটদানের অধিকার স্বীকার করে নেন।

ফ্রেডারিক উইলিয়াম দি গ্রেট ইলেক্টর

[শাসনকাল ১৬৪০-১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দ]

ফ্রেডারিক উইলিয়াম (ইতিহাসে গ্রেট ইলেক্টর নামে পরিচিত) ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাণ্ডেনবার্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ও দক্ষ প্রশাসক। তাঁর আমলে ব্রাণ্ডেনবার্গ দক্ষিণ জার্মানীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। গ্রেট ইলেক্টরের সিংহাসনে আরোহণকালে ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে ব্রাণ্ডেনবার্গ বিদেশী সৈন্যদের দ্বারা পদদলিত হচ্ছিল। গ্রেট ইলেক্টরের প্রথম কাজ ছিল সুইডেনের সাথে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে স্বদেশের মাটি থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারণ করা। তিনি বৈদেশিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ১৬৪৮ খ্রীঃ ওয়েস্টফালিয়ার সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। গ্রেট ইলেক্টরের লক্ষ্য ছিল পূর্ব প্রাশিয়াকে পোল্যাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে ব্রাণ্ডেনবার্গের সাথে যুক্ত করা। এছাড়া তিনি ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি অনুযায়ী পোমারানিয়ার পূর্বাংশ লাভ করেন। সুয়েডদের বিতাড়িত করে

সুইডেনের পশ্চিমাংশ অধিকার করতেও তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এক কথায় বলা যায়, গ্রেট ইলেক্টরের উদ্দেশ্য ছিল সুইডেন ও পোল্যাণ্ডের বিবাদের সুযোগ নিয়ে নিজ দেশের স্বার্থসিদ্ধি করে বাল্টিক এলাকায় সাম্রাজ্য বিস্তার। পোল্যাণ্ডের সাথে এক চুক্তির বিনিময়ে তিনি পূর্ব প্রাশিয়াকে পোলিশদের কবলমুক্ত করেন। এটা বাস্তবিকই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক জয়। তিনি ১৬৭৫ খ্রীঃ ফারবেলিনের যুদ্ধে সুইডেনকে পরাজিত করেন এবং পোমারানিয়া থেকে সুয়েডদের সম্পূর্ণ বিতাড়িত করেন। এইভাবে তিনি ব্রাণ্ডেন-বার্গের সামরিক শক্তির প্রকাশ দেখান। উইলিয়াম তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রেও কোনো অংশে কম সফল হয়নি। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হ'ল খণ্ডবিচ্ছিন্ন রাজ্য-গুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে তাঁর যোগ্য নেতৃত্বাধীনে আনয়ন। তিনি তাঁর সামরিক বাহিনীকে ঢেলে সাজান এবং প্রাশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটান। বহু জনকল্যাণমূলক কাজের দ্বারা তিনি তাঁর প্রজাদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করেন। উইলিয়াম দি গ্রেট ইলেক্টরের রাজত্বকালে ব্রাণ্ডেনবার্গ ইউরোপে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের মর্যাদালাভ করে। তাঁকে প্রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিপ্রস্তর রচয়িতা বলা যায়। তিনি তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা মহান ফেডারিকের রাজত্বকালের পথ প্রস্তুত করেন। সুদীর্ঘ ৪৮ বছর রাজত্ব করার পর গ্রেট ইলেক্টর ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

ফ্রেডারিক বার্বারোসা

[শাসনকাল ১১৫২-১১৯০ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বাদশ শতাব্দীতে জার্মানীর একজন রাজা ছিলেন। প্রথম ফেডারিক (যিনি বার্বারোসা নামেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন) ১১৫২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বসম্মতিক্রমে জার্মানীর সম্রাট নির্বাচিত হন। ফেডারিক বার্বারোসা ছিলেন হোহেনস্টফেন বংশোদ্ভূত। সিংহাসনে আরোহণ করেই ফেডারিক বিরোধী গোষ্ঠী ওয়েল্‌ফ্‌সের সঙ্গে শান্তি স্থাপনে উদ্‌যোগী হন। তিনি ওয়েল্‌ফ্‌সদের নেতা হেনরী দি লায়নের স্বাধীনতা এবং বেশ কয়েকটি অঞ্চলের উপর তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেন। এইভাবে তিনি শক্তিশালী বিরোধী অভিজাতগোষ্ঠীকে শত্রু থেকে মিত্রে পরিণত করেন। ফেডারিক এরপর জার্মানীর আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন ও জার্মান রাজতন্ত্রের হাত শক্তিশালী করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

চার্চ সংক্রান্ত বিষয়ে ফেডারিক খুবই সাফল্যলাভ করেন। তিনি পোপের সম্মতি ছাড়াই ম্যাগডেবার্গের আর্চবিশপকে মনোনীত করেন। এমনকি রাজনৈতিক কারণে তিনি মেইনজের আর্চবিশপ এবং একদল বিশপকে ক্ষমতাচ্যুত করতেও দ্বিধান্বিত হননি। মাত্র দু'বছরের মধ্যেই ফেডারিক জার্মানীতে তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম

হন। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ফ্রেডারিক মূলতঃ তিনটি লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন : (ক) ওয়েল্‌ফ্‌সের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ; (খ) আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা দমন এবং (গ) জার্মান চার্চের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। তাঁর এই তিনটি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছিল।

ফ্রেডারিক ইতালী জয়ের গভীর বাসনা পোষণ করতেন এবং তাঁর রাজত্বকালের সুদীর্ঘ বছরগুলোতে তিনি তাঁর এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াসী হন। তাঁর কাছে ইতালী জার্মানীর চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা। তিনি জার্মানীও ইতালীকে পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের দুটি বিভাগ বলে মনে করতেন। ইতালী অধিকারের জন্য তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছিল। ফ্রেডারিকের বৈদেশিক নীতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে কেউ কেউ তাঁকে রাজনীতিবিদ হিসাবে নিম্নমানের বলে অভিহিত করেছেন. যেহেতু অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব ফিরিয়ে আনার দিকেই তাঁর ছিল একমাত্র লক্ষ্য। পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অনেকাংশে রোমান্টিক। এমনকি তিনি নিজেকে কনস্টানটাইন, জাস্টিনিয়ান, শার্লেমান প্রভৃতি সম্রাটদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে দুনিয়া শাসনের যে স্বপ্ন দেখতেন তা ছিল নিতান্তই বাস্তববোধ-বর্জিত। সিংহাসনে আরোহণের পর প্রথম দু'বছর তিনি জার্মানীতে যে সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তার থেকে শাসক হিসাবে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু তিনি তাঁর দেশের উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়ার পরিবর্তে ইতালী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে প'ড়ে মস্ত ভুল করেন। ফ্রেডারিকের শেষ উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল ইউরোপের নেতা হিসাবে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে যোগদান—যে নেতৃত্বপদ বরাবর পোপই লাভ করতেন। ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক তৃতীয় ধর্মযুদ্ধে যোগদান করেন এবং ১১৯০ খ্রীঃ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এর পরিচালনভার গ্রহণ করেন।

বরবক শাহ

[শাসনকাল ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ]

ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান জালালউদ্দিনকে হত্যা করে তাঁর প্রাসাদরক্ষী বাহিনীর হাবসী প্রধান শাহজাদা ১৪৮৭ খ্রীঃ বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। এই সময় বাংলার রাজ দরবারে আমীর-ওমরাহ গোষ্ঠী যে কত দুর্বল হয়ে পড়েছিল হাবসী ক্রীতদাসদের সিংহাসন দখলই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সিংহাসনে বসতে শাহজাদাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। শাসনভার গ্রহণ করেই তিনি বরবক শাহ নাম ধারণ করেন। ব্লকম্যান যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের রক্ষাকর্তা থেকে হাবসী ক্রীতদাসেরা সরাসরি দেশের প্রভু হয়ে বসে।

বরবক শাহ তাঁর চতুর্দিকে জড়ো হওয়া বহু নিম্নবংশোদ্ভূত ব্যক্তিকে উচ্চপদে নিয়োগ

করেন এবং প্রাক্তন রাজানুগত ব্যক্তিদের উচ্ছেদের প্রয়াস চালান। কিছুদিনের মধ্যে জালালউদ্দিনের একান্ত বিশ্বস্ত হাবসী সেনাধ্যক্ষ মালিক আন্দিল তাঁর সামরিক অভিযান শেষ করে রাজধানীতে ফিরে আসেন। আন্দিলকে এক গুরুগম্ভীর শপথানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা করানো হয় যে যতদিন বরবক সুলতান থাকবেন ততদিন তিনি তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না। কিন্তু আন্দিল মনে মনে তাঁর প্রভু জালালউদ্দিনের হত্যার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হন এবং বরবককে হত্যা করেন। কতদিন এই হাবসী খোজার রাজত্ব স্থায়ী হয়েছিল তা জানা যায় না কারণ তাঁর আমলের কোনো মুদ্রা বা লিপি পাওয়া যায়নি। সালিমের মতে বরবক শাহের রাজত্ব মাত্র ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল।



বলবন

[শাসনকাল ১২৬৫-১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে দিল্লীর 'দাস' বংশের একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন। গিয়াসউদ্দিন বলবন ১২৬৫ থেকে ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজকার্য পরিচালনা করেছিলেন। এছাড়া ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন মামুদের রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় বলবনই রাজকার্য দেখাশোনা করতেন। সুতরাং সিংহাসনে বসার পূর্বেই শাসন বিষয়ে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করেন। নাসিরউদ্দিনের আমলে বলবন লক্ষ্য করেন যে চল্লিশ বান্দাচক্রের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমশঃ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠার পথে এক মস্ত অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাই সিংহাসনে আরোহণ করেই বলবন এই তুর্কী অভিজাতদের দমন করতে সচেষ্ট হলেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারণী মন্তব্য করেছেন যে বলবনের সিংহাসনে আরোহণের সময় দেশে আইন-শৃংখলা বলে কিছু ছিলনা এবং সুলতানী শাসন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। দেশে সুশাসনের অভাবে রাজশক্তিকে কেউ সমীহ করে চলত না।

সিংহাসনে আরোহণ করেই বলবন ঘোষণা করলেন যে একমাত্র সুলতানই হলেন সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী এবং রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে আর কারো হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। রাজদরবারের হালচালও অল্পদিনের মধ্যে তিনি পাল্টে ফেললেন। তিনি কঠোর মনোভাব প্রদর্শন ক'রে সুলতানের হৃত মর্যাদা পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হলেন। অভিজাত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মনে সুলতানের প্রতি ভীতি ও সম্ভ্রম জাগানোর উদ্দেশ্যে বলবন বদাউনের শাসককে ভৃত্যহত্যার অপরাধে প্রকাশ্য রাজপথে বেত্রাঘাত করেন এবং বাংলার বিদ্রোহী শাসক তুঘ্রীল খাঁকে দমনে ব্যর্থ হওয়ায় আমীর খাঁকে ফাঁসিকাঠে ঝুলান। উদ্ধত ও ক্ষমতাপ্রিয় বান্দাচক্রের প্রধান শেরখানকে (সম্পর্কে বলবনের জ্ঞাতি ভাই) বলবন বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিলেন বলে জানা যায়। এইভাবে বলবন সুলতানের বিরুদ্ধে সকল প্রকার চক্রান্ত ও পরিকল্পনার সম্ভাবনা দূর ক'রে সুলতানী শাসনের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করেন। এ ছাড়া তিনি দিল্লী ও তার আশপাশ অঞ্চল থেকে দস্যু ও লুঠেরার দলকে নির্মূল ক'রে জনসাধারণের জীবনযাত্রা নিরাপদ করেন।

বলবন জানতেন যে সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব একটি সুদক্ষ সৈন্যবাহিনীর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই তিনি সৈন্যবিভাগে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন ক'রে সৈন্যবাহিনীর শক্তি অনেক বৃদ্ধি করেন। তাঁর সময়ে বাংলার শাসক তুঘ্রীল খাঁ সুলতানের কর্তৃত্ব উপেক্ষা ক'রে স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে থাকলে বলবন তিনবার তার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে ব্যর্থ হলেন। চতুর্থবার নিজে এক বিশাল সৈন্য-বাহিনী নিয়ে অভিযান ক'রে বহুদিন চেষ্টার পর অবশেষে তুঘ্রীল খাঁকে বন্দী ও হত্যা করেন। ক্রুদ্ধ সুলতান বাংলার রাজধানী শহর লখ্নৌতির রাজপথে বহু ফাঁসির মঞ্চ স্থাপন ক'রে তুঘ্রীলের অনুচরদের হত্যা করেন। তিনি পুত্র বুঘরা খাঁর হস্তে বাংলার শাসনভার অর্পণ ক'রে দিল্লীতে ফিরে আসেন।

বলবনের সময় মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ মোঙ্গল জাতি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ঘন ঘন অভিযান চালাতে থাকে। তাই বলবনকে সর্বদা মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে তিনি আর যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবিস্তারের সুযোগ পাননি। একবার তাঁর সভাসদ্‌রা তাঁকে গুজরাট ও মালব জয়ের পরামর্শ দিলে সুলতান উত্তর দেন যে সাম্রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে তিনি বিদেশী হানাদারের হাতে দেশের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে মোটেই আগ্রহী নন। বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়েই মৃত্যুবরণ করেন। মহম্মদ ছিলেন বলবনের খুবই প্রিয় এবং তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। শোকগ্রস্ত বলবন প্রিয়পুত্রের মৃত্যুর বছর খানেকের মধ্যে নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হন (১২৮৭)।

বলবন গোলাম বংশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। রাজ্যশাসনে অনেক সময়ই তাঁর কঠোরতার মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলেও ভারতবর্ষে নব প্রতিষ্ঠিত মুসলমান রাষ্ট্র তাঁর জন্যই রক্ষা পেয়েছিল।

বল্লাল প্রথম

[শাসনকাল ১১০০-১১১০ খ্রীষ্টাব্দ]

হোয়সল বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা। প্রথম বল্লাল মোট দশ বছর রাজত্ব করেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি স্বীয় শক্তিবৃদ্ধিতে মন দেন। তাঁর আমলকে হোয়সল রাজবংশের ইতিহাসে প্রস্তুতি পর্ব বলা চলে। বলুড়ে তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ দোরসমুদ্রে প্রথম বল্লাল একটি দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বল্লাল সেন

[শাসনকাল ১১৫৮-১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ]

বল্লাল সেন পিতা বিজয়সেনের মৃত্যুর পর ১১৫৮ খৃীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল দেশে শান্তি, নানাপ্রকার সংস্কারকার্য ও জনগণের সমৃদ্ধির কাল হিসাবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সামরিক ও কূটনৈতিক দিক দিয়ে পিতার মত অত দক্ষ না হলেও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পৈত্রিক সাম্রাজ্য সুচারুরূপেই পরিচালনা করেন এবং তা আরও বিস্তৃত করেন। সমসাময়িক সাহিত্য ও অন্যান্য উৎস থেকে জানা যায় বল্লাল বিহার অভিমুখে অভিযান চালিয়ে মগধ ও মিথিলা জয় করেন। এছাড়া আরও দুই একটি স্থান তিনি হয়ত জয় করে থাকবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর সামরিক কৃতিত্বের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে বল্লাল সেনের রাজত্বের সীমা বাংলা ও উত্তরবিহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বল্লাল সেন একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বয়ং কয়েকটি গ্রন্থের স্রষ্টা। তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' লেখক হিসাবে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। গোঁড়া হিন্দু নিয়মকানুন ও অন্যান্য সামাজিক সংস্কারের স্রষ্টা হিসাবে তিনি ইতিহাসে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন। বাংলাদেশে কৌলিন্য প্রথা তিনিই প্রবর্তন করেন বলে অনেকে মনে করেন। সম্ভবতঃ ১১৭৮ খৃীষ্টাব্দ নাগাদ বল্লাল সেন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বষিষ্ক

[শাসনকাল ১০১-১০৬ খ্রীষ্টাব্দ]

কুষাণ বংশের রাজা ছিলেন। কনিষ্কের মৃত্যুর পর কুষান রাজ সিংহাসনে বসেন বষিষ্ক। তিনি সম্ভবতঃ কণিষ্কের পুত্র। বষিষ্ক মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেন। মথুরা ও সাঁচীতে তাঁর শিলালিপি পাওয়া গেছে। বষিষ্কের আমলে কুষাণ সামরিক শক্তি অনেক হ্রাস পায় এবং সম্ভবতঃ কুষাণ সাম্রাজ্যের আয়তনও বেশ কিছুটা সংকুচিত হয়েছিল।



বাবর

[শাসনকাল ১৫২৬-১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ]

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে মধ্য এশিয়ার ফরগনা রাজ্যের অধিপতি হন। বাবরের পিতার নাম ছিল ওমর শেখ মীর্জা। মধ্য দুই এশিয়ার দুর্ধর্ষ বীরের রক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হত। তিনি পিতৃকুলে ছিলেন তৈমুর বংশের পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ এবং মাতৃকুলে চেঙ্গিস খানের চতুর্দশ অধঃস্তন পুরুষ। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র ১১ বছর বয়সে বাবর পিতৃরাজ্যের অধিকারী হন এবং সমরখন্দ জয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁকে পিতৃরাজ্য থেকে বিতাড়িত হতে হয়। যাযাবরের মত বাবর অনেক দিন স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ান এবং অবশেষে ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে কাবুল জয় করেন। সেখানে নিজের ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি ভারতবর্ষ জয়ের জন্য অভিযান চালান এবং ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে লোদী বংশের সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাস্ত করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। তারপর খানুয়ার যুদ্ধে রাজপুত রাজা সংগ্রাম সিংহ ও গগরার যুদ্ধে আফগান শক্তিকে পরাজিত করে বাবর ভারতে মোগল শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। মাত্র ৪ বছর রাজত্ব করার পর ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বাবর শুধুমাত্র একজন প্রতিভাবান যোদ্ধা ও সাহসী রণনেতাই ছিলেন না, তিনি

ছিলেন শিল্প-সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। সারাজীবন অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকলেও তাঁর সুকুমার হৃদয়ানুভূতি গুলো শুকিয়ে যায়নি। তুর্কীভাষায় রচিত তাঁর আত্মজীবনী যে এক উঁচুদরের সাহিত্য কীর্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বার্লো

[শাসনকাল ১৮০৫-১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে জর্জ বার্লো ভারতবর্ষে ইংরাজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। তাঁর কার্যকাল মাত্র দুবছর স্থায়ী হয়েছিল। জর্জ বার্লো শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন এবং যে কোনো উপায়ে দেশীয় রাজ্যগুলোর সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। গভর্নর জেনারেল মনোনীত হবার আগে তিনি কলিকাতা কাউন্সিলের একজন অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন। তিনি ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত মনোভাব গ্রহণ করেন। তিনি সিন্ধিয়ার সাথে সন্ধি স্থাপন করে তাঁকে গোয়ালিয়র ও গোহাড প্রত্যর্পণ করেন। ইতিমধ্যে কোম্পানীর সেনাধ্যক্ষ লর্ড লেক হোলকারকে যুদ্ধে পরাজিত করলে লেকের তীব্র প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে বার্লো হোলকারের সাথে অত্যন্ত উদার মনোভাব দেখিয়ে সন্ধি স্থাপন করেন এবং টঙ্ক, রামপুর প্রভৃতি স্থান তাঁকে ফিরিয়ে দেন। বার্লোর সময়ে কোম্পানীর রাজ্যবিস্তার নীতি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় কোম্পানী যুদ্ধ বিগ্রহের বিপুল ব্যয়ভার থেকে রক্ষা পায় এবং কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো বার্লোর স্থলাভিষিক্ত হন।

বাসুদেব প্রথম

[শাসনকাল ১৩৮-১৭৬ খ্রীষ্টাব্দ]

কুষাণ বংশের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। প্রথম বাসুদেব হুবিষ্কের পর কুষাণ বংশের সিংহাসনে বসেন। সম্ভবতঃ ১৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজত্ব শুরু হয় এবং দীর্ঘ ৩৮ বছর তিনি রাজকার্য পরিচালনা করেন। বাসুদেবের সাম্রাজ্যসীমা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা উপযুক্ত তথ্যের অভাবে সম্ভব হয়নি। মনে হয় তাঁর রাজত্বকালে স্থানীয় প্রধানদের বিদ্রোহের ফলে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের অনেক অঞ্চলেই কুষাণদের আধিপত্য শিথিল হয়ে আসে। তাঁর আমলের অধিকাংশ শিলালিপি পাওয়া গেছে উত্তর প্রদেশের মথুরায়। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে মূলতঃ মথুরা ও তার আশে পাশেই বাসুদেবের সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর নাম বাসুদেব হলেও তাঁর আমলের মুদ্রাগুলোতে শিবের মূর্তি অঙ্কিত থাকায় মনে হয় তিনি শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাসুদেবের মৃত্যুর সাথে সাথে কুষাণ সাম্রাজ্য দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হয়।

বাসুদেব কান্ব

[শাসনকাল ৭২-৬১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

কাণ্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বাসুদেব কাণ্ব। তিনি ছিলেন সুঙ্গ রাজা দেবভূতির মন্ত্রী। দেবভূতি শাসক হিসাবে দুর্বল ও অপদার্থ ছিলেন। ৭২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বাসুদেব কান্ব তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁকে হত্যা করেন এবং মগধের রাজসিংহাসন দখল করেন। এইভাবে পুষ্যমিত্র প্রতিষ্ঠিত সুঙ্গ বংশের অবসান ঘটে এবং ইতিহাসে কাণ্ব রাজবংশের সূচনা হয়। বাসুদেব ছিলেন কাণ্ব গোত্রভুক্ত একজন ব্রাহ্মণ। তিনি দশ বছর এক ক্ষুদ্র এলাকার অধিপতি হিসাবে রাজ্যশাসন করেন এবং তাঁর সাম্রাজ্য শুধুমাত্র মগধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বাহমন শাহ

[শাসনকাল ১৩৪৭-১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দ]

বাহমনী বংশের সুলতান ছিলেন। ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে বাহমনী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। হাসান গঙ্গু সুলতান হয়ে আলাউদ্দিন বাহমন শাহ নাম ধারণ করেন এবং তাঁর নামানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম হয় বাহমনী বংশ। বাহমন শাহ ছিলেন একজন শক্তিশালী শাসক ও বীর যোদ্ধা। তিনি গুলবর্গাকে তাঁর রাজধানী করেন। বাহমন শাহের সাম্রাজ্য উত্তরে বেরার থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী এবং পশ্চিমে দৌলতাবাদ (দেবগিরি) থেকে পূর্বে ভঙ্গির পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শাসক হিসাবেও বাহমন শাহ অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন এবং ন্যায় বিচারক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। প্রজা কল্যাণে তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহমন শাহ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বাহলুল লোদী

[শাসনকাল ১৪৫১-১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দ]

লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাহলুল লোদী ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি জাতিতে আফগান ছিলেন। সৈয়দ বংশের শেষ সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহ যখন বাহলুলের হস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন তখন তিনি লাহোরের শাসনকর্তা ছিলেন। বাহলুল লোদীর সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে সৈয়দ শাসনের অবসান ঘটে এবং নতুন লোদী বংশের রাজত্ব শুরু হয়। বাহলুল লোদী একজন শক্তিশালী ও উচাকাঙ্ক্ষী শাসক ছিলেন। তিনিই হলেন ভারত-ইতিহাসের প্রথম আফগান সুলতান যিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। বাহলুল অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে সুলতান হন। কিন্তু তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ়চেতা। তাঁর

আমলে সুলতানী শাসন দিল্লী ও তার আশপাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তিনি সুলতানী শাসনের পূর্বশক্তি ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। তিনি প্রভাবশালী বৃদ্ধ মন্ত্রী হামিদ খানের প্রভাবমুক্ত হবার জন্য সুকৌশলে তাঁকে বন্দী করেন। জৌনপুরের শাসক মুহম্মদ শাহ দিল্লী অধিকার করার চেষ্টা করলে বাহলুল তাঁকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি একে একে সম্বল, কোলি, সুকেত, রেওয়ারী এটাওয়া, চান্দওয়ার প্রভৃতি অঞ্চলের প্রধানদের তাঁর অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন। মেওয়ার ও দোয়াব অঞ্চলের বিদ্রোহী নেতাদেরও তিনি শক্ত হাতে দমন করেন। ১৪৮৬ খৃঃ বাহলুল জৌনপুর রাজ্যটি জয় করে নিজ জ্যেষ্ঠ্যপুত্র বরবক শাহকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। গোয়ালিয়রের রাজা কিরাত সিংকে পরাস্ত করে দিল্লী ফেরার পথে বাহলুল অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয় (১৪৮৯)। শাসক হিসাবে বাহলুল নিঃসন্দেহে ফিরুজ শাহ তুঘলকের পরবর্তী সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি প্রজাদরদী ছিলেন এবং নিজে বিশেষ শিক্ষিত না হলেও জ্ঞাণী-গুণীর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।



বাহাদুর শাহ দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৮৩৭-১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বিতীয় আকবরের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৮৩৭ খৃঃ)। তিনি হলেন শেষ মোগল সম্রাট। পূর্ববর্তী শাসকদের মত তিনিও নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন। মোগল রাজশক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি বলতে তখন আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট ছিলনা। তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের মত তিনিও ইংরেজ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী নিছকই এক দর্শকে পরিণত হন। ভারতে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা বাহাদুর শাহের ছিলনা। মোট কুড়ি বছর মোগল বাদশাহের পদে আসীন থাকার পর ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। বিদ্রোহী সিপাহীদের পক্ষাবলম্বন করার অভিযোগে ইংরেজরা তাঁকে সুদূর রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে। সেখানে পাঁচ বছর বন্দীজীবন কাটাবার পর বৃদ্ধ সম্রাট ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন (১৮৬২)।

বিক্রমাদিত্য প্রথম

[শাসনকাল ৬৫৫-৬৮১ খ্রীঃ]

সপ্তম শতাব্দীতে চালুক্য বংশের রাজা ছিলেন। পল্লব আক্রমণে পূর্ববর্তী শাসক দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যু হয় এবং চালুক্য রাজধানী বাতাপি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চালুক্য শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হলেও এক দশকের অধিককাল চালুক্য বংশের শাসন বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। অবশেষে ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য আবার চালুক্য শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি গঙ্গ বংশের সহায়তায় পল্লবদের হাত থেকে ৬৫৪ খ্রীঃ বাতাপি উদ্ধার করেন এবং পরের বছর চালুক্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। প্রথম কয়েক বছর ধরে নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে তারপর একসময় প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম শুরু করেন। তিনি পল্লবদের চালুক্য সাম্রাজ্য থেকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করেন এবং তুঙ্গভদ্রা নদী আবার চালুক্য সাম্রাজ্যের সীমানা বলে চিহ্নিত হয়। কিন্তু পল্লবরা ছিল চালুক্যদের জাতশত্রু। তাই এখানেই বিরোধের অবসান ঘটল না। প্রথম বিক্রমাদিত্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে পল্লবদের রাজ্য আক্রমণ করে পল্লব রাজাকে পরাজিত করেন এবং কাঞ্চি অধিকার করে নেন। এরপর তিনি একে একে চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদের পরাজিত করেন। কিন্তু পল্লবরাজ দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু রাজ্যের সাথে সম্মিলিতভাবে তাঁকে আক্রমণ করলে বিক্রমাদিত্য পরাজিত হন। পঁচিশ বছরের অধিককাল রাজত্ব করার পর ৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিক্রমাদিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয়

[শাসনকাল ৭৩৩-৭৪৫ খ্রীঃ]

অষ্টম শতাব্দীতে চালুক্য বংশের রাজা ছিলেন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পিতা বিজয়াদিত্যের মৃত্যুর পর ৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মোট বারো বছর রাজত্ব করেন। তাঁর আমলে চিরশত্রু পল্লবদের সাথে নতুন করে চালুক্যদের যুদ্ধ শুরু হয়। বিক্রমাদিত্য এই যুদ্ধে পল্লবদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। তাঁর আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে পল্লবরাজ দ্বিতীয় নন্দীবর্মন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। তিনি পল্লব রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করে নেন। এর পর আরও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রমাদিত্য চোল, পাণ্ড্য, কেরল প্রভৃতি রাজ্যগুলোকে পরাজিত করেন এবং দক্ষিণের সমুদ্রতীরে এক বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি আরবদেরও এক যুদ্ধে পরাজিত করেন। আরবরা সিন্ধুদেশ থেকে দাক্ষিণাত্য অভিযান করলে

বিক্রমাদিত্যের সেনাবাহিনীর হাতে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের আমলে চালুক্য-সামরিক শক্তির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে এবং চালুক্যদের প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই বিস্তার ও গৌরবের পশ্চাতে পতনের বীজও নিহিত ছিল যা বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর প্রকাশ পেতে থাকে। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিজয়

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জাভায় একজন হিন্দুবংশীয় ব্যক্তি একটি নতুন স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর রাজধানীর নামকরণ করেন তিক্তবিল্ব যার জাপানী নাম হল মাজাপাহিত। তিনি পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো জয় করেন এবং ১০৬৫ খ্রীঃ নাগাদ তাঁর সাম্রাজ্য মালয় উপদ্বীপ ও তাঁর চতুপার্শ্বস্থ দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বিজয় কতবছর রাজত্ব করেছিলেন তা জানা সম্ভব হয়নি।

বিজয়াদিত্য

[শাসনকাল ৬৯৬-৭৩৩ খ্রীঃ]

প্রাচীন চালুক্য বংশের একজন রাজা। বিজয়াদিত্য পূর্ববর্তী শাসক বিনয়াদিত্যের মৃত্যুর পর ৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিজয়াদিত্যের রাজত্বকালে পল্লবদের সাথে চালুক্যদের পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হয়। বিজয়াদিত্য কাঞ্চী অধিকার করেন এবং পল্লবরাজ দ্বিতীয় পরমেশ্বর বর্মনকে কর প্রদানে বাধ্য করেন। বিজয়াদিত্য শৈবধর্মের অনুরাগী ছিলেন এবং বিজাপুরের নিকট একটি চমৎকার শিবমন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর রাজ্যে বহু জৈন বাস করত। তিনি জৈনদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন এবং জৈন পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তিদের সরকারী সাহায্য দিতেন। প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করার পর বিজয়াদিত্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিজয় সিংহ

[শাসনকাল খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী]

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের সমসাময়িককালে বাংলায় সিংহবাহু নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। বিজয় সিংহ ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ছোটবেলা থেকেই বিজয় সিংহ অত্যন্ত উদ্দাম বেপরোয়া জীবন যাপন করতেন। বিজয়ের হাবভাব তাঁর পিতাকে পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কিত করে তোলে। কিন্তু বহু প্রয়াস চালিয়েও

তিনি অবাধ্য পুত্রকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন। অল্পবয়স থেকেই বিজয় সিংহের মধ্যে দুঃসাহসিক অভিযানের নেশা পেয়ে বসে এবং তিনি সর্বদাই মনে মনে খুব বড় কিছু করার বাসনা পোষণ করতেন। পিতার রাজরোষে পড়ে অবশেষে তাঁকে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে হয়। তিনি সাতশোজন সাহসী অনুচর নিয়ে সুদূর লঙ্কাদ্বীপ অভিমুখে তাঁর রণতরীগুলো নিয়ে যাত্রা করেন। এই সময় বাঙালীরা সমুদ্রযাত্রায় বেশ অভ্যস্ত ছিল। বর্তমান মেদিনীপুরের তমলুক (প্রাচীন তাম্রলিপ্ত) ছিল একটি বড় সমুদ্র বন্দর। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে দীর্ঘদিন পর অবশেষে বিজয় সিংহ একদিন শ্রীলঙ্কাদ্বীপে পেঁছিলেন। তারপর একসময় সুযোগ বুঝে সেখানকার রাজদুর্গ আক্রমণ করে জয় করে নিলেন। অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র দ্বীপটিতে তাঁর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল এবং নববিজিত রাজ্যের নাম হল সিংহল। বিজয় সিংহের প্রতিষ্ঠিত বংশ সিংহলে দীর্ঘকাল ধরে রাজত্ব চালিয়েছিল বলে জানা যায়। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ অভিযানের জন্য বিজয় সিংহ বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বিজয় সেন

[শাসনকাল ১০৯৫-১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দ]

বিজয় সেন ছিলেন বাংলার সেনবংশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি পিতা হেমন্ত সেনের উত্তরাধিকারী হিসাবে ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠান করেন এবং দীর্ঘ ৬০ বছরেরও অধিককাল রাজত্ব করার পর ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বিজয়সেন রাধা নামক স্থানের এক সামান্য দলপতি হিসাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ঐ স্থানটি তিনি পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। ক্রমশঃ নিজ যোগ্যতাবলে সমসাময়িক রাজনীতিতে তিনি প্রাধান্য বিস্তার করেন এবং বঙ্গদেশে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। রামপালের মৃত্যুর পর পালবংশের দুর্বলতার সুযোগে বিজয় সেন সমগ্র বাংলার অধীশ্বর হবার প্রয়াস চালান। কলিঙ্গ রাজ অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গের সহায়তায় তিনি তাঁর সামরিক প্রভাব বৃদ্ধি করেন। অতঃপর তিনি পালদের হাত থেকে গৌড় ছিনিয়ে নিয়ে উত্তরবঙ্গের অধিপতি হন। তারপর বর্মণ বংশের রাজা ভোজবর্মণকে বিতাড়িত করে তিনি বাংলার বাইরে দৃষ্টি দেন এবং সামরিক অভিযান চালিয়ে একে একে কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করেন। সম্ভবতঃ তিনি উত্তর বিহারও জয় করেছিলেন।

বিজয় সেনের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। পাল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের ফলে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল বিজয় সেন তা পূর্ণ করেন। একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করে তিনি

বাংলার জনসাধারণকে আভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেন। তাঁর রাজত্বকালে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনগণ আবার সুখী ও স্বচ্ছল জীবনের আস্বাদ পায়। বিজয় সেনের রাজত্বকালের গৌরব রচনা করে কবি উমাপতিধর দেবপাড়া প্রশস্তি এবং শ্রীহর্ষ বিজয়প্রশস্তি রচনা করেছেন।

বিনয়াদিত্য

[শাসনকাল ৬৮১-৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ]

সপ্তম শতাব্দীতে চালুক্যবংশের একজন রাজা ছিলেন। বিনয়াদিত্য পিতা প্রথম বিক্রমাদিত্যের পর ৬৮১ খৃঃ চালুক্যবংশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং মোট পনের বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন। বিনয়াদিত্যের আমলে চালুক্য সাম্রাজ্য পূর্বাপেক্ষা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তিনি পল্লব, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি শক্তি-গুলোকে বশীভূত করেন। এছাড়া তাঁকে উত্তরাপথের অধীশ্বর বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু উত্তর ভারতে তিনি খুব বেশি সাফল্য অর্জন করেছিলেন বলে মনে হয় না। বরং একজন গুপ্ত রাজার হাতে তাঁর সেনাবাহিনীকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। বিনয়াদিত্য সিংহল ও পারস্যের রাজাদের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তারের যে দাবি করেন তা অতিশয়োক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। খুব বেশি হলে তাঁর সাথে ঐ দুই রাজ্যের দূত বিনিময় হয়েছিল। বিনয়াদিত্য ৬৯৬ খৃীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

বিন্দুসার

[শাসনকাল ৩০০-২৭২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

মৌর্য বংশের একজন রাজা। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর ৩০০ খৃীষ্ট পূর্বাব্দে (মতান্তরে ২৯৭) তার পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দুঃখের বিষয় বিন্দুসারের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা যায় না। ভারতীয় ও গ্রীক লেখকগণ তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু লেখেননি। দিব্যবদান থেকে জানা যায় যে বিন্দুসারের আমলে তক্ষশীলার জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই বিদ্রোহ দমনে বিন্দুসার তাঁর পুত্র অশোককে প্রেরণ করেছিলেন। বিন্দুসার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। পশ্চিমের গ্রীক শাসকদের সাথে তিনি বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন। সিরিয়ার গ্রীক রাজা, মেগাস্থিনিসের পরবর্তী দূত হিসাবে ডেম্যাকোসকে বিন্দুসারের রাজসভায় প্রেরণ করেন। মিশরের রাজা দ্বিতীয় টলেমিও পাটলিপুত্রে ডাইয়োনিসিয়াস নামক এক দূতকে প্রেরণ করেছিলেন।

বিন্দুসার পিতার মত প্রতিভাবান ও যোগ্যতাসম্পন্ন না হলেও মোটামুটি শক্তিশালী

শাসক ছিলেন এবং পিতার বিশাল সাম্রাজ্য সংরক্ষণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য তার আমলে সংগঠিত হয়। ২৭২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বিন্দুসার পরলোকগমন করেন।

বিম্বিসার

[শাসনকাল ৫৪৫-৪৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ]

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বিম্বিসারের নেতৃত্বে মগধের অভ্যুদয় ভারত ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। মগধের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন বিম্বিসার। সিংহাসনে বসে তিনি শ্রেণিক উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিভাবান ও পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁর যথেষ্ট রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও ছিল। তিনি হর্যঙ্ককুল কিংবা শিশুনাগবংশীয় ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের সঠিক সময় জানা যায় না। তিনি নিজের বাহুবলে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো জয় করে মগধের সীমা অনেক বিস্তৃত করেন। উত্তর ভারতের দুই প্রধান রাজ্য কোশল ও বৈশালীর রাজবংশের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে তিনি নিজেকে আরও শক্তিশালী করে তোলেন এবং এই সম্পর্ক স্থাপন তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়।

প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের মধ্যে বিম্বিসারই প্রথম এক দক্ষ ও সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। বিম্বিসারের সময় মগধের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। বিম্বিসার অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও প্রজানুরাগী শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধদেবের একজন গুণগ্রাহী। বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বিম্বিসারের প্রাসাদে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। পুত্র অজাতশত্রুর হাতে ৪৯৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ নাগাদ তাঁর মৃত্যু ঘটে।

বিরূপাক্ষ দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৪৬৫-১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ]

বিজয়নগর রাজ্যের একজন রাজা। দ্বিতীয় বিরূপাক্ষ সঙ্গম বংশীয় ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী শাসক মল্লিকার্জুনের উত্তরাধিকারী হিসাবে ১৪৬৫ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন দুর্বল ও অযোগ্য শাসক। তাঁর আমলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটে এবং শাসন ব্যবস্থায় শিথিলতা আসার ফলে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এমনকি কতকগুলো প্রদেশ বিদ্রোহ ঘোষণাও করে। সুযোগ বুঝে বাহমনী সুলতান কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল পর্যন্ত এবং উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম গজপতি দক্ষিণে তিরুভনমালাই পর্যন্ত অগ্রসর হন। বিজয়

নগর সাম্রাজ্যকে এই পরিস্থিতির হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য নরসিংহ সালুভ তাঁর অপদার্থ প্রভুকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হয়ে বসেন (১৪৮৬)। দ্বিতীয় বিরূপাক্ষের শাসনের অবসানের সাথে সাথে বিজয়নগরের ইতিহাসে সঙ্গম বংশের শাসনের অবসান হয়।

বিশ্বরূপ সেন

[শাসনকাল ১২০৫-১২২০ খ্রীষ্টাব্দ]

বাংলার সেন বংশের রাজা বিশ্বরূপ সেন লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পর ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের (পূর্ব বাংলা) অধিপতি হন। দক্ষিণ বঙ্গের উপরও সম্ভবতঃ তার শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। লক্ষণাবতীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইয়াজ বিশ্বরূপ সেনের রাজ্য আক্রমণ করলে তিনি সাফল্যের সাথে সে আক্রমণ প্রতিহত করেন। বিশ্বরূপ সেন সূর্যদেবতার উপাসক ছিলেন। পনের বছর রাজত্ব করার পর আনুমানিক ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বরূপ সেন পরলোকগমন করেন।

বিষ্ণুবর্দ্ধন

[শাসনকাল ১১১০-১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ]

হোয়সল রাজশক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠালাভ ঘটেছিল রাজা বিষ্ণুবর্ধনের রাজত্বকালে। বিষ্ণুবর্ধন ১১১০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং দীর্ঘ ৩৮ বছর রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী সমরনায়ক। তিনি গঙ্গদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে মহীশূর জয় করেন এবং চোলদের পরাজিত করে তাদের রাজ্যাংশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি দোরসমুদ্রে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। বিষ্ণুবর্ধনের শক্তিবৃদ্ধি ক্রমশঃ তাঁকে পশ্চিমী চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁকে চালুক্য আধিপত্য স্বীকার করে নিতে হয়।



বিসমার্ক

[শাসনকাল ১৮৬২-১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রাশিয়া তথা জার্মানীর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অটো ফন বিসমার্ক ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ্। তিনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সম্রাট প্রথম উইলিয়ামের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি প্রাশিয়ার এক সংকটকালে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। জার্মানী সুদীর্ঘকাল ধরে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ফ্রাংকফুর্ট পার্লামেন্টে জার্মানীর ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টা চালানো হলেও শেষ পর্যন্ত তা সফল হতে পারেনি। বিসমার্ক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েই প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্যসাধনে সচেষ্ট হন। তিনি তাঁর ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'পলিসি অব ব্লাড এ্যান্ড আয়রণ' বা 'রক্ত ও লৌহনীতি' প্রচার করে বলেন যে শান্তিপূর্ণভাবে জার্মানীর ঐক্যসাধন সম্ভব হবেনা, সামরিক শক্তির প্রয়োগ ও রক্তপাতের মধ্যদিয়েই একমাত্র তা সম্ভব হবে। কূটনীতির এক নিপুণ জাদুকর বিসমার্ক অতি দ্রুত প্রাশিয়ার সামরিক শক্তিবৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করেন। গণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী বিসমার্ক ছিলেন রাজতন্ত্রের একজন গোঁড়া সমর্থক। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করতে তাঁকে তিনটি যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল। জার্মানীর ঐক্যস্থাপনের পথে তিনটি বিদেশী শক্তি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই বিসমার্ক যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানীর উপর এই তিন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও প্রভাব সম্পূর্ণ বিনষ্ট করার পরিকল্পনা করেন।

জার্মানীর অন্তর্গত শ্লেজ্‌ভিগ্‌ ও হল্‌স্টেইন প্রদেশ দুটিকে কেন্দ্র করে বিসমার্ক প্রথমে ডেনমার্কের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সহায়তায় ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ খ্রীশ্চয়ানকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং ভিয়েনা চুক্তির (১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) মাধ্যমে ঐ দুটি অঞ্চল ডেনমার্কের কবলমুক্ত করেন। তিনি অস্ট্রিয়ার সাথে গ্যাস্টিনের সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু জার্মানীর ঐক্যস্থাপনের পথে অস্ট্রিয়া ছিল প্রধান প্রতিবন্ধক। তাই বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালাতে থাকেন। তিনি

নিপুণ কূটনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে অস্ট্রিয়াকে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। বিসমার্ক ইতালী, রাশিয়া ও ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকেও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। তারপর গ্যাস্টিনের সন্ধির শর্ত না মানার অজুহাতে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে স্যাডোয়া নামক স্থানে এক যুদ্ধ হয় (১৮৬৬)। এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে বিসমার্ক অস্ট্রিয়াকে 'প্রাগের সন্ধি' (১৮৬৬) স্থাপনে বাধ্য করেন। এই সন্ধির মাধ্যমে জার্মানীর উপর অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। স্যাডোয়ার যুদ্ধ নিঃসন্দেহে সমসাময়িক ইউরোপীয় ইতিহাসের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কারণ এর পর থেকে বার্লিন ভিয়েনার পরিবর্তে ইউরোপীয় রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং প্রাশিয়া এক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী রাজ্য হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। স্যাডোয়ার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জার্মানীর উত্তরাংশ প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং জার্মানীর ঐক্যসাধনের কাজ অনেকখানি অগ্রসর হয়। এরপর বাকী থাকে দক্ষিণাংশকে ফরাসী প্রভাব থেকে মুক্ত করা। এক্ষেত্রেও বিসমার্ক কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে প্রাশিয়ার সম্রাট উইলিয়ামের প্রেরিত 'এমস টেলিগ্রাম' এর বেশ কয়েকটি শব্দ এমনভাবে বিকৃত ক'রে প্রচার করেন যার ফলে উভয় দেশের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝি ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়। বিসমার্ক এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ক্ষিপ্ত হয়ে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে বিসমার্ক বিজয়ী হন। যুদ্ধের পূর্বে বিসমার্ক কূটনীতি প্রয়োগের সাহায্যে ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে ফেলেছিলেন। অপরপক্ষে তিনি একাধিক ইউরোপীয় শক্তির সমর্থন লাভ করেন। ফ্রান্স প্রাশিয়ার সাথে 'ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্ধি' (১৮৭১) স্থাপনের মাধ্যমে প্রাশিয়ার দক্ষিণাংশের উপর (আলসাস্-লোরেন, মেইন প্রভৃতি অঞ্চল) তার সব দাবি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এইভাবে কয়েক বছরের মধ্যেই পরপর তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে বিসমার্ক জার্মানীর ঐক্যবিধানের কাজ সম্পূর্ণ করেন।

জার্মান ঐক্যের কাজ সম্পূর্ণ করার পর বিসমার্ক সমগ্র জার্মানীর চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন (১৮৭১)। এরপর তিনি পুনর্গঠনের কাজে ব্রতী হন। তিনি বহুমুখী শাসন সংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে জার্মানীকে স্বল্পকালের মধ্যেই ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করেন। চ্যান্সেলর পদে নিযুক্ত হবার পর থেকে তাঁর পদত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত বিসমার্ক অত্যন্ত দক্ষভাবে জার্মানীর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় জার্মানী ইউরোপীয় রাজনীতির মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। জার্মান সম্রাট কাইজার প্রথম উইলিয়ামের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানীর রাজা হ'লে তাঁর সাথে বিসমার্কের

মতান্তর ঘটে। ফলে বিসমার্ক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন (১৮৯০)। ১৮৭০-১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাস্তবিকই বিসমার্ক ছিলেন ইউরোপীয় রাজনীতির প্রধান পুরুষ। তাই এই সময়টা ইতিহাসে 'বিসমার্কের যুগ' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

বীরবল্লাল তৃতীয়

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী]

দক্ষিণ ভারতের দোরসমুদ্র অঞ্চলের হোয়সল বংশীয় রাজা। তৃতীয় বীরবল্লাল ছিলেন হোয়সল বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর রাজত্বকালে মালিক কাফুর দক্ষিণ ভারত অভিযান করলে বীরবল্লালের সাথে মুসলমান সৈন্যবাহিনীর এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বীরবল্লাল পরাজিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হোয়সল রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। বীরবল্লাল ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বুক্কা

[শাসনকাল ১৩৫৩-১৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দ]

চতুর্দশ শতাব্দীতে মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বুক্কা ও তাঁর ভ্রাতা হরিহর (১৩৩৬)। হরিহরের মৃত্যুর পর বুক্কা ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্যের রাজা হন। তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যটিকে সুসংগঠিত করে তোলায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর আমলে বিজয়নগরের সীমানা আরও প্রসারলাভ করে। শাসক হিসাবে বুক্কা মোটামুটি যোগ্যতাসম্পন্নই ছিলেন বলা যায়। তিনি তদানীন্তন চীন সম্রাটের নিকট ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছিলেন এবং প্রতিবেশী মুসলিম বাহমনী রাজ্যের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। নিজে শৈব ধর্মের উপাসক হলেও তিনি ছিলেন একজন পরমতসহিষ্ণু, উদারচেতা শাসক। একবার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে জৈন ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে সেই বিরোধের অবসান ঘটান।

বুক্কা ১৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বুধগুপ্ত

[শাসনকাল ৪৭৭-৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ]

গুপ্তবংশের একজন রাজা। বুধগুপ্ত ৪৭৭ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। উত্তর বঙ্গের দামোদরপুর, সারনাথ, এরাণ প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপি থেকে

বুধগুপ্তের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়। তিনি একজন দৃঢ়চেতা শাসক ছিলেন। স্কন্দগুপ্তের পরবর্তীকালে তাঁর পূর্বসূরীদের আমলে গুপ্তবংশ আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিবাদে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সিংহাসনে আরোহণ করেই বুধগুপ্ত শক্ত হাতে বিরোধী শক্তিগুলোকে দমন করেন এবং সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা চলে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের দূরতম প্রান্তগুলিতে তাঁর নিয়ন্ত্রণ আদৌ দৃঢ় ছিলনা এবং তাঁর সময়ে বহু অঞ্চলের উপর গুপ্ত শাসন নামেমাত্রই প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশ্য এজন্য বুধগুপ্তকে সম্পূর্ণ দায়ী করা চলে না। স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী রাজাদের আমল থেকে গুপ্তবংশের যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তার ফলস্বরূপ বুধগুপ্তকে এক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে রাজা হতে হয়েছিল। সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কিংবা স্কন্দগুপ্তের সামরিক বিক্রম বুধগুপ্তের মধ্যে ছিল না। তাই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনতে তিনি ব্যর্থ হন। বুধগুপ্তের রাজত্বকালের শেষ দিকে বৈদেশিক আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। আঠারো বছর রাজত্ব করার পর বুধগুপ্ত মৃত্যুমুখে পতিত হন।



বেণ্টিঙ্ক

[শাসনকাল ১৮২৮-১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ]

ব্রিটিশ ভারতের একজন গভর্নর জেনারেল ছিলেন। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক মোট সাত বছর ভারতবর্ষ শাসন করেন। তাঁর শাসনকাল ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি একজন উদারহৃদয় ও প্রজাদরদী শাসক ছিলেন এবং ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দিতেন। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বেণ্টিংকের আমল ছিল শান্তিপূর্ণ এবং তিনি অহেতুক হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা রুশ প্রভাবমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে বেণ্টিংক শিখনেতা রঞ্জিৎ সিংহের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। বেণ্টিংকের শাসনকাল নানা

প্রকার প্রজাদরদী শাসন সংস্কারের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। তিনি ব্যয়-সংকোচ ও যুদ্ধবর্জন নীতি অবলম্বন করে কোম্পানীর আর্থিক দুরবস্থা অনেকখানি লাঘব করেন। এছাড়া আফিফেনের উপর শুল্ক ধার্যের মাধ্যমেও তিনি কোম্পানীর কোষাগারে প্রচুর অর্থাগম ঘটান। তিনি প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটান। বিচার বিভাগের সংস্কারও তিনি করেন। বেণ্টিঙ্কের আমলেই আদালতগুলোতে ফার্সীর পরিবর্তে দেশীয় ভাষা ব্যবহারের রীতি প্রথম প্রবর্তিত হয় এবং ভারতীয়গণ বিচার বিভাগের উচ্চপদে আসীন হবার সুযোগ লাভ করে। তিনি সৈন্যবাহিনীর ব্যয় সংকোচ করেন এবং ভারতীয় সিপাহীদের শাস্তিস্বরূপ বেত্রদণ্ডভোগের প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এছাড়া বেণ্টিক কুখ্যাত 'ঠগী' দস্যুদের দমন করেন ও হিন্দুসমাজে যুগযুগ ধরে প্রচলিত অমানুষিক 'সতীদাহ-প্রথা' আইন বলে নিষিদ্ধ করে দেন (১৮২৯)। ইংরাজদের দৃষ্টিতে বেণ্টিঙ্ক একজন দুর্বলচিত্ত শাসক বলে বিবেচিত হলেও তাঁর জনকল্যাণকর কার্যাবলীর জন্য তিনি ভারতবাসীর হৃদয়ে এক চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন। বেণ্টিঙ্ক ছিলেন ইংলণ্ডের উদারপন্থী হুইগ দলের সমর্থক। তিনি শিক্ষা বিভাগেরও সংস্কার করেন। তাঁর সময়ে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত 'চার্টার অ্যাক্ট' পাশ করা হয়। খ্যাতনামা পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ্ মেকলে বেণ্টিঙ্কের আইন পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। মূলত মেকলের প্রচেষ্টায় ভারতে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সরকারী সিদ্ধান্ত তাঁর সময়েই গৃহীত হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্কের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়।

বেলসাজার

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী]

খ্রীঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন বেলসাজার। তিনি ছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী রাজা ন্যাবোনিডাসের পুত্র। ন্যাবোনিডাস রাজকার্য পরিত্যাগ ক'রে তেইমা অঞ্চলে গমন করলে বেলসাজার সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। বেলসাজার ছিলেন অল্পবয়স্ক এবং শাসনকার্য পরিচালনায় অনভিজ্ঞ। তিনি তাঁর সুসজ্জিত প্রাসাদে বিলাসবহুল জীবন যাপনে সময় অতিবাহিত করতেন। ৫৩৮ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পারস্যরাজ সাইরাস ব্যাবিলন আক্রমণ করলে বেলসাজার শত্রুহস্তে নিহত হন।

বেসিল তৃতীয়

[শাসনকাল ১৫০৫-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ]

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাশিয়ার রাজা ছিলেন। তৃতীয় বেসিল ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশিষ্ট সম্রাট আইভানের মৃত্যুর পর মস্কোর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আইভানের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তৃতীয় বেসিল সেই পরিস্থিতির মধ্যে রাজসিংহাসন দখল করেন। কিন্তু তাঁর পূর্বসূরী আইভানের শাসন প্রতিভা, বিচক্ষণতা ও প্রখর ব্যক্তিত্বের কোনোটিরই তিনি অধিকারী ছিলেন না। ফলে তাঁর আমলে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি বিশেষ পরিলক্ষিত হয়না। তিনি আঠাশ বছর রাজত্ব করলেও সামরিক কিংবা শাসনতান্ত্রিক কোনো দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় বেসিল মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ভাস্করবর্মা

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী]

কামরূপের একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ভাস্করবর্মা উত্তর ভারতের রাজা হর্ষবর্ধন ও বঙ্গের শাসক শশাঙ্কের সমসাময়িক। তিনি হর্ষবর্ধনের রাজসভায় দূত প্রেরণ করেন ও তাঁর সাথে এক মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হন। কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কের সাথে ভাস্করবর্মার সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। শশাঙ্কের প্রবল শত্রু হর্ষের সাথে বন্ধুত্ব করায় এই সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। হর্ষ ও ভাস্করবর্মা সম্মিলিতভাবে শশাঙ্কের কর্তৃত্ব খর্ব করার চেষ্টা চালান। ভাস্করবর্মা দীর্ঘকাল শশাঙ্কের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। এই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল কি হয়েছিল সঠিক জানা যায়না। তবে কর্ণসুবর্ণতে প্রাপ্ত ভাস্করবর্মার তাম্রশাসন থেকে কে নো কোনো ঐতিহাসিক এই ধারণা পোষণ করেন যে হয়ত সাময়িকভাবে কর্ণসুবর্ণের উপর ভাস্করবর্মার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভাস্করবর্মার রাজত্বকালে কামরূপ পরিদর্শন করেন। তাঁর বিবরণ থেকে সমসাময়িক কামরূপের অনেক কথাই জানা গেছে। হিউয়েন সাঙ কামরূপরাজের বিদ্যানুরাগ ও বৌদ্ধ শ্রমণদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উল্লেখ করেছেন।



ভিক্টর ইমানুয়েল দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৮৪৯-১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাইডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার রাজা ছিলেন। ইতালীর ঐক্যসাধন সম্পূর্ণ হবার পর তিনি সমগ্র ইতালীর রাজা হন। দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল ছিলেন একজন উদারপন্থী, সংস্কারবাদী শাসক। ইতালীর মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরুষ কাউণ্ট কাভুর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের প্রধানমন্ত্রী হন। ভিক্টর ইমানুয়েলের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে কাভুর অলপকালের মধ্যে পাইড্মণ্ট-সার্ডিনিয়ায় বহু উদারনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন এবং রাজ্যের সর্বত্র গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার ঘটান। ইতালীর ঐক্য আন্দোলনে সমগ্র ইতালীর নেতৃত্ব-দানের জন্য এই সময় পাইড্মণ্ট-সার্ডিনিয়া তার আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি চালায়। ভিক্টর ইমানুয়েল কাভুরের পরামর্শমত দক্ষিণ ইতালী অভিমুখে অভিযান করেন এবং পোপের বাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করে রোম ব্যতীত বাদবাকী পোপের রাজ্য জয় করে নেন। অতঃপর তিনি নেপল্স্-এ গ্যারিবল্ডীর সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হন। গ্যারিবল্ডী পরিস্থিতির চাপে পড়ে এবং কাভুরের কূটনীতির কাছে হার স্বীকার ক'রে তাঁর সৈন্য-বাহিনীসহ ভিক্টর ইমানুয়েলের সাথে যোগ দেন। এরপর ভিক্টর ইমানুয়েল বুর্বো সেনাদলকে পরাজিত ক'রে সিসিলি ও নেপল্স্ জয় করে নেন এবং গণভোটের মাধ্যমে এই দুটি প্রদেশ সার্ডিনিয়ার সাথে যুক্ত হয়। অবশেষে ইতালীর ঐক্যসাধন সম্ভব হয় (১৮৭০) এবং দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলকে ঐক্যবদ্ধ ইতালীর রাজা হিসাবে স্বীকৃতি জানানো হয়। ইতালীর ঐক্য আন্দোলনে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের জন্য দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।



ভিক্টোরিয়া

[শাসনকাল ১৮৩৭-১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ]

মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘটনাবহুল সুদীর্ঘ শাসনকাল ইংলণ্ডের ইতিহাসে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থ উইলিয়াম ছিলেন নিঃসন্তান। তাই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ভিক্টোরিয়া ১৮৩৭ খৃীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ করেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে সিংহাসনে বসায় শাসনকার্যে অনভিজ্ঞা ভিক্টোরিয়া প্রধানতঃ প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ণের পরামর্শমত শাসনকার্য চালাতেন। এছাড়া তাঁর স্বামী প্রিন্স এলবার্টও তাঁকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করতেন। ভিক্টোরিয়া যখন সিংহাসনে বসেন তখন ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ছিল নানা সমস্যার দ্বারা জর্জরিত। তাঁর উপর ১৮৩৮ খৃীষ্টাব্দে শুরু হ'ল চার্টিস্ট আন্দোলন। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রবার্ট পীল দমন-নীতির সাহায্যে এই আন্দোলনের কন্ঠরোধ করলেও (১৮৪২) ছয় বছর পর ফ্রান্সে ১৮৪৮ খৃীষ্টাব্দে বিপ্লব শুরু হ'লে এই আন্দোলন পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে বসার অল্পকালের মধ্যেই কানাডায় বিদ্রোহ দেখা দেয়।

ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে বহু সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করা হয়। এগুলোর মধ্যে ১৮ ৮ খৃীষ্টাব্দের ভারত সুশাসন আইন এবং ১৮৬৭ ও ১৮৮৪ খৃীষ্টাব্দের সংস্কার আইন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিপাহী বিদ্রোহ শান্ত হয়ে যাবার পর ১৮৫৮ খৃীষ্টাব্দের আইন দ্বারা ভারত শাসন ক্ষমতা ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়। এছাড়া শিক্ষা আইন, ব্যালট আইন, বিচারালয় সংক্রান্ত আইন, শ্রমিকদের বাসস্থান আইন, জনস্বাস্থ্য আইন, গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত আইন, খনি ও কারখানা আইন প্রভৃতি পাশ করা হয়েছিল।

বৈদেশিক ক্ষেত্রে ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংলণ্ড নানা জটিল ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেও ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দিক দিয়ে এই সময় ইংরেজ জাতি যথেষ্ট লাভবান হয়েছিল। বাস্তবিকই এই সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। চীনে বাণিজ্য করা নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হ'লে এইসময় ইংরাজ সরকার চীনের সাথে পর পর দুটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে (১৮৪০-৪২ ও ১৮৫৭-৫৮)। এর মধ্যে প্রথম যুদ্ধ আফিং ব্যবসায়কে কেন্দ্র ক'রে শুরু হয়েছিল বলে

তা আফিং এর যুদ্ধ নামে ইতিহাসে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতাকে কেন্দ্র ক'রে পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যা জটিলতর আকার ধারণ করে কারণ রাশিয়া তুরস্ক জয় করলে ইংলণ্ডের অধীনস্থ ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা ছিল। অবশেষে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের চুক্তির মধ্য দিয়ে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটে। পরবর্তীকালে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বার্লিন কংগ্রেসে ইংলণ্ড তুরস্কে এককভাবে রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারনীতি রোধে সফল হয়েছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার মিশরকে তার সংরক্ষিত দেশ বলে ঘোষণা করে এবং লর্ড কিচেনারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী এক অভিযান চালিয়ে সুদান অধিকার করে। এ ছাড়া ট্রান্সভালের স্বর্ণখনির প্রতি ইংরাজ বণিকদের অতিরিক্ত লালসাকে কেন্দ্র ক'রে বুয়র যুদ্ধ শুরু হয় (১৮৯৯)। এই যুদ্ধ তিন বছর ধরে চলে। এই যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়ার জীবনাবসান হয়।

ভেরেলেস্ট

[শাসনকাল ১৭৬৭-১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্বে বাংলায় ইংরাজ কোম্পানীর গভর্ণর হয়েছিলেন। রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইংলণ্ডে ফিরে গেলে ভেরেলেস্ট তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ভেরেলেস্টের স্বল্পস্থায়ী শাসনকালের মধ্যে আফগান শাসক আহম্মদ শাহ আবদালি একাধিকবার শিখদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ভেরেলেস্ট এতে শঙ্কিত হয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে চুনার ও এলাহাবাদে বহু ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইংরাজদের আফগান শক্তির আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়নি। আড়াই বছর শাসনকার্য পরিচালনা করার পর ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভেরেলেস্ট ইংলণ্ডে ফিরে যান।

ভোজ

[শাসনকাল ১০১৮-১০৬০ খ্রীষ্টাব্দ]

রাজা ভোজ ছিলেন মালবের পরমার বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি সুদীর্ঘ ৪২ বছর রাজত্ব করেন। ধারা নামক স্থানে তাঁর রাজধানী ছিল। সাম্রাজ্যজয়ী বীর হিসাবে নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুরাগী এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসাবে তিনি ইতিহাসে স্মরণীয়। রাজা ভোজ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। জ্যোতির্বিদ্যা, স্থাপত্য, কাব্য ইত্যাদি বহু বিষয়ের উপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং এইসব বিষয়ের উপর তিনি চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি ধারাতে একটি সংস্কৃত চর্চার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ভোজ যে সমসাময়িক কালের সবচেয়ে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত রাজা ছিলেন

সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর আর একটি কীর্তি হ'ল বিখ্যাত ভোজপুর জলাশয় নির্মাণ।

কিন্তু রাজা ভোজের পরিণতি ভাল হয়নি। গুজরাট ও চেদি রাজাদের সম্মিলিত আক্রমণের শিকার হয়ে তাঁকে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছিল। ভোজ ছিলেন পরমার বংশের সর্বশেষ বড় শাসক। তাঁর মৃত্যুর পর পরমার শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কোনক্রমে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখে।

ভ্যান্সিটার্ট

[শাসনকাল ১৭৬০-১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৭৬০ সালে রবার্ট ক্লাইভ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করলে ভ্যান্সিটার্ট তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ভ্যান্সিটার্টের সময় বাংলার নবাব ছিলেন মীরকাশিম। মীরকাশিমের সাথে নানা কারণে ইংরেজ কোম্পানীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বিশেষতঃ কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে বিরোধ চরমে ওঠে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পায়। ইংরাজ ব্যবসায়ীরা বিনাশুল্কে অবাধে বাণিজ্য করতে শুরু করে এবং দস্তকের অপব্যবহার করে। তারা দেশীয় ব্যবসায়ীদের ওপর অত্যাচার করে তাদেরকে অত্যন্ত সস্তাদরে জিনিসপত্র বিক্রী করতে বাধ্য করে। মীরকাশিম এই অবস্থার প্রতিবাদ করে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে পত্র লেখেন। ভ্যান্সিটার্ট নবাবের সাথে এক চুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন। তিনি অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের জন্য নবাবী দস্তকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেন। ইংরেজরা বাণিজ্যবাবদ শতকরা ৯% শুল্ক দেবে স্থির হয়। কিন্তু কলকাতা কাউন্সিলের উদ্ধত সদস্যরা এই চুক্তির শর্তাবলীর বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানান। তাঁরা বিনাশুল্কে অবাধ বাণিজ্যের দাবি করেন। মীরকাশিম তখন ক্রুদ্ধ হয়ে দেশীয় ব্যবসায়ীদের উপর থেকেও শুল্ক তুলে নেন। ফলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধতে বেশী দেরী হলনা। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের প্রান্তরে মীরকাশিম, মোগল বাদশাহ শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দোলার মিলিত বাহিনী ইংরাজ সেনাপতি হেক্টর মনরোর হাতে চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করে। অতঃপর মীরকাশিমের পরিবর্তে পুনরায় বৃদ্ধ মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসান হয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ক্লাইভ ইংলণ্ড থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে ভ্যান্সিটার্টের পাঁচ বছর স্থায়ী শাসনপর্বের অবসান ঘটে।

মঙ্গলেশ

[শাসনকাল ৫৯৭-৬১০ খ্রীষ্টাব্দ]

বাতাপীর চালুক্যবংশের একজন রাজা। মঙ্গলেশ কীর্তিবর্মণের মৃত্যুর পর ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে চালুক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কলচুরিদের সাথে এক দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত শত্রুবাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে মহারাষ্ট্রের উত্তর ও মধ্যবর্তী এলাকার উপর চালুক্য কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সফল হন। এছাড়া তিনি আরও কিছু কিছু অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। মঙ্গলেশ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এবং বাদামির বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির তাঁরই সৃষ্টি। রাজত্বকালের শেষ দিকে মঙ্গলেশ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশীর সাথে এক গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে প্রাণ হারান (৬১০)।



মনরো

[শাসনকাল ১৮১৭-১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। জেমস মনরো ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে একচল্লিশ বছর বয়সে ভার্জিনিয়া স্টেটের গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হন। ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসনের আমলে ফ্রান্সের কাছ থেকে লুইসিয়ানা নামক স্থান ক্রয়ের উদ্দেশ্যে তিনি ফ্রান্সে প্রেরিত হন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন এবং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আট বছর ধরে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা করেন। বিখ্যাত 'মনরো নীতি'র স্রষ্টা হিসাবেই তিনি ইতিহাসে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলো স্পেন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে স্পেন 'কনসার্ট অব্ ইউরোপ' বা 'ইউরোপীয় শক্তি সমবায়'-এর শরণাপন্ন হয়। মেটারনিকের নেতৃত্বাধীন ইউরোপীয় কনসার্ট আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলোর বিদ্রোহ দমনে আগ্রহ দেখালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার

আশংকা দেখা দেয়। এইসময় জেমস মনরো মার্কিন কংগ্রেসের এক ভাষণে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ভাষায় এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে 'আমেরিকা হ'ল সম্পূর্ণভাবে আমেরিকাবাসীদের জন্য এবং আমেরিকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরের কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবেনা। যদি কোনো দেশ এই অভিলাষ পোষণ করে তাহলে আমেরিকার শত্রুদেশ বলে বিবেচিত হবে।' ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মনরোর এই ঘোষণার ফলস্বরূপ আমেরিকায় বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা দূর হয়।

জেমস মনরো ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন এবং আরও ছ'বছর বেঁচে থাকার পর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

মরিস

শাসনকাল ৫৮২-৬০২ খ্রীষ্টাব্দ]

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের একজন সম্রাট। তিনি ৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় টিবেরাসের পরবর্তী শাসক হিসাবে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ক্যাপাডোসিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত মরিস ছিলেন একজন সাহসী, উদ্যমশীল এবং শক্তিশালী শাসক। তাঁর সামরিক অভিজ্ঞতাও কম ছিল না। তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যা মাঝে মাঝে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াত। প্রথম দিকে তিনি পারসীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বেশ সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর বেতন কমিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেবার পর থেকেই তাঁর সামরিক শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। এই দিক থেকে তিনি এক মস্ত কূটনৈতিক ভুল করেন। তিনি আফ্রিকার বিভিন্ন স্থান পুনর্গঠন করে প্রত্যেক প্রদেশে একজন সামরিক শাসক নিযুক্ত করেন। বল্কান এলাকায় মরিস ডানিয়ুব অঞ্চল অধিকারের প্রচেষ্টা চালান। দীর্ঘ সংগ্রামের পর তাঁর সৈন্যবাহিনী বিজয়ী হয়। কিন্তু তিনি বেশিদিন ঐ অঞ্চলের উপর স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখতে পারেননি। ফোকাসের নেতৃত্বে ঐ এলাকায় এক সুসংবদ্ধ বিদ্রোহ ঘটে। অতঃপর ফোকাস এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মরিসের রাজধানী অভিমুখে অভিযান করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মরিস এই সংকটময় মুহূর্তে তাঁর শহরে মোতায়েন সামরিক বাহিনীর বিরোধিতার সম্মুখীন হন। উপায়ান্তর না দেখে তিনি প্রাণ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে রাজধানী ছেড়ে পলায়ন করেন। মরিসের সৈন্যবাহিনী ফোকাসের নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়। কিছুদিন পর মরিস পুত্রসহ ধরা পড়েন এবং উভয়কেই হত্যা করা হয় (৬০২)। মরিসের রাজত্ব কুড়ি বছর স্থায়ী হয়েছিল।

মল্লিকার্জুন

[শাসনকাল ১৪৪৬-১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দ]

বিজয়নগর রাজ্যের একজন রাজা। তিনি সঙ্গম বংশীয় ছিলেন। পিতা দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যুর পর ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মল্লিকার্জুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বেশ শক্তিশালী রাজা ছিলেন এবং বাহমনী রাজ্য ও উড়িষ্যার হিন্দু রাজার সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি তাঁর শক্তি ও যোগ্যতার পরিচয় রাখেন। তাঁর কুড়ি বছরের রাজত্বকালে তিনি যেমন একদিকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখেন তেমনি আবার বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে নিজ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে সমর্থ হন। ১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মল্লিকার্জুন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মহম্মদ ষষ্ঠ

[শাসনকাল ১৯১৮-১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ]

অটোমান সাম্রাজ্যের শেষ শাসক। ওসমান এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুলতান বংশ ওসমানলি বংশ নামেও পরিচিত। ষষ্ঠ মহম্মদ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওসমানলি বংশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এক জাতীয় আন্দোলন শুরু হ'লে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হ'ন। তিনি আত্মরক্ষার তাগিদে একটি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজে আশ্রয় নেন এবং মাল্টা নামক স্থানে গমন করেন। ষষ্ঠ মহম্মদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ওসমানলি বংশের শাসনের ওপরও যবনিকা নেমে আসে।

মহম্মদ ঘোরী

[শাসনকাল ১২০৩-১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ]

আফগানিস্থানের 'ঘুর' বা 'ঘোর' নামক অঞ্চলের সুলতান মুইজুদ্দিন মহম্মদ বা মহম্মদ ঘোরী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর গজনী, ঘুর ও দিল্লীর অধীশ্বর হন। পূর্ববর্তী শাসক সুলতান মামুদের ভারত অভিযান সম্ভবতঃ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। গিয়াসউদ্দিনের শাসনকালে ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ভারতবর্ষ অভিযান শুরু হয়। একাধিকবার অভিযান চালিয়ে তিনি একে একে মুলতান, উচ, পেশোয়ার প্রভৃতি জয় করেন। চৌহান বংশীয় তৃতীয় পৃথিবরাজ তখন দিল্লী ও আজমীরের শাসক ছিলেন। সিন্ধু ও পঞ্জাব জয়ের পর মহম্মদ ঘোরী দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন এবং ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথিবরাজের নিকট পরাজিত হয়ে ঘোরে

প্রত্যাবর্তন করেন। পরের বছর নবোদ্যমে পূর্বাপেক্ষা আরও বেশী প্রস্তুতি নিয়ে তিনি পৃথিবরাজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধে পৃথিবরাজ পরাজিত ও নিহত হন। ইতিহাসে এই যুদ্ধ তরাইনের যুদ্ধ (১১৯২) হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। দিল্লী ও আজমীর ঘোরীর অধিকারে আসে। তিনি দিল্লীর কর্তৃত্ব তাঁর বিশ্বস্ত ও প্রিয় অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবকের উপর ন্যস্ত করে স্বদেশে ফিরে যান। কুতুবউদ্দিন আইবক ভারতে মুসলমান (সুলতানী) শাসনের সূচনা করেন। মামুদ ও মহম্মদ উভয়েই ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু উভয়ের অভিযানের প্রকৃতির মধ্যে মূলগত পার্থক্য ছিল। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের পত্তনকারী হিসাবে মহম্মদ ঘোরীর ভূমিকা মামুদ অপেক্ষা ইতিহাসে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

মহম্মদ ঘোরী বেশিদিন রাজকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পাননি। সিংহাসনে আরোহণের তিন বছরের মধ্যেই আততায়ী হস্তে তাঁর জীবনের অন্তিম পরিণতি ঘটে (১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ)।



মহম্মদ বিন তুঘলক

[শাসনকাল ১৩২৫-১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দ]

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জুনা খাঁ ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ তুঘলক নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল পঁচিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে মহম্মদ 'পাগলা রাজা' নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ তাঁকে মধ্যযুগের সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন বলে অভিহিত করেছেন। বাস্তবিকই মহম্মদ তুঘলক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বহুশাস্ত্রবেত্তা একজন সুপণ্ডিত। তাঁর হস্তাক্ষর খুবই সুন্দর ছিল, এবং তাঁর স্মরণশক্তিও ছিল বিস্ময়কর। ন্যায়শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, জ্যোতিষ, গণিত, দর্শন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। ফার্সী

কাব্য-সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। এছাড়া তিনি ছিলেন উদার প্রকৃতির মানুষ এবং মুক্ত হস্তে দান করতেন। কিন্তু এতসব গুণ সত্ত্বেও খামখেয়ালী ও হঠকারী স্বভাবের জন্য মহম্মদ শাসক হিসাবে ব্যর্থ হন। তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁকে পরস্পরবিরোধী দোষগুণের অদ্ভুত সমন্বয় বলে অভিহিত করেছেন। সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই মহম্মদের মস্তিষ্কে নিত্যনতুন শাসন সংস্কারের পরিকল্পনা উদিত হতে থাকে। তিনি দোয়াব অঞ্চলের উর্বরতা লক্ষ্য করে ঐ অঞ্চলের উপর কর বৃদ্ধি করেন। কিন্তু এই সময় ঐ এলাকায় এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় প্রজাসাধারণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। মহম্মদ পরে অবস্থার গুরুত্ব বুঝে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সরকারী ঋণদানের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এই করবৃদ্ধির দরুণ তিনি ঐ অঞ্চলের মানুষের বিরাগভাজন হলেন। এরপর ১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মহম্মদ ব্যয় সংকোচের উদ্দেশ্যে সোনা-রুপার পরিবর্তে তাম্র মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এই মুদ্রা জাল হবার বিরুদ্ধে তিনি কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় শীঘ্রই এত জাল মুদ্রায় দিল্লী শহর ছেয়ে যায় যে বাধ্য হয়ে তাঁকে এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়। মহম্মদ দেবগিরির ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁর রাজধানী দিল্লী থেকে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত করার কথা ভাবেন। পরিকল্পনাটির মধ্যে দূরদর্শিতা ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু মহম্মদ চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন যখন তিনি সমগ্র দিল্লীবাসীকে রাষ্ট্রীয় দপ্তরগুলোর সাথে দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করার কথা ভাবলেন। সুদীর্ঘ ৭০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে কিছু মানুষ দেবগিরিতে পৌঁছলেও বহু মানুষ পথের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অনেকে মৃত্যুবরণও করে। দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার কিছুদিন পর মহম্মদের হঠাৎ দিল্লী প্রত্যাবর্তনের কথা মনে হল। ফলে তিনি পুনরায় রাষ্ট্রীয় দপ্তর এবং লোকজনদের দিল্লীতে ফিরিয়ে আনলেন। স্ট্যানলে লেন-পুল যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে দৌলতাবাদে রাজধানী পরিবর্তন ছিল অর্থ ও শক্তির অপচয়ের এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। মহম্মদ দিগ্বিজয়ের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্নও দেখতেন। তিনি খোরাসান ও কারাজল অভিমুখে অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু সফল হতে পারেননি। মহম্মদের এই সমস্ত খেয়ালী কার্যকলাপে দেশের প্রজাসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁর দুর্বলতার সুযোগে পঞ্জাব, বাংলাদেশ, অযোধ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকেরা তাঁর কর্তৃত্ব উপেক্ষা করে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই সমস্ত বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে সুলতান দিশাহারা বোধ করেন। মহম্মদের রাজত্বকালে উত্তর ভারতের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর নামে স্বাধীন এক হিন্দু রাজবংশের এবং বাহমনী নামে একটি মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে। গুজরাটের

বিদ্রোহ দমন করার পর মহম্মদ সিন্ধুপ্রদেশে বিদ্রোহ দমনে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে থাট্টা নামক স্থানে তাঁর জীবনাবসান হয়। মহম্মদ তুঘলকের অধিকাংশ পরিকল্পনার পশ্চাতে শুভ উদ্দেশ্য ও কল্পনাশক্তির ছাপ থাকা সত্ত্বেও বাস্তববোধের অভাবে তিনি শাসক হিসাবে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন। বহুগুণ সমন্বিত অসাধারণ প্রতিভাবান এই মানুষটি যে ভারত ইতিহাসের এক হতভাগ্য নায়ক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মহাপদ্মনন্দ

[শাসনকাল ৩৪৫-৩১৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ]

আনুমানিক ৩৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্মনন্দ শিশুনাগ বংশের শেষ রাজাকে হত্যা করে মগধের সিংহাসন দখল করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে নন্দবংশের রাজত্বকাল একাধিক কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। নন্দদের সময় থেকে মগধের সাম্রাজ্য প্রাদেশিকতার গণ্ডী মুক্ত হয়ে আরও বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং মৌর্যযুগে চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে এক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করে। নন্দ রাজতন্ত্রের শক্তির প্রধান উৎস ছিল এর বিশাল সৈন্যবাহিনী। মহাপদ্মনন্দের নামানুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশকে নন্দবংশ বলা হয়। মহাপদ্মনন্দের বংশপরিচয় সঠিকভাবে জানা না গেলেও তিনি নিম্নবংশোদ্ভূত ছিলেন বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন। মহাপদ্মনন্দ যে একজন রীতিমত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অজাতশত্রুর মৃত্যুর পর মগধের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ঝিমিয়ে পড়েছিল। মহাপদ্মনন্দের আমলে মগধ তার পূর্বগৌরবের দিনগুলো ফিরে পায়। কোন কোন ঐতিহাসিক নন্দদের ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অভিহিত করে থাকেন। মহাপদ্মনন্দের সাম্রাজ্য উত্তর দিকে পঞ্জাবের নিকটবর্তী কুরুদেশ থেকে দক্ষিণে গোদাবরী উপত্যকা আর পূর্বে মগধ থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমে নর্মদার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাপদ্মনন্দ কত বছর রাজত্ব করেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। বায়ু পুরাণের মতে তিনি ২৮ বছর রাজত্ব করেন।

মহীপাল দ্বিতীয়

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী]

বাংলার পালবংশের একজন রাজা। দ্বিতীয় মহীপাল পিতা তৃতীয় বিগ্রহ পালের মৃত্যুর পর ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় পালবংশ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অভাব ও বৈদেশিক আক্রমণে অত্যন্ত দুর্বল

হয়ে পড়েছিল। এই আভ্যন্তরীণ ভাঙ্গন রোধ করার শক্তি দুর্বল শাসক দ্বিতীয় মহীপালের ছিলনা। সিংহাসনে বসার পর থেকেই তাঁকে নানা ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে কৈবর্তজাতির নেতা দিব্যর নেতৃত্বে বাংলার উত্তরাংশে এক ব্যাপক গণ বিদ্রোহ দেখা দেয়। দ্বিতীয় মহীপাল এই বিদ্রোহ দমনে বার হলে বিদ্রোহীদের হাতে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

মামুদ

[শাসনকাল ৯৯৭-১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ]

সুলতান মামুদ ছিলেন গজনীর শাসক। তিনি ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পিতা সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন একজন মস্তবড় যোদ্ধা ও সাম্রাজ্যবিজেতা। তাঁর ক্ষমতার মোহ ও ধনসম্পদের লালসা ছিল অত্যন্ত বেশী। ভারতবর্ষের বিপুল ঐশ্বর্য তাঁকে প্রলুব্ধ করে এবং গজনীতে নিজের শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে তিনি ভারতবর্ষ অভিমুখে অভিযান শুরু করেন এবং ১০০০ থেকে ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সতেরো বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন বলে জানা যায়। সুলতান মামুদ ভারতবর্ষের বহু রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন, বহু দেবালয়, ঘরবাড়ি ধ্বংস করেন এবং বিপুল ধনসম্পদ স্বীয় হস্তগত করেন। ভারতবর্ষ থেকে অর্জিত ধনরত্নে তিনি গজনী শহরকে বিশ্বের অন্যতম সুন্দর শহরে পরিণত করেন। তাঁর ভারতবর্ষ আক্রমণের সময় তিনি গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন। হাজার হাজার রাজপুত এই মন্দির রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে নিহত হয়। সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করতে এসেছিলেন, এদেশে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করার কোনো পরিকল্পনা তাঁর ছিলনা। বিখ্যাত কবি ফিরদৌসী তাঁর রাজপ্রাসাদ অলঙ্কৃত করতেন। 'শাহনামা' কাব্য রচনা করে তিনি মামুদকে অমর করে রেখে গেছেন। মোট চৌত্রিশ বছর রাজত্ব করার পর ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে ষাট বছর বয়সে মামুদ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মহেন্দ্রবর্মন

[শাসনকাল ৬০০-৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ]

একজন উল্লেখযোগ্য পল্লব শাসক। মহেন্দ্রবর্মন ৬০০-৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন। তাঁর আমলে পল্লবদের সামরিক শক্তি যথেষ্ট বিকাশ লাভ করে। মহেন্দ্রবর্মন ছিলেন থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক এবং একজন নাট্যকার ও কবি। তিনি 'মত্তবিলাস প্রহসন' নামে একটি নাটকের রচয়িতা। তাঁর রাজত্বকালে

অনেক চমৎকার শিল্পসুষমামণ্ডিত মন্দির নির্মিত হয়েছিল যেগুলোর মধ্যে মহাবলীপুরম শ্রেষ্ঠ। মহেন্দ্রবর্মন প্রথম জীবনে জৈন হলেও পরবর্তীকালে শৈবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

মাইকেল রোমানভ

[শাসনকাল ১৬১৩-১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ]

রাশিয়ার বিখ্যাত রোমানভ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোর সিংহাসনে আরোহণ করেন। চতুর্থ আইভানের মৃত্যুর পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে রাশিয়ায় এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা পরবর্তী কয়েক দশক ধরে চলে। রাশিয়ার এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পোল্যাণ্ড রাশিয়া আক্রমণ করে এবং রুশ রাজধানী মস্কো পোলদের অধীনে আসে। কিন্তু পোলদের আধিপত্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি কারণ মাইকেলের নেতৃত্বে রাশিয়ায় এক ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান ঘটলে পোলরা মস্কো পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বিপুল জনসমর্থন পেয়ে মাইকেল মস্কোর সিংহাসনে আরোহণ করলে রাশিয়ার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মাইকেল অল্পকালের মধ্যেই শাসক হিসাবে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় রাখেন। তিনি কঠোর হস্তে উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী সামন্তপ্রভুদের দমন করেন এবং অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। তিনি এক দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসনের প্রবর্তন করেন এবং সামরিক শক্তির প্রকাশ দেখিয়ে সুয়েড ও পোল অধিকৃত রুশ এলাকাগুলো পুনর্দখল করেন। তিরিশ বছরের অধিককাল সাফল্যের সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করার পর মাইকেল রোমানভ ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।



মাউন্টব্যাটেন

[শাসনকাল ১৯৪৭-১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ]

বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ নৌসেনাপতি ও ভারতের প্রাক্তন ভাইসরয় ছিলেন। অ্যাডমিরাল লর্ড লুইস মাউণ্টব্যাটেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে পনেরই আগস্ট অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পূর্বে পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় হিসাবে কার্য করেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে তিনি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর-জেনারেলের পদে আসীন থাকেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মাউণ্টব্যাটেন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্রিটিশ নৌবহরের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ্ পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ভারতবর্ষ ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলো পরিদর্শনে আসেন। তিনি ইউ কে'র 'চীফ্ অব্ ডিফেন্স স্টাফ্'-এর পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। আয়ারল্যাণ্ডে থাকাকালীন নৌকা ক'রে ভ্রমণে বার হ'লে নৌকার অভ্যন্তরে গোপনে নিহিত টাইমবোমা বিস্ফারিত হয়ে মাউণ্টব্যাটেন মৃত্যুমুখে পতিত হন (২৭শে আগস্ট, ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দ)।



মার্কাস অরেলিয়াস

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী]

প্রসিদ্ধ রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস ১২১ খ্রীষ্টাব্দে রোমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান্ রাজা ছিলেন। তাঁর জ্ঞানান্বেষণ ও সত্যানুসন্ধিৎসার প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু রাজকার্য পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁকে সমগ্র জীবন ধরে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। মার্কাস অরেলিয়াস তাঁর অসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অদম্য মনোবলের দ্বারা সকল প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে ইতিহাসে একজন সন্ত রাজার সম্মান লাভ করেছেন। ১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এক ভয়ঙ্কর বার্বেরিয় আক্রমণে তিনি রোম নগরী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। জার্মান ও সারমাশিয়ানদের সাথে তাঁকে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল। মার্কাসের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল। চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে নিজের দৈনন্দিন রাজকার্য পরিচালনা করতেন। সাম্রাজ্যের

আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রজাসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি আমৃত্যু নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। মার্কাস অরেলিয়াস ছিলেন অহংকারশূন্য, বিনয়ী, সহিষ্ণু ও হৃদয়বান শাসক। তাঁর দিনলিপি (যা 'মেডিটেশন' নামে পরবর্তীকালে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে) নিঃসন্দেহে অসাধারণ রচনা এবং আজও বহু মানুষের অনুপ্রেরণাস্বরূপ। জীবনের নানা সমস্যার সমাধান ও একটি শান্ত-সুন্দর, সমাহিত জীবনযাপনের পথ তিনি এই পুস্তকে নির্দেশ করে গিয়েছেন। এই পুস্তকখানি পড়লে মানুষ হিসাবে মার্কাস অরেলিয়াসকে সুস্পষ্টভাবে চেনা যায়। তিনি ছিলেন যথার্থই একজন আত্মানুসন্ধানী দার্শনিক রাজা। মার্কাস অরেলিয়াস ১৮০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মিনান্দার

[শাসনকাল ১৫৫-১৩০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

যবন (বক্তিয়ান গ্রীক) রাজাদের মধ্যে মিনান্দার ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। পৌরাণিক লেখকদের মতে মিনান্দার ভারতে আলেকজাণ্ডারের চেয়েও বেশী রাজ্য জয় করেন। কথাটি যে সম্পূর্ণ অসত্য তা জোর দিয়ে বলা যায় না, কারণ কাবুল থেকে মথুরা এমনকি বুন্দেলখণ্ড পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। শকল বা আধুনিক শিয়ালকোট ছিল মিনান্দারের রাজধানী। মিলিন্দোপন্হো নামক গ্রন্থ থেকে এর সৌন্দর্যের কথা জানা যায়। বড় বড় অট্টালিকা, সুন্দর রাস্তাঘাট, জলাশয়, উদ্যান, দোকানপাট প্রভৃতি দ্বারা শহরটি পূর্ণ ছিল। অধিকন্তু, শহরটি ছিল রীতিমত সুরক্ষিত। মিনান্দারের সুশাসনে প্রজারা সুখে শান্তিতে বসবাস করত। মিনান্দার সম্ভবতঃ একমাত্র ইন্দো-গ্রীক রাজা ভারতীয় সাহিত্যে যাঁর সম্বন্ধে প্রশস্তি করা হয়েছে। বৌদ্ধ লেখকরা তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। বৌদ্ধ দার্শনিক নাগসেনের সাথে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করার পর তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। ১৫৫ থেকে ১৩০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে মিনান্দার রাজত্ব করেছিলেন।

মিনামতো ইয়ারিতোমো

[শাসনকাল ১১৯২-১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জাপানের শোগান বা রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। মিনামতো ইয়ারিতোমো ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী সমরনায়ক। 'শোগান' শব্দটি বলতে জাপানের প্রধান সামরিক নেতাকে বুঝাত।

মিনামতো ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সামরিক ক্ষমতা দখল করেন এবং কয়েক বছর পর ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'শোগান' হিসাবে জাপানের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি হন। ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মিন্টো

[শাসনকাল ১৮০৭-১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লর্ড মিন্টো ভারতে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ইংরাজ কোম্পানীর গভর্ণর-জেনারেল মনোনীত হন। স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী মিন্টো গভর্ণর-জেনারেলের পদলাভ করার পূর্বে বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সভাপতি ছিলেন এবং কোম্পানীর শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। মিন্টো যখন কোম্পানীর শাসনভার গ্রহণ করেন তখন ইউরোপে নেপোলিয়নের যুগ চলছে। নেপোলিয়ন পারস্যের শাহকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করলে লর্ড মিন্টো স্যার ম্যালকমের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল পারস্যে প্রেরণ করেন। তিনি আফগানিস্থানের শাসক শাহ সুজার নিকট দূত প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ থেকে সৈন্য পাঠিয়ে রডরিগস, মরিসাস প্রভৃতি দ্বীপ ও বাটাভিয়া অধিকার করে ভারত মহাসাগরীয় এলাকা থেকে ফরাসী প্রভাবের অবসান ঘটান। এছাড়া লর্ড মিন্টো ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে শিখনেতা রঞ্জিৎ সিংহের সাথে অমৃতসরের সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে ইঙ্গ-শিখ বিরোধের অবসান ঘটান এবং কিছু কিছু স্থান জয় করে ভারতে কোম্পানী, শাসনকে বিস্তৃত করেন। তাঁর আমলে ত্রিবাঙ্কুর ও মাদ্রাজে বিদ্রোহ ঘটলে তিনি সেগুলো দমন করেন। মিন্টোর আমলে বিখ্যাত 'চার্টার আইন' (১৮১৩) প্রণীত হয়। মোট ছয় বছর শাসনকার্য পরিচালনা করার পর ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিন্টো স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

মিলটিয়াডিস

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী]

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে থেসের একজন 'টাইর‍্যান্ট' বা স্বৈরাচারী শাসক এবং এথেন্সের নেতা ছিলেন। মিলটিয়াডিস ছিলেন বীর যোদ্ধা। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। অধিকন্তু তিনি ছিলেন একজন যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক। পারসীকদের বিরুদ্ধে ম্যারাথনের যুদ্ধে গৌরবময় বিজয় মিলটিয়াডিসকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। ৪৯০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের এই যুদ্ধে শক্তিশালী দরায়ুসের বাহিনীকে পরাজিত করে তিনি সমগ্র গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। অবশ্য মিলটিয়াডিসের পরবর্তী জীবন বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ছিলনা। তিনি ব্যক্তিগত বাসনা

চরিতার্থ করার জন্য প্যারোস দ্বীপ আক্রমণ করে ব্যর্থ হন। এই অভিযানে ব্যর্থতার জন্য মিলটিয়াডিসকে বিপুল পরিমাণ অর্থ জরিমানা করা হয়। তিনি জরিমানার সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করতে অসমর্থ হন। প্যারোসের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি আহত হয়েছিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন (সম্ভবতঃ ৪৮৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)।

মিলটিয়াডিসের শেষ জীবন বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও গ্রীক স্বাধীনতা রক্ষার্থে তাঁর মহৎ সংগ্রাম ও স্বার্থত্যাগের জন্য গ্রীসের ইতিহাসে তিনি এক স্থায়ী আসন লাভের অধিকারী।

মিহিরকুল

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী]

তোড়মানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মিহিরকুল হুনদের রাজা হন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী শাসক ছিলেন। তাঁর অত্যাচারের কাহিনী প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে মগধের অধিপতি নৃসিংহ গুপ্ত ভারতীয় অন্যান্য রাজাদের সহায়তায় তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত এই যুদ্ধে মিহিরকুল পরাজিত হলে ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। মালবের অধিপতি প্রবল পরাক্রান্ত যশোধর্মদেব হুণ শক্তির ধ্বংসসাধনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই হুন নেতা মিহিরকুলকে সম্মুখ যুদ্ধে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করে এদেশে হুন শাসনের মূলে চরম আঘাত হানেন। অতঃপর এই নৃসিংহ বা নরসিংহগুপ্ত অন্যান্য রাজাদের সহায়তায় পুনরায় হুনদের উপর আক্রমণ চালান। মিহিরকুল এরপর কাশ্মীর দেশে গমন করেন ও সেখানকার রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হয়ে বসেন। কলহন লিখিত রাজতরঙ্গিনী ও হিউয়েন সাঙের বিবরণী থেকে মিহিরকুল সম্পর্কে নানা তথ্য জানা গেছে। মিহিরকুল শ্রীনগরে নিজের নামানুসারে মিহিরেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা করেন এবং মিহিরপুর নামক এক শহর স্থাপন করেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় মিহিরকুল বৌদ্ধ স্তূপ ও সঙ্ঘারাম ধ্বংস করেছিলেন। আনুমানিক ৫৪৫-৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময় মিহিরকুলের মৃত্যু হয়েছিল।



মীরকাশিম

[শাসনকাল ১৭৬০-১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ]

কলকাতার ইংরাজ কুঠির গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের সাথে এক গোপন চুক্তির মাধ্যমে মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরকাশিম বাংলার মসনদ লাভ করেন (১৭৬০)। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নতুন নবাব বর্ধমান মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী কোম্পানীকে সমর্পণ করেন। এছাড়া তিনি কয়েক লক্ষ টাকা ও নানা মূল্যবান সামগ্রী কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপহার-উপঢৌকন বাবদ প্রদান করেন। ইংরজেরা মীরজাফরের মতই মীরকাশিমকে তাদের হাতের পুতুলে পরিণত করতে চেয়েছিল। কিন্তু মীরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা, ইংরেজদের উদ্ধত আচরণ ক্রমশঃ তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি ইংরেজদের ছত্রছায়া থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করলেন এবং কয়েকজন ফরাসী সামরিক বিশেষজ্ঞের সহায়তায় তাঁর সেনাবাহিনীকে ইউরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত করে তুলতে লাগলেন। ইংরাজ কোম্পানী মীরকাশিমের ক্রিয়াকলাপ যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখছিল। ফলে বিবাদ বাধতে দেরী হল না। ইংরেজ কোম্পানী মোগল সমাটের কাছ থেকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার সুযোগে পেয়েছিল। কিন্তু ক্রমশঃ কোম্পানীর সব কর্মচারী বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসায় শুরু করলে একদিকে যেমন নবাবের রাজস্বের প্রচুর ক্ষতি হয় তেমনি অপরদিকে দেশীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো কণ্টকর হয়ে ওঠে। মীরকাশিম এই অবস্থার প্রতিবাদ করলে কোম্পানী তাতে কর্ণপাত করে নি। অগত্যা মীরকাশিম দেশীয় বণিকদের প্রদেয় শুল্ক রহিত করে দেন। ইংরাজরা এতে নবাবের উপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অবস্থা শীঘ্রই চরমে উঠল যখন পাটনায় ইংরাজ কুঠির প্রধান এলিস বলপূর্বক পাটনা শহর দখল করার চেষ্টা করেন। মীরকাশিম এলিসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়াতে দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মীরকাশিম কাটোয়া, সুতি, গিরিয়া, উদয়নালা প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি ছোটখাট

সংঘর্ষে ইংরাজ বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে অযোধ্যায় গিয়ে উপস্থিত হন। তারপর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা ও মোগলবাদশাহ শাহ আলমের (যিনি সেই সময় এলাহাবাদে ছিলেন) সাথে সম্মিলিতভাবে বক্সারের প্রান্তরে ইংরাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য অবতীর্ণ হন। বক্সারের এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে (২৩শে অক্টোবর, ১৭৬৪) মীরকাশিম ও তাঁর মিত্রবাহিনী ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ স্যার হেক্টর মনরোর কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করলে মীরকাশিমের স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালের অবসান ঘনিয়ে আসে। এরপরও দীর্ঘকাল মীরকাশিম জীবিত ছিলেন এবং ১৭৭৭ খৃীষ্টাব্দে নিঃসঙ্গ, পলাতক অবস্থায় দিল্লীর নিকটে তাঁর জীবনের অন্তিম পরিণতি ঘটে।

মীরজাফর

[শাসনকাল ১৭৫৭-৬০, ১৭৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ]



অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার নবাব ছিলেন। মীরজাফর বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। পলাশীর ঐতিহাসিক যুদ্ধে (২৩শে জুন, ১৭৫৭ খৃীষ্টাব্দ) সিরাজের পরাজয় ঘটলে ইংরাজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার সর্বময় প্রভু হয়ে বসে। পলাশীর যুদ্ধের সাতদিন পর মীরজাফর কোম্পানীর সাথে পূর্বেকার গোপন চুক্তি অনুযায়ী বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে মীরজাফর রবার্ট ক্লাইভ, কোম্পানীর অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং কোম্পানীকে প্রচুর অর্থ ও ধনসম্পদ উপহার দেন। মীরজাফর নবাব সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে গিরিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আলীবর্দী খান তাঁর ভূমিকা পালনে খুশি হয়ে বাংলার সিংহাসন লাভ করে তাঁকে বক্সীপদে মনোনীত করেছিলেন। এছাড়া আলবর্দী নিজের বৈমাত্রেয় ভগিনী শাহ খানুমের সঙ্গে মীরজাফরের বিবাহ দান করে তাঁর মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করেন। আলীবর্দীর আমলে মীরজাফর মারাঠা বর্গীদের বিরুদ্ধে সেনাধ্যক্ষ হিসাবে নিজের যোগ্যতার পরিচয় রাখেন এবং আলীবর্দীর বিশেষ আনুকূল্য লাভ করে উড়িষ্যার নায়েব ও হিজলীর ফৌজদার হন।

মীরজাফর আলীবর্দী খানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। আলীবর্দী এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাঁকে যথোচিত তিরস্কার ও অপমান করে রাজদরবার থেকে বহিস্কৃত করেন। পরে অবশ্য তিনি মীরজাফরকে পূর্ব পদে স্থাপন করেন। মারাঠীদের সাথে আলিবর্দীর সন্ধি মীরজাফরের মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হয়েছিল। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে বসলে মীরজাফর প্রধান সেনাপতি পদেই বহাল থাকেন। অল্পকালের মধ্যেই দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ ইংরাজদের সাথে সিরাজ বিরোধী এক গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হন। মীরজাফর বাংলার সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর সেনাপতি লর্ড ক্লাইভের সাথে এক গোপন চুক্তি করেন। চুক্তি অনুযায়ী পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফরের বিশ্বাঘাতকতায় সিরাজের পরাজয় হয় এবং মীরজাফর বাংলার সিংহাসন লাভ করেন (১৮৫৭)। কিন্তু নবাব হয়েও মীরজাফর বেশিদিন রাজসুখ ভোগ করতে পারেননি। ইংরেজরা তাঁকে হাতের পুতুলে পরিণত করে ক্রমাগত তাঁর কাছ থেকে অর্থ দাবি করতে থাকে। এদিকে প্রিয় পুত্র মীরনের আকস্মিক মৃত্যুতে মীরজাফর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। কোম্পানীর কর্মচারীদের আচরণে অতিষ্ট হয়ে শেষে তিনি ইংরেজদের হাত থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজতে থাকেন। তিনি চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিকদের সাথে মিলিত হয়ে ইংরেজ শক্তিকে এদেশ থেকে বিতাড়নের পরিকল্পনা করেন। ক্লাইভের কানে এই খবর পেঁছিতে বেশি দেরি হলনা। ফলস্বরূপ বিদেরার যুদ্ধে ক্লাইভের হাতে ওলন্দাজেরা চরম পরাজয় বরণ করল এবং মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হলেন। বাংলার পরবর্তী নবাব হলেন মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম (১৭৬০)। চার বছর পর বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম ইংরেজদের কাছে পরাজিত হলে ইংরেজরা পুনর্বার বৃদ্ধ অসুস্থ মীরজাফরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণ করার অল্পকালের মধ্যেই মীরজাফর মৃত্যুমুখে পতিত হন। মীরজাফর ছিলেন স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক ও ঘোর সুবিধাবাদী। স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো ধরনের হীন কাজ করতে তিনি কুন্ঠিতবোধ করতেন না। দুর্নীতিপরায়ণ দুশ্চরিত্র মীরজাফর এক কলঙ্কময় পুরুষ হিসাবে বাংলার ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেছেন।

মুৎসুহিতো

[শাসনকাল ১৮৬৭-১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ]



জাপানের একজন প্রসিদ্ধ সম্রাট ছিলেন। মুৎসুহিতো ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র পনের বছর বয়সে সম্রাটপদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ব্যাপী রাজত্বকাল জাপানের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় অধ্যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে জাপানে যে আধুনিকীকরণের সূত্রপাত হয় সম্রাট মুৎসুহিতো ছিলেন তার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। সম্রাট পদ লাভ করে তিনি পুরাতন শোগুনেট সরকারের বিলোপ সাধন করেন এবং সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করেন। ইতিহাসে এই ঘটনা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের 'রেস্টোরেশন' নামে পরিচিত। 'রেস্টোরেশনে'র পর এরপর থেকে তিনি বহু জনকল্যাণমূলক শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি অপরাধীর নির্মম শাস্তিদান প্রথা রহিত করেন, একটি বিধিবন্ধ আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রচলন করেন, রেলপথ নির্মাণ, পশ্চিমী ক্যালেন্ডারের প্রচলন এবং বিদ্যালয়সমূহে ইংরাজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। মুৎসুহিতো ১৮৯৪-৯৫ সালে চীন এবং ১৯০৪-৫ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে জয়লাভ করেন। বিশেষতঃ রাশিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে টোকিও শহরে মুৎসুহিতোর জীবনাবসান হয়।

মুক্তপীর ললিতাদিত্য

[শাসনকাল ৭২৪-৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ]

মুক্তপীর ললিতাদিত্য কাশ্মীরের কারকোট বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। ৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন মস্তবড় সাম্রাজ্য-জয়ী পুরুষ এবং বিখ্যাত রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থের লেখক কলহনের লেখা পড়ে মনে হয়

গুপ্তদের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে এতবড় সাম্রাজ্যজয়ী ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। কলহনের লেখা যে রীতিমত আতিশয্য দোষে দুষ্ট তা সহজেই অনুমেয়। তবুও তিনি যে একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুক্তপীরের রাজত্বকালের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল কনৌজের শক্তিশালী রাজা যশোবর্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়লাভ। অতঃপর তিনি একে একে মগধ, গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করেন। তিনি দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত অভিমুখেও তাঁর বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি তাঁর রাজধানীকে বড় বড় অট্টালিকা, মন্দির, জলাশয় প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত করেন। বিখ্যাত মার্তণ্ড মন্দিরের তিনিই নির্মাতা। কলহন এই রাজার এক মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন। মুক্তপীর ললিতাদিত্য ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক-গমন করেন।

মুবারক শাহ

[শাসনকাল ১৪২১-১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দ]

ভারতে সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খিজির খানের পুত্র। মৃত্যুর আগে খিজির খান তাঁর পুত্র মুবারক শাহকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। পিতার মৃত্যুর দিনেই দিল্লীর অভিজাতগণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে মুবারক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই সময়ে ইয়াহিয়া বিন আমেদ সরহিন্দ বিখ্যাত 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' গ্রন্থরচনা করেন যা থেকে সমসাময়িক যুগের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। পিতার মত মুবারক শাহের রাজত্বকালও ছিল বৈচিত্র্যহীন। কয়েকটি বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমনের উদ্দেশ্যে সৈন্যদলের ব্যবহার ছাড়া তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর রাজত্বকালে ঘটেনি। তিনি ভাতিন্দার বিদ্রোহ দমনে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ধর্ষ খোকারগণ ক্রমশঃ বেশিরকম শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তাঁকে একাধিকবার পর্যুদস্ত করে। হিন্দু অভিজাতরাও দিল্লীর দরবারে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল। তিনি যমুনার তীরে 'মুবারকবাদ' নামে এক নতুন শহর প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কিছু লোকের গোপন ষড়যন্ত্রের তিনি শিকার হন এবং নতুন শহর পরিদর্শন কালে তাঁকে হত্যা করা হয় (১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দ)। এইভাবে মুবারক শাহের ১৩ বছর স্থায়ী অনুজ্জ্বল রাজত্বের অবসান ঘনিয়ে আসে।

মুবারক শাহ

[শাসনকাল ১৩১৬-১৩২০ খ্রীষ্টাব্দ]

খলজী বংশের শেষ সুলতান কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজত্বকালের প্রথম দুই এক বছর তিনি বেশ ভালভাবেই রাজকার্য পরিচালনা করেছিলেন। মুবারক শাহ ছিলেন আলাউদ্দিন খলজীর পুত্র। সিংহাসনে বসেই তিনি পিতার আমলের কঠোর আইন-কানুনগুলোকে শিথিল করেন। তিনি বহু রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেন এবং আলাউদ্দিন কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা অনেক জমি পূর্ববর্তী মালিকদের প্রত্যর্পণ করেন। এছাড়া তিনি বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় বেশ কিছু শুল্ক রদ করেন। এইসব কারণে মুবারক কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করলেও ঐতিহাসিক বারণী যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর লোকের মন থেকে রাজক্ষমতা সম্পর্কে সকল প্রকার ভয়-সম্ভ্রম দূর হয়ে গিয়েছিল। সুলতান ক্রমশঃ বিলাস-ব্যসন ও লঘু আমোদ-প্রমোদে বেশিরকম লিপ্ত হবার ফলে শাসনকার্য পরিচালনায় শিথিলতা দেখা দেয় ও কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। জিয়াউদ্দিন বারণীর লেখা থেকে জানা যায় সুলতান রাজকার্য কিছুই দেখাশোনা করতেন না। তিনি মদ্যপান ও নৃত্যগীতাদি উপভোগ করে সময় কাটাতেন। তিনি গুজরাটের এক নিম্নবংশোদ্ভূত মুসলমান খসরু খানের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। সুলতানের অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে খসরু খান সিংহাসন দখলের পরিকল্পনা করতে থাকেন। মুবারক শাহকে এ বিষয়ে অবগত করানো গেলেও তিনি সতর্ক হননি। ফলে খসরু খানের চক্রান্তে তাঁকে এপ্রিল মাসের এক রাত্রে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিতে হয় (১৩২০)। এইভাবে মুবারক শাহের স্বল্পস্থায়ী শাসনের অবসান ঘটে এবং তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিরিশ বছরের খলজী শাসনের অবসান ঘনিয়ে আসে।

মুর্শিদকুলি জাফর খান

শাসনকাল ১৭১৭- ৭২৭ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় স্বাধীন নবাবীর প্রতিষ্ঠাতা। মুহম্মদ হাদি বা মুর্শিদ কুলি জাফর খান মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের একজন প্রিয় কর্মচারী ছিলেন। ঔরঙ্গজেব ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলিকে বঙ্গের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন এবং সেখানে দু'বছর (১৭০৮-১৭০৯) অতিবাহিত করেন। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় বাংলার দেওয়ান পদে

অধিষ্ঠিত হন। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত হন এবং দিল্লীর মোগল বাদশাহের দুর্বলতার সুযোগে একরকম স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। মুর্শিদকুলির শাসনকাল নানা কারণে অষ্টাদশ শতকের বাংলার ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তাঁর আমলে দেশের কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল এবং রাজস্বও অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলায় জগৎশেঠ ব্যাঙ্কিং হাউসের প্রতিষ্ঠালাভের ক্ষেত্রে মুর্শিদকুলির রাজত্বকালের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। মুর্শিদকুলি সুবাদার ও দেওয়ানের পদকে যুক্ত করে নানা আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করেন। মুর্শিদকুলির রাজত্বকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কার্য হ'ল তাঁর ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, যা বাংলার ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করে। তাঁর এই নতুন ব্যবস্থার ফলে দেশে এক নতুন জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। মুর্শিদকুলি রাজস্ব সংগ্রহে খুবই কঠোরতা দেখান এবং তাঁর আমলে এত পর্যাপ্ত পরিমাণ রাজস্ব সংগৃহীত হ'ত যে দিল্লীর মোগল বাদশাহ মুর্শিদকুলি প্রেরিত রাজস্বের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল থাকতেন।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করা হয়েছিল। রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মুর্শিদকুলি মূলতঃ দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন— ক) তিনি জায়গীরদারদের সকল জমিকে 'খালসা'য় (সরকারের খাসভূমি) পরিণত ক'রে সরাসরি নবাবের সংগ্রাহকদের অধীনে আনয়ন করেন এবং জমিচ্যুত জমিদারদের উড়িষ্যার অনাবাদী ভূমি ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করেন ; (খ) ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের জন্য তিনি ইজারা প্রথা চালু করেন। রাজস্ব সংগ্রহের ভার আমিনদের উপর ন্যস্ত করা হয়। নতুন ব্যবস্থায় বহু হিন্দু জমি লাভ করেন, কারণ হিন্দুদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত অর্থ আদায় সহজসাধ্য ছিল। মুর্শিদকুলি বাংলার প্রতিটি গ্রাম পরিমাপ ক'রে ভূমির উর্বরতা অনুযায়ী সেগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। বহু অনাবাদী জমিও পুনরুদ্ধার ক'রে তিনি চাষযোগ্য করে তোলেন। ভূমিহারা জমিদারদের তিনি ক্ষতিপূরণ হিসাবে 'নানকর', 'বনকর', 'জলকর' প্রভৃতি জমি প্রদান করেন। দেওয়ান রঘুনন্দন নামক একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ রাজস্ব বিভাগের প্রধান পদে নিযুক্ত হন।

মুর্শিদকুলির পূর্বে রাজস্ব, সৈন্য প্রভৃতি সকল বিভাগের উচ্চ পদগুলো উত্তর ভারতের মানুষজন দিয়েই পূর্ণ করা হ'ত। মুর্শিদকুলির আমলে ফার্সী জানা দক্ষ ও সুশিক্ষিত হিন্দুরা উচ্চ সরকারী পদ লাভ করেন। আচার্য যদুনাথ সরকার মুর্শিদকুলিকে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের জন্য প্রশংসা করেছেন : ক) তিনি বাংলায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন যা সমসাময়িককালে ভারতের অন্যত্র পরিলক্ষিত

হয়না ; (খ) তিনি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান এবং এমন এক রূপদান করেন যা দীর্ঘস্থায়ী হয় ; (গ) তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-সম্পদ প্রভৃতি যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন এবং তাঁর আমলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। সরকারী ব্যয়-সংকোচের দিকে তাঁর ছিল সদাসতর্ক দৃষ্টি। কৃপণ-স্বভাব মুর্শিদকুলি নিজেও অনাড়ম্বরভাবে জীবনযাপন করতেন।

কিন্তু মুর্শিদকুলির শাসনব্যবস্থায় কতকগুলো ত্রুটি দেখা যায়। তিনি ভবিষ্যতের কথা ভাবেননি এবং তাঁর ব্যবস্থাসমূহকে (ভূমিরাজস্ব ছাড়া) স্থায়ী করার কোনো আগ্রহ দেখাননি। দেশের ব্যয়সংকোচের দিকে অতিরিক্ত নজর দিতে গিয়ে তিনি দেশের সামরিক বিভাগকে অত্যন্ত দুর্বল করে ফেলেন যার কুফল আলিবর্দির রাজত্বকালে বর্গী আক্রমণের সময় পরিলক্ষিত হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন। মুর্শিদকুলি বাংলার নিয়মিত সৈন্যসংখ্যা রীতিমত হ্রাস করেন। মাত্র চার হাজার পদাতিক ও দু'হাজার অশ্বারোহী সৈন্য বাংলার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। মুর্শিদকুলির সৌভাগ্য যে তাঁর শাসনকালে কোনো বৈদেশিক আক্রমণ বাংলার আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেনি। অধিকন্তু, তাঁর শাসনতান্ত্রিক নীতিসমূহের মধ্যে অনেক সময়েই ধর্মীয় গোঁড়ামি ও হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ প্রকাশ পেত। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর মোগল বাদশাহ ফারুখশিয়র কর্তৃক ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাণিজ্যিক ফর্মান প্রদান তাঁর আমলের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি পরলোকগমন করেন।



মুসোলিনি

[শাসনকাল ১৯২২-১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফ্যাসিস্ট ইতালীর নেতা ছিলেন। বেনিটো মুসোলিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর মিলান শহরে ফ্যাসিস্ট দল গঠন করেন। এই দল ছিল সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের ঘোর বিরোধী। অল্পকালের মধ্যে ফ্যাসিস্ট দল ইতালীর সবচেয়ে শক্তিশালী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রতিষ্ঠালাভের তিন বছরের মধ্যেই

এর সদস্য সংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষে পরিণত হয়। বহু শিল্পপতি এবং সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও এই দলের সমর্থক হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন ইতালীর শাসক তৃতীয় ভিক্তর ইমানুয়েলের দুর্বলতা বুঝে ফ্যাসিস্ট দল রোম অভিমুখে অভিযান করে। রাজা ইমানুয়েল বাধ্য হয়ে মুসোলিনিকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান। শীঘ্রই মুসোলিনী ইতালীর ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই যুদ্ধনীতি ও সাম্রাজ্যবিস্তারের পক্ষে জোর প্রচার চালান। হিটলারের মত মুসোলিনিরও বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ছিল যুদ্ধজয় ও সাম্রাজ্যবিস্তারের মাধ্যমে ইতালিকে ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বের এক অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ইতালীর প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল তার প্রতিকার করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ইতালীর সামরিক শক্তিবৃদ্ধির দিকে মন দেন এবং লীগ অব্ নেশনস্‌কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) জয় করে নেন ১৯৩৬)। ইতালীর আগ্রাসী নীতিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স শঙ্কিত হয় এবং মুসোলিনির সাথে উভয় রাষ্ট্রের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। এরপর মুসোলিনি জার্মানীর নাৎসীবাহিনীর নেতা হিটলার ও জাপান সরকারের সাথে এক মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হন যা ইতিহাসে 'রোম-বার্লিন-টোকিও মৈত্রী' নামে পরিচিত। মুসোলিনি হিটলারের সাথে যুগ্মভাবে স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পক্ষ সমর্থন করেন এবং সেখানে ফ্যাসিস্ট সরকার গঠনে বিশেষ ভূমিকা নেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এমনকি এশিয়ার জাপানেও ফ্যাসিস্টদের প্রভাব ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং ফ্যাসিস্টদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রগুলোর জঙ্গী মনোভাব অনেকাংশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পথ প্রস্তুত করে। মুসোলিনীর নেতৃত্বাধীন ইতালী ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হ'লে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট ইতালী নাৎসী জার্মানীর সাথে যোগ দেয় এবং প্রথমদিকে রীতিমত সাফল্যলাভ করে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল মিত্রশক্তির অনুকূলে যায়। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে মিলানের ক্ষিপ্ত জনতার হস্তে মুসোলিনিকে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয় (১৯৪৫)।

মুহম্মদ শাহ

[শাসনকাল ১৭১৯-১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ]

জাহানশাহের পুত্র রোশন আখতার ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ করে মোগল মসনদে অধিষ্ঠান করেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের (যারা সম্রাট সৃষ্টিকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল) সমর্থনপুষ্ট হয়ে তিনি সিংহাসনে বসেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়

মুহম্মদ শাহের রাজত্বের শুরু থেকে শাসনব্যবস্থার যাবতীয় বিষয় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। কিন্তু মুহম্মদ শাহ দীর্ঘদিন এই অবস্থা চলতে দিতে রাজী ছিলেন না। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাদের উদ্ধত, সুবিধাবাদী ও স্বৈরাচারী মনোভাবের দ্বারা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বহু শত্রুর সৃষ্টি করে। মুহম্মদ শাহ সুযোগ বুঝে তাদের সাথে হাত মিলান। দাক্ষিণাত্যের নিজাম-উল-মুলক ছিলেন এই বিরোধী গোষ্ঠীর প্রধান। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় হুসেন আলী ও আবদুল্লা উভয়কেই হত্যা করা হয়। নিজাম-উল-মুলক সাময়িকভাবে উজীর নিযুক্ত হন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর সাথে সাথে মোগল রাজদরবারে তাদের একটানা সাত বছরের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠাপর্বের উপর যবনিকা পড়ে। কিন্তু মুহম্মদ শাহ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাবমুক্ত হলেও দেশের পরিস্থিতির কোনো উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি ছিলেন একজন দুর্বল, অযোগ্য ও অদূরদর্শী শাসক। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের মতে তিনি ছিলেন বয়সে তরুণ, সুদর্শন এবং সর্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদে উৎসাহী। তিনি ভোগবিলাসে মত্ত থেকে নিজেকে এবং সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে ফেলেন। যদিও ভাগ্যক্রমে তিনি সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করার সুযোগ পান, তবুও তাঁর অপদার্থতার ফলে সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হয়। সত্যি বলতে মুহম্মদ শাহের আমলে দেশে শাসন বলতে কিছু আর অবশিষ্ট ছিলনা এবং একের পর এক প্রদেশ মোগল শাসন থেকে স্বাধীন হয়ে যায়। এর পর পারস্যরাজ নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে আসে আর মোগল সাম্রাজ্যের সীমা অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মুহম্মদ শাহ ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।

মুহম্মদ শাহ

[শাসনকাল ১৪৩৪-১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দ]

ভারতে সৈয়দ বংশের শাসক ছিলেন। মুবারক শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীর প্রভাবশালী আমীরগোষ্ঠী খিজির খানের দৌহিত্র এবং মৃত সুলতানের উত্তরাধিকারী মুহম্মদ শাহকে দিল্লীর সিংহাসনে বসান। মুহম্মদ শাহ ছিলেন একজন দুর্বল শাসক। প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে পড়ে তিনি দিশাহারা বোধ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি শাসক হিসাবে নিজের অযোগ্যতা প্রমাণ করেন। সৈয়দ বংশের অবস্থা উত্তরোত্তর অবনতির দিকে যাত্রা করে। এই পরিস্থিতির মধ্যে সম্ভবতঃ ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু তারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়।

মেটারনিক

[**শাসনকাল** ১৮০৯-১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। প্রিন্স ক্লেমেন্স ফন মেটারনিক ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ্ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিশারদ্। তিনি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের পতনের পর থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপীয় রাজনীতির মুখ্য চরিত্র ছিলেন এবং ইউরোপীয় রাজনীতিকে প্রধানতঃ তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। এইজন্য এই সময়টা (১৮১৫-১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) ইতিহাসে 'মেটারনিকের যুগ' বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র মেটারনিক শিক্ষাজীবন শেষ ক'রে অস্ট্রিয়া সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদলাভ করেন এবং সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। নেপোলিয়নের পতনের মূল কৃতিত্বের দাবিদার বলে তিনি নিজেকে প্রচার করতেন। অত্যন্ত বিচক্ষণ, দাম্ভিক, আত্মবিশ্বাসী, বাক্‌নিপুণ এবং প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষটি মন্তব্য করেন যে পৃথিবীতে তিনি হয় তাঁর সঠিক সময়ের অনেক পূর্বে নয়ত অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছেন। কূটনীতির যাদুকর, ঘোর রক্ষণশীল এই মানুষটি সকলরকম প্রগতিশীল ভাবধারার তীব্র বিরোধী ছিলেন। নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ভিয়েনা সম্মেলনে তিনিই মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং ইউরোপের পুনর্গঠনের খসড়া রচনা ক'রে সর্বত্র বিপ্লব-পূর্ববর্তী রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও সামন্তপ্রথাকে ফিরিয়ে আনেন। তাঁর নীতিকে ঐতিহাসিকেরা 'মেটারনিক সিস্টেম' বলে অভিহিত করে থাকেন। মেটারনিক যে কোনো ধরনের পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন কারণ তিনি জানতেন পরিবর্তন রক্ষণশীলতার প্রধান শত্রু। ইউরোপের যে কোনো স্থানে গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও জাতীয়তাবাদের প্রসার রোধ করতে তিনি সদাসতর্ক থাকতেন। তিনি ইউরোপীয় রাজাদের গতানুগতিকভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতে নির্দেশ দেন এবং সর্বপ্রকার বৈপ্লবিক ভাবধারা ও কাজকর্ম বন্ধ করতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হন। মেটারনিক বিশেষ ক'রে অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর উপর নানাপ্রকার কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। কিন্তু মেটারনিক তাঁর এই একপেশে নীতি শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে ব্যর্থ হন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত অস্ট্রিয়ায় দ্রুত বিস্তার-লাভ করলে মেটারনিক ইংলণ্ডে পলায়ন করতে বাধ্য হন। মেটারনিকের অস্ট্রিয়া ত্যাগের সাথে সাথে তাঁর নীতির পরাজয় ঘটে এবং সেইসঙ্গে 'মেটারনিকের যুগ'-এরও অবসান হয়।

মেনেলাস

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী]

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাচীন গ্রীসের অন্তর্গত স্পার্টার রাজা ছিলেন। বিখ্যাত 'ট্রোজান যুদ্ধ' হল তাঁর রাজত্বকালের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হোমার রচিত অমর মহাকাব্য 'ইলিয়াড' এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল। ট্রয় নগরের রাজকুমার প্যারিস মেনেলাসের পরমাসুন্দরী রাণী হেলেনকে অপহরণ করে স্বদেশে নিয়ে এলে গ্রীক রাষ্ট্রগুলো সম্মিলিতভাবে ট্রয় নগর আক্রমণ করে। দশ বছর যুদ্ধ চলবার পর অবশেষে গ্রীক বাহিনী ট্রয় ধ্বংস করতে সমর্থ হয়। বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক থুকিডিডস গ্রীক সৈন্যদল কর্তৃক ট্রয় নগর অবরোধের বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রীকরা ট্রয় নগরের উপর লুঠপাট চালায় এবং স্থানটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত ক'রে সেখান থেকে প্রস্থান করে। মেনেলাস হেলেনকে উদ্ধার করে স্বদেশে ফিরে আসেন এবং অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করেন। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের মাধ্যমে রাজা মেনেলাস এক বিশিষ্ট স্থান লাভের অধিকারী।

মেনেস

[শাসনকাল ৩১০০ মতান্তরে ৩৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন মিশরের একজন বিশিষ্ট ফারাও বা সম্রাট ছিলেন। মেনেস ছিলেন একজন পরাক্রমশালী ফারাও। তিনি তাঁর সামরিক বলের সাহায্যে প্রায় সমগ্র মিশরকে নিজ শাসনাধীনে আনয়ন করেন। যতদূর জানা গেছে মেনেস হলেন মিশরের প্রথম ফারাও। তাঁর আমলের বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলো থেকে সমসাময়িক কালে মিশরীয় সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। ফারাও মেনেস ছিলেন সকল ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্যশাসন, অর্থনীতি, আইন-প্রণয়ন, বিচার এমনকি ধর্মীয় বিষয়গুলোও তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হ'ত। বিপুল সম্পত্তির অধিকারী মেনেস তাঁর রাজপ্রাসাদে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন এবং প্রজাসাধারণ তাঁকে দেবতার মত সমীহ করে চলত। মেনেস সঠিক কোন্ সময়ে রাজত্ব করেছিলেন জানা যায়নি। চার হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দের প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কোনো সময় তিনি রাজত্ব করতেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাঁকে মেম্ফিসের প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করেছেন। কারো মতে তাঁর শাসন ৬২ বছর স্থায়ী হয়েছিল।



মেয়ো

[শাসনকাল ১৮৬৯-১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ]

স্যার জন লরেন্সের পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন। লর্ড মেয়োর কার্যকাল ১৮৬৯ থেকে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। তিনি জাতিতে আইরিশ ছিলেন। মেয়ো ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নয়নে বিশেষ যত্নবান হন। তিনি নানা প্রকার অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। বিশেষতঃ রাজস্ব বিভাগের উপর তিনি খুবই গুরুত্ব দেন। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রসারেও আগ্রহী ছিলেন। আদমসুমারী বা লোকগণনার প্রচলন তাঁর সময় থেকেই হয়েছিল। তিনি ভারতবর্ষে কার্যভার গ্রহণের বছরই (১৮৬৯) বিখ্যাত 'সুয়েজ খাল' খনন করা হলে ভারত থেকে ইংলণ্ডে যাতায়াত পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজসাধ্য হয়। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে মেয়ো তাঁর পূর্ববর্তী শাসক লরেন্সের নিরপেক্ষতা নীতিই বজায় রেখে চলার চেষ্টা করেন। তবে আফগানিস্থান যাতে রুশীয়দের প্রভাবাধীন না হয়ে পড়ে সেদিকে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখেন এবং শের আলীর সাথে সৎসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন। আন্দামান পরিদর্শনকালে এক ওহহাবী বন্দীর হাতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেয়োর আকস্মিক জীবনাবসান ঘটে।

মেরি

[শাসনকাল ১৫৫৩-১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দ]

ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের মৃত্যু হলে জনসাধারণের সমর্থনে অষ্টম হেনরীর কন্যা মেরি ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেন। মেরি নিজে ক্যাথলিক ছিলেন এবং তিনি ক্যাথলিক ধর্মের নেতা স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপকে বিবাহের আগ্রহ দেখান। মেরি ইংলণ্ডে পোপের প্রাধান্য পুনরায় স্থাপন করতে চান। তিনি নিজ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পার্লামেণ্টকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান এবং পুরোনো সদস্যদের অধিকাংশকেই পদচ্যুত করেন। নব নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমর্থন তিনি লাভ করেন এবং দ্বিতীয় ফিলিপকে বিবাহ করেন।

অতঃপর তিনি দেশ থেকে ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের আমলে প্রবর্তিত প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম পরিবর্তনের চেষ্টা চালান। মেরি পার্লামেণ্টের সাহায্যে এক আইন পাস করে অষ্টম হেনরীর সঙ্গে ক্যাথারিণের বিবাহ-বিচ্ছেদ অবৈধ বলে ঘোষণা করেন এবং সিংহাসনের উপর নিজ কর্তৃত্ব আইনত স্বীকৃত করেন। এডোয়ার্ডের আমলের প্রার্থনা পুস্তক বাতিল করা হয় এবং মেরি স্বেচ্ছায় পোপের আধিপত্য স্বীকার করে নেন। কারণ তিনি চাইতেন ইংলিশ চার্চের উপর পোপের প্রভাব পুনরায় বিস্তৃত হোক। মেরি 'অ্যাক্ট অব্ হেরেসি' পুনঃ প্রবর্তন করে কয়েকশো নেতৃস্থানীয় প্রোটেস্টাণ্টকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করেন। তাঁর এই নিষ্ঠুর কাজের জন্য জনগণ তাঁকে 'ব্লাডি মেরি' বা 'রক্তলোভী মেরি' বলে অভিহিত করে। এইভাবে ইংলণ্ডে জোর করে ক্যাথলিক ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর মেরি ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

মেরিয়া থেরেসা

[শাসনকাল ১৭৪০-১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অস্ট্রিয়ার রাণী ছিলেন। মেরিয়া থেরেসা পিতা ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে বসেন এবং দীর্ঘ ৪০ বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন। তিনি তিরিশ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন এবং ঐ একই বছর ইউরোপীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিকও সিংহাসনে আরোহণ করেন। ষষ্ঠ চার্লসের পুত্রসন্তান না থাকায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি কন্যা মেরিয়া থেরেসাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করে গেলে তাঁর সিংহাসনে আরোহণকে কেন্দ্র করে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ বাধে এবং অস্ট্রিয়ার একটি সমৃদ্ধশালী প্রদেশ সাইলেশিয়া ফ্রেডারিক দখল করে বসেন। কূটনৈতিক বিপ্লব ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হল মেরিয়া থেরেসার রাজত্বকালের অপর দুই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মেরিয়া থেরেসা দৃঢ়চেতা রমণী ছিলেন এবং চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও বশ্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি যে সময় অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে বসেন সেই সময় ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল ও ঝঞ্ঝাপূর্ণ। বিশেষ করে একজন রমণীর সিংহাসনে আরোহণকে কেন্দ্র করে ইউরোপের বহু রাষ্ট্রই অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে তাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করেছিল। সেই অবস্থায় মেরিয়া থেরেসা যে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়ে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর রাজকার্য চালিয়ে যান তা বাস্তবিকই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। মেরিয়া থেরেসা ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মেহমেৎ আলি

[শাসনকাল ১৮৩১-১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মিশরের শাসক ছিলেন। তিনি ১৮৩১ থেকে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মেহমেৎ আলি একজন শক্তিশালী ও দক্ষ শাসক ছিলেন। সেই সময় মিশর তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীন ছিল এবং মেহমেৎ আলি তুরস্কের সুলতানের প্রতিনিধি হিসাবে মিশরের 'পাশা' বা শাসন-কর্তা নিযুক্ত হন। মেহমেৎ আলি জাতিতে ছিলেন আলবেনিয়ান। তিনি একজন ক্ষুদ্র তামাক ব্যবসায়ী হিসাবে জীবন শুরু করেন। নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের পর তিনি দ্রুত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন এবং একসময় মিশরের নেতা হয়ে বসেন। তিনি 'খেদিভ' উপাধি গ্রহণ করলে তুরস্কের সুলতান তা অনুমোদন করেন। মেহমেৎ আলি মিশরের সৈন্যবাহিনীকে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করে তোলেন। তিনি ইংরেজদের বিতাড়িত করেন এবং মামেলুক ও ওহহাবিদের দমন করেন। এছাড়া তিনি সুদান ও আরব জয় করে নেন। শোনা যায় মেহমেৎ আলি লেখাপড়া মোটেই শেখেননি; কিন্তু বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তিনি ছিলেন। তিনি যে শুধুমাত্র সামরিক বিভাগের উন্নতি ঘটান তাই নয়, মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা, আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা··· তাঁর আমলে সবকিছুরই এক অভাবনীয় অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং তাঁর মতন ক্ষমতাশালী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক যে দুর্বল তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনতা বেশিদিন স্বীকার করে চলবেন না তা সহজেই অনুমেয়। তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীনস্থ গ্রীকগণ স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করলে মেহমেৎ আলি সেই সুযোগে সিরিয়া আক্রমণ করে বসেন। ফলে তুরস্কের সাথে মিশরের যুদ্ধ বেধে যায়। মেহমেৎ আলির পুত্র ইব্রাহিম তুরস্ক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অনেকখানি প্রবেশ করেন এবং রাজধানী শহর কনস্টাণ্টিনোপলের পতনের সম্ভাবনা পর্যন্ত দেখা দেয়। তুরস্কের সুলতান বেগতিক দেখে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর কাছে সাহায্যের আবেদন জানালে শেষ পর্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর চাপে পড়ে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সুলতান মেহমেৎ আলিকে সিরিয়া অর্পণ করতে বাধ্য হন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সাথে মেহমেৎ আলির দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হয়। ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ সহায়তা পেয়ে মেহমেৎ সহজেই তুর্কীবাহিনীকে পরাজিত করেন। শেষ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে এক সম্মেলন আহবান করা হয়। তুরস্কের সুলতান মেহমেৎ আলির স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। তুরস্কের সুলতান মেহমেৎ-এর পুত্র ইব্রাহিম কর্তৃক অধিকৃত স্থানগুলো (সিরিয়া, ক্রীট, আরাবিয়া প্রভৃতি) পুনরায়

ফিরে পান। মূলতঃ ইংলণ্ডের প্রচেষ্টায় তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় থাকে। লণ্ডন সম্মেলনের কিছুদিন পরই মিশরে স্বাধীন রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মেহমেৎ আলি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

ম্যাক্সিমিলিয়ান প্রথম

[শাসনকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ]

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে হ্যাপসবার্গ বংশীয় প্রথম ম্যাক্সিমিলিয়ান জার্মানীর শাসক হন। তাঁর রাজত্বকালে জার্মান সাম্রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের এক মহৎ প্রয়াস চালানো হয়। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্মস নামক স্থানে যে ডায়েট আহবান করা হয় সেখানে এবং আরও বেশ কয়েকটি ডায়েটে সংস্কার সাধনের উপযোগী নানা প্রস্তাব গৃহীত হয়। জার্মান রাজ্যগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ ও সংঘর্ষের পরিবর্তে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হয়। নানা প্রকার শাসন সংস্কারের দ্বারা আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বাড়ে। কিন্তু সম্রাটের পদাধিকারকে আরও দৃঢ় করা কিংবা অসংখ্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে একই নীতির ছত্রছায়ায় এনে সুসংবন্ধ এক জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমিলিয়ান ব্যর্থ হন। তিনি ছিলেন অনেকাংশে ভাববিলাসী এবং তাঁর বাস্তব বুদ্ধির অভাব ছিল। তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারেননি। ম্যাক্সিমিলিয়ান তুর্কীদের বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপকে ঐক্যবন্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় জার্মানদেরও তিনি এব্যাপারে উজ্জীবিত করে তুলতে পারেননি। তবে তিনি একাধিক রাষ্ট্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা বিশেষ লাভবান হন এবং ইউরোপে হ্যাপসবার্গ বংশ রীতিমত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী

[শাসনকাল ১৬৫-১৯৫ খ্রীষ্টাব্দ]

সাতবাহন বংশের শেষ বড় রাজা হলেন যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী। সম্ভবতঃ ১৬৫ থেকে ১৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি রাজত্ব করেন। তাঁর আমলের শিলালেখ ও মুদ্রাগুলো থেকে জানা যায় যে তিনি শকদের হাত থেকে পূর্বপুরুষদের আমলে হৃত রাজ্যগুলোর উন্ধার সাধনে অনেকখানি সমর্থ হয়েছিলেন। সুতরাং যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী যে একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন তা অনস্বীকার্য। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে তাঁর সাম্রাজ্য বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে আরব সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পার্জি-টারের মতে, যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর নির্দেশে পুরাণগুলোকে পুনরায় সংকলিত করা হয়েছিল। বিখ্যাত সন্ন্যাসী নাগার্জুনের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। যজ্ঞশ্রীর আমল ছিল সাতবাহন রাজত্বের শেষ দীপশিখা। তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাতবাহন বংশের ইতিহাসে অন্ধকার যুগের সূচনা হয়।

যদুসেন

[শাসনকাল ১৪১৮-১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দ]

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যদুসেন ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে বসার আগে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং তাঁর নতুন নাম হয় জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সেলিমের মতে যদুসেন পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকার এটা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে রাজা গণেশের শান্তিপূর্ণভাবে মৃত্যু হয়েছিল। জালালউদ্দিন সম্ভবতঃ দু'বার ধর্মান্তরিত হন। প্রথমবার মুসলমান হবার পর পিতা গণেশ তাঁকে প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে আবার হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু সেই সময় রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে তাঁর স্থান হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি পুনর্বার ইসলামধর্ম গ্রহণ করে সিংহাসনে বসেন এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা এই আচরণের তীব্র সমালোচনা করলে তিনি ক্ষোভে, দুঃখে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। যদুসেন-জালালউদ্দিনও পিতার মত শক্তিশালী শাসক ছিলেন। বাংলার এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে তাঁর রাজধানী পরিবর্তন করেন। পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের উন্নতিকল্পে তিনি বহু দীঘি, ইমারৎ মসজিদ, সরাইখানা, রাস্তাঘাট, প্রভৃতি তৈয়ারী করেন। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের লেখা থেকে জানা যায় যদুসেন ও তাঁর পত্নীকে পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত 'একলাখী' সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করা হয়। একলাখীর স্থাপত্যশিল্প প্রাচীন বাংলার এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তের বছর রাজত্ব করার পর ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে যদুসেন-জালালউদ্দিনের মৃত্যু হয়।

যযাতি কেশরী

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী]

প্রাচীন ভারতে কোশল রাজবংশের একজন খ্যাতনামা নৃপতি ছিলেন যযাতি কেশরী। তিনি দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি কিংবা কিছুটা পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ কোশল রাজ্যের রাজা হন। তিনি কেশরী বংশোদ্ভূত ছিলেন। যযাতি কেশরীর সিংহাসন লাভের পূর্বেই উড়িষ্যায় কেশরী বংশের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যযাতি কেশরী উত্তরাধিকার সূত্রে উড়িষ্যার অধিপতি হন। যযাতি কেশরীর রাজত্বকাল ছিল কেশরী বংশের শ্রেষ্ঠ সময় এবং তাঁকে এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে নিঃসন্দেহে আখ্যায়িত করা চলে। ধর্মপ্রাণ রাজা যযাতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের একান্ত অনুরাগী ছিলেন এবং ভুবনেশ্বর ও তার আশেপাশে বহু শিব মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি বহুসহস্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে

কলিঙ্গদেশে আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁদের যথোচিত মর্যাদাদান করেন। মূলত তাঁর প্রচেষ্টায় শৈবধর্ম কলিঙ্গদেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করে। ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দিরের নির্মাণকার্য তিনিই শুরু করেন।

যশোধর্মদেব

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী]

মহারাজ যশোধর্মদেব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পর্বে মালবের রাজা হন। তিনি ছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী শাসক। তিনি দিগ্বিজয়ে বার হয়ে অতি অল্পকালের মধ্যে ভারতবর্ষের বহুস্থান জয় করতে সমর্থ হন। তবে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হল দুর্ধর্ষ হূণজাতিকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা। তিনি শকজাতীয় হূণদের উচিত শিক্ষা দিয়ে 'শকারি' উপাধি ধারণ করেন। কুখ্যাত ও চতুর্দিকে ত্রাস সৃষ্টিকারী হূণনেতা মিহিরকুলকে তিনি স্বীয় চরণযুগল বন্দনা করতে বাধ্য করেছিলেন বলে জানা যায়। যশোধর্মদেব একটি অব্দের প্রচলন করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে এবং ঐ অব্দ 'বিক্রম সম্বৎ' নামে পরিচিত। তবে এবিষয়ে নিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। যশোধর্মদেব শৈবধর্মের অনুরাগী হলেও সর্বপ্রকার অনুদারতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর তিনি বিরোধী ছিলেন। তাঁর আমলে তাঁর রাজধানী শহর উজ্জয়িনী ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহরে পরিণত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যশোধর্মদেবের পরবর্তী বংশধরদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না।

যশোবর্মণ

[শাসনকাল ৭২৫-৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ]

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজের ইতিহাস অস্পষ্ট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। যশোবর্মণ ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে এই অন্ধকার যুগের সাময়িক অবসান ঘটে। তাঁর নেতৃত্বে কনৌজ আবার পাদপ্রদীপের আলোয় আসে। যশোবর্মণের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানার প্রধান সূত্র হল বাকপতি রচিত গ্রন্থ "গৌড়বাহো"। যশোবর্মণ কোন্ বংশে জাত হয়েছিলেন এবং কিভাবে কনৌজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। বাকপতির কাব্য থেকে যশোবর্মণের সামরিক কৃতিত্বের কথা জানা যায়। তিনি মগধ, বঙ্গ ও দাক্ষিণের কিছু কিছু এলাকা জয় করেন এবং তারপর পশ্চিমঘাট হয়ে উত্তর দিকে অভিযান চালিয়ে রাজপুতানার বেশকিছু স্থান জয় করে নেন।

বাকপতির কাব্যিক বর্ণনায় যে অতিরঞ্জনের ছাপ রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তা সত্ত্বেও যশোবর্মণের সামরিক প্রতিভাকে উপেক্ষা করা যায় না। এই সময় উত্তর-ভারত আরব ও তিব্বতীদের আক্রমণের শিকার হয়। যশোবর্মণ কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের সঙ্গে যুগ্মভাবে অভিযান চালিয়ে ভারতবর্ষকে বিদেশী শক্তির কবল থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হন। ৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনের রাজসভায় একজন দূতও প্রেরণ করেন। যশোবর্মণের সাথে কাশ্মীররাজের মৈত্রী বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। উভয়ের মধ্যে এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয় এবং যশোবর্মণ পরাজিত হন। ইতিহাসের অঙ্গনে যশোবর্মণের আবির্ভাব ছিল আকস্মিক, ধূমকেতুর মত। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর সাম্রাজ্য অবলুপ্ত হয়। যশোবর্মণ জ্ঞানী গুণীর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সংস্কৃত সাহিত্যের একজন দিকপাল কবি ভবভূতি তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। আনুমানিক ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ যশোবর্মণ পরলোকগমন করেন।

যোসেফ দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৭৮০-১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগ ছিল ইউরোপের ইতিহাসে 'জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রের যুগ'। দ্বিতীয় যোসেফ নিঃসন্দেহে স্বৈরাচারী শাসকদের অন্যতম প্রধান ছিলেন। তিনি মোট দশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে বহু জনকল্যাণমূলক শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয়। দর্শন-শাস্ত্রের অনুরাগী ছাত্র দ্বিতীয় যোসেফ নানাবিধ শাসন সংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ উন্নতি ঘটানোর জন্য ঐকান্তিক প্রয়াস চালান। তিনি বলেন দর্শনশাস্ত্রের উপরই তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের আইন-প্রণয়ণের ভার অর্পণ করেছেন।

শাসনকার্যের সুবিধার্থে যোসেফ সমগ্র অস্ট্রিয়াকে মোট তেরটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রতিটির জন্য একজন সামরিক শাসক নিযুক্ত করেন। তিনি বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন এবং ছয়টি আপীল আদালত গঠন করেন। তিনি মৃত্যুদণ্ড ও শারীরিক নিগ্রহের মাধ্যমে শাস্তিদান প্রথা রহিত করেন। তিনি নতুন কর ব্যবস্থার প্রচলন করেন এবং দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে নানাবিধ ব্যবস্থা নেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অস্ট্রিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। যোসেফ ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিদাসদের মুক্তিদান ক'রে তাদের স্বাধীনভাবে বাঁচার সুযোগ করে দেন। তিনি ভূমি ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করেন এবং ক্যাথলিক চার্চকে পোপের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করেন। দ্বিতীয় যোসেফের শাসন সংস্কারগুলো ছিল যথার্থই প্রজাসাধারণের উপযোগী ও হিতকর। তাঁর সংস্কার কার্যের ফলে জমিদার শ্রেণী ও ক্যাথলিক চার্চ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় যোসেফকে তাদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যোসেফ সমগ্র অস্ট্রিয়ায় জার্মান

ভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে চালাবার চেষ্টা করেন এবং একে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর বেশ কয়েকটি সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রজা-সাধারণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। প্রজা অসন্তোষের চাপে পড়ে দ্বিতীয় যোসেফ তাঁর আইন-কানুন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও যোসেফ আদৌ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। এ ব্যাপারেও তাঁর দূরদর্শিতা ও বাস্তববুদ্ধির অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর ব্যাভারিয়া জয়ের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। রাশিয়ার সাথে মৈত্রীস্থাপন করে তিনি এক বড় ধরনের ভুল করেন। এই মৈত্রী সম্পর্কের ফলে রাশিয়া লাভবান হয় এবং অস্ট্রিয়া নানাভাবে ক্ষতিস্বীকার করে। অধিকন্তু পূর্ব ইউরোপে রুশ বিস্তারনীতি রোধ করতে যোসেফ অপারগ হন। ব্যাভারিয়া ও হল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে তিনি রাশিয়ার দিক থেকে উপযুক্ত সহায়তা লাভ করেননি। অথচ রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন উভয় দেশের মধ্যে এই চুক্তির সুযোগ সুবিধা নিজ স্বার্থে ভালভাবেই কাজে লাগান।

অস্ট্রিয়ার স্বার্থের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে যোসেফের উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তবে তাঁর ব্যর্থতার জন্য তাঁর বাস্তববোধের অভাবই মুখ্যতঃ দায়ী ছিল। আসলে যোসেফ ছিলেন একজন ভাববিলাসী সম্রাট। অপর জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক ফ্রেডারিকের মত বাস্তববোধ ও বিচক্ষণতা তাঁর ছিলনা। তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত চরম হতাশার মধ্যে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সমাধিফলকে নিম্নলিখিত অক্ষরগুলো খোদাই করে রাখতে নির্দেশ দিয়ে যান: 'এখানে এমন একজন মানুষ শায়িত আছেন যাঁর কোনো প্রয়াসই কখনো সাফল্যলাভ করেনি।'

য়ুয়ান-শি-কাই

[শাসনকাল ১৯১২-১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যে চীনের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব য়ুয়ান-শি-কাই ১৯১২ থেকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রথম প্রজাতান্ত্রিক চীনের রাষ্ট্রপতি পদে আসীন ছিলেন। তিনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চু শাসনাধীন চীনের বৈদেশিক মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চু সম্রাজ্ঞী জু-সীর মৃত্যু হ'লে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। য়ুয়ান-শি-কাই ছিলেন একজন দক্ষ জেনারেল। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হ'ল চীনের সৈন্যবাহিনীকে আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী করে গড়ে তোলা। এই সৈন্যবাহিনী তাঁর নেতৃত্বে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের সময় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। বিপ্লব সফল হবার পর সান-ইয়াৎ-সেন প্রথমে নবগঠিত সরকারের প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করলেও শীঘ্রই

তা য়ুয়ান-সি-কাই-এর হস্তে সমর্পণ করেন। কিন্তু সান-ইয়াৎ-সেন য়ুয়ানের মানসিকতা বুঝতে ভুল করেন। য়ুয়ান ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতালিপ্সু ও সুবিধাবাদী। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়েই য়ুয়ান গণতন্ত্রের পরিবর্তে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। ফলে য়ুয়ানকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সানের নেতৃত্বে কুয়োমিংটাং কর্তৃক আর একটি বিপ্লবের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে য়ুয়ানের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে।



রঞ্জিৎ সিংহ

[শাসনকাল ১৭৯২-১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ]

পঞ্জাব কেশরী রঞ্জিৎ সিংহ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে বসন্ত রোগে তাঁর এক চোখ নষ্ট হয়েছিল। মাত্র বার বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর তিনি সুকারচাকিয়া মিসলের নেতৃত্ব পদে আসীন হন। নেতৃত্বের স্বাভাবিক ক্ষমতা নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। একজন বড় সমরনায়ক ও দক্ষ শাসক হিসাবে তিনি প্রভূত সুনামের অধিকারী হন। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যে কয়জন বীর দেশীয় নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল রঞ্জিৎ নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে একজন। কূটনীতিবিদ হিসাবেও তিনি বেশ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি পূর্বপ্রান্তে সাটলেজ বা শতদ্রু নদী পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। রঞ্জিতের ইচ্ছা ছিল সাটলেজের অপর তীরবর্তী শিখ রাজ্যগুলোকেও জয় করা। কিন্তু তারা ভীত হয়ে ইংরেজের সাহায্য চায়। তদানীন্তন ইংরাজ বড়লাট লর্ড মিণ্টো রঞ্জিতের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করেন। রঞ্জিৎ ইংরেজদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ফলস্বরূপ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরে রঞ্জিৎ সিংহ ও ইংরাজ কোম্পানীর মধ্যে এক মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির দ্বারা শতদ্রুর দক্ষিণ দিকের শিখ রাজ্যগুলোর ব্যাপারে রঞ্জিৎ হস্তক্ষেপ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন। রঞ্জিৎ যতদিন জীবিত ছিলেন ইংরাজরাও ততদিন তাঁর রাজ্য অধিকারের কোনো প্রয়াস চালায় নি। শোনা যায় তিনি

নাকি একবার ভারতের মানচিত্রে ইংরেজের অধিকৃত লালবর্ণ এলাকাগুলো দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'সব লাল হো যায়েগা।'

রঞ্জিৎ সিংহ এক দক্ষ গোলন্দাজ বাহিনী গঠন এবং সুসংবদ্ধ শাসন ব্যবস্থার প্রচলন করেন। অমৃতসরের সন্ধি অনুযায়ী দক্ষিণে আর অগ্রসর না হলেও রঞ্জিৎ সিংহ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অভিযান করে তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তন অনেক বৃদ্ধি করেছিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। রঞ্জিতের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল পরস্পর বিবদমান শিখ রাজ্যগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি জাতীয় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। একজন ফরাসী পরিব্রাজক ভিক্টর জ্যাকম তাঁকে এক অসাধারণ মানুষ—'নেপোলিয়নের ক্ষুদ্র সংস্করণ' বলে অভিহিত করেছেন। কানিংহাম, হান্টার, লেপেল গ্রিফিন প্রভৃতির মত ইংরাজ লেখক ও ঐতিহাসিক উচ্চকণ্ঠে তাঁর গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন।

রতন সিংহ

[শাসনকাল ১৩০১-১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দ]

চিতোরের রানা রতনসিংহ ছিলেন আলাউদ্দিন খলজীর সমসাময়িক। তিনি ছিলেন বীর জৈত্র সিংহের পৌত্র এবং রাণা অমর সিংহের পুত্র। সম্ভবতঃ ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিতোরের সিংহাসনে বসেন এবং ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিনের সৈন্যবাহিনীর হাতে চূড়ান্ত পরাজয় বরণের পূর্ব পর্যন্ত রাজত্ব চালান। আমীর খসরুর বিবরণ অনুযায়ী চিতোরের রাণা ছিলেন হিন্দুস্থানের প্রধান শাসক এবং অন্যান্য হিন্দু রাজগণ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং পাহাড় কেটে তৈরী তাঁর দুর্গটি ছিল বাস্তবিকই এক আশ্চর্য বস্তু। আমীর খসরু তাঁর লেখায় এই দুর্গের বর্ণনা দিয়েছেন। আলাউদ্দিন এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে চিতোর আক্রমণ করলে রাণা রতন সিং তাঁর বীর রাজপুত বাহিনী নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। দুঃখের বিষয় আলাউদ্দিনের সাথে রাণা রতনের সংঘর্ষের কোন সুস্পষ্ট ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। শোনা যায় মুসলমান সৈন্যরা আট মাস দুর্গটিকে অবরোধ করে রাখে। দুর্গটি অত্যন্ত সুরক্ষিত হওয়ায় এবং রাজপুতবাহিনী রীতিমত বীরত্বের সাথে সংগ্রাম করায় দুর্গবিজয় সহজ হয়নি। অবশেষে আত্মরক্ষার সম্ভাবনা না দেখে রাজমহিষী পদ্মিনী প্রাসাদের অন্যান্য মহিলাদের সাথে আত্মসম্মান রক্ষার্থে জহরব্রত অবলম্বন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আলাউদ্দিন ও পদ্মিনীকে নিয়ে নানা উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। কিন্তু আধুনিককালের ঐতিহাসিকরা সেসবের কোন বাস্তব ভিত্তি আছে বলে মনে করেন না।

রাণা রতন সিংহ বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে একসময় মৃত্যুবরণ করেন বলে জানা যায় যদিও আমীর খসরু, ইসামি প্রভৃতি লেখকেরা বলেছেন যে রতন সিংহ আলাউদ্দিনের শিবিরে আশ্রয় চান এবং তাঁর জীবনরক্ষা করা হয়।

রফি-উদ্-দরাজৎ

[শাসনকাল ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ]

রফি-উদ্-দরাজৎ ছিলেন রফি-উস্-সানের পুত্র। তিনি ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে কুড়ি বছর বয়সে মোগল মসনদে আরোহণ করেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় (হুসেন ও আবদুল্লা) নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রফি-উদ্‌কে সম্রাট করেছিলেন। তাঁদের অঙ্গুলি হেলনে সম্রাটপদ লাভ ও সিংহাসনচ্যুতি ঘটত। রফি-উদ্ বিচক্ষণ ছিলেন। কিন্তু তিনি শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। নতুন সম্রাট সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্পূর্ণ হাতের পুতুলে পরিণত হন এবং তাঁরাই তাঁর হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁর আমলে এক বিদ্রোহ ঘটে। সেই সময় রফি-উদ্-দরাজৎ গুরুতর অসুস্থ। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রফি-উদ-দৌল্লাকে সম্রাট করা হয়। এই ঘটনার সপ্তাহকাল পরে রফি-উদ্-দরাজৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭১৯)।

রফিউদ্দৌলা

[শাসনকাল ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ]

রফি-উদ্-দরাজৎ এর পরবর্তী শাসক হিসাবে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রফিউদ্দৌল্লা ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সিংহাসনে বসেন। সম্রাট হবার পর তিনি দ্বিতীয় শাহজাহান নাম ধারণ করেন। রফিউদ্দৌল্লা ছিলেন একজন দুর্বলচিত্ত শাসক। শাসনকার্য পরিচালনার কোনো যোগ্যতা তাঁর ছিলনা। সিংহাসনে বসার পর থেকেই তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের (হুসেন ও আবদুল্লা) হাতের পুতুল হয়ে পড়েন। তাঁর রাজত্বকালে হুসেন আলী খান আগ্রা অভিযান করে নিকুশিয়রের বিদ্রোহ দমন করেন। রফিউদ্দৌলার স্বাস্থ্য ভাল ছিলনা। কয়েক মাস রাজত্ব করার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রবার্ট দি স্ট্রং

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী]

প্রাচীন ফ্রান্সের একজন রাজা ছিলেন। রবার্ট দি স্ট্রং নবম শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সে এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্যারিসকে কেন্দ্র করে নিউস্ট্রিয়া নামক স্থানে রাজত্ব করতেন। তাঁর আমলে ব্রিটনরা ঘনঘন প্যারিস আক্রমণ

করে। তিনি ফরাসী জনগণের প্রিয় ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েক বছর রাজত্ব চালাবার পর ৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নর্সমান বা ভাইকিংদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে রবার্ট দি স্ট্রং মৃত্যুবরণ করেন।

রবার্ট ব্রুস

[শাসনকাল ১৩০৬-১৩২৯ খ্রীষ্টাব্দ]

স্কটল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন। তিনি 'রবার্ট দি ব্রুস' নামে ইতিহাসে পরিচিত। রবার্ট ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসেন। তাঁর সাথে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডোয়ার্ডের সম্পর্ক প্রথম দিকে ভাল থাকলেও পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয় এবং প্রথম এডোয়ার্ডের কোপে পড়ে তাকে দীর্ঘদিন পলাতক অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়েছিল। তাঁর ভবঘুরে পলাতক জীবনের কাহিনী নিয়ে নানা গল্প গড়ে উঠেছে যার মধ্যে মাকড়শা'র অধ্যবসায় দেখে তাঁর অনুপ্রাণিত হওয়ার ঘটনাই সবচেয়ে বিখ্যাত। ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এডোয়ার্ডের মৃত্যুর পর অপদার্থ দ্বিতীয় এডোয়ার্ড সিংহাসনে বসলে রবার্ট ব্রুসের সামনে থেকে এক প্রবল বাধা অপসৃত হয়। অবশ্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য রবার্টকে এর পরও বহু বছর ধরে শক্তি সংগ্রহ করতে হয়েছিল। তিনি ক্রমশঃ ইংরেজ অধিকৃত স্কটিশ দুর্গগুলো পুনর্দখলের প্রয়াস চালাতে থাকেন। ১৩১৪ তিনি খ্রীষ্টাব্দে ব্যানকবার্নের যুদ্ধে দ্বিতীয় এডোয়ার্ডের ইংরাজ বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। এটা ছিল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্কটিশদের এক অভূতপূর্ব সাফল্য। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে স্কটল্যাণ্ডে তিনি শুধু যে নিশ্চিন্তে রাজত্ব করার সুযোগ পান তাই নয়, উপরন্তু ইংলণ্ডের পক্ষে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ান। ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের সাথে এক চুক্তির মাধ্যমে স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীন শাসক হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেন। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন সেই সময় তিনি প্রকৃতই ছিলেন সহায়-সম্বলহীন। শক্তিশালী ইংরাজদের বিরুদ্ধে স্কটিশ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে দীর্ঘকালীন কষ্টস্বীকার ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ব্রুস যে সংগ্রাম চালান তার জন্যই তিনি স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ করেছেন। ১৩২৯ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ব্রুসের মৃত্যু হয়।

রাজরাজ চোল

[শাসনকাল ৯৮৫-১০১৪ খ্রীষ্টাব্দ]

দক্ষিণ ভারতের চোল রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন রাজরাজ চোল। ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁর রাজত্বকাল থেকেই চোল

বংশের ইতিহাসে গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। রাজরাজ ছিলেন একাধারে একজন সাম্রাজ্যজয়ী বীর ও দক্ষ প্রশাসক। তাঁর আমলে চোল সাম্রাজ্য সমগ্র মাদ্রাজ, কুর্গ, সিংহলের একাংশ ও মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এমনকি মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপের উপরও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চোল শাসনব্যবস্থায় তিনি যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন তা শুধু দক্ষিণভারতের ইতিহাসেই নয়, সমগ্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় অবদান হিসাবে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য। রাজরাজের আর একটি বড় কীর্তি হল এক রণকুশলী সুবিশাল নৌবহরের সৃষ্টি করা। তাঁর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষে দক্ষিণভারত শ্রেষ্ঠ নৌশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। রাজরাজ শৈবধর্মের বিশেষ অনুরাগী হলেও অন্যান্য ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর আমলে দক্ষিণভারতে বহু বিষ্ণুমন্দির, বৌদ্ধ মঠ এবং চৈত্য স্থাপিত হয়েছিল।

রাজারাম

[শাসনকাল ১৬৮৯-১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ]

শম্ভুজীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রের নেতা হন রাজারাম। তিনি ছিলেন শম্ভুজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি শম্ভুজীর মত অতখানি দুর্বল চরিত্রের মানুষ ছিলেন না। শম্ভুজীর মৃত্যুর সময় বাস্তবিকপক্ষে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট ছিলনা। রাজারাম মহারাষ্ট্রকে শিবাজীর ভাবাদর্শে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। তাঁর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের জনগণ মোগলদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সুদীর্ঘ এগারো বছর মোগলদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে ১৭00 খ্রীষ্টাব্দে রাজারাম মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাজেন্দ্র চোল

[শাসনকাল ১০১৪-১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দ]

রাজরাজ চোলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র ১0১৪ খ্রীষ্টাব্দে চোল বংশের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১0৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছরকাল রাজত্ব করেন। তাঁর আমলে চোল সাম্রাজ্য সমসাময়িক ভারতবর্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিস্তৃত হিন্দু সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তিরুমালাই শিলালেখ থেকে রাজেন্দ্রর রাজ্যজয়ের কথা জানা যায়। তিনি প্রথমে দক্ষিণের চের ও পাণ্ড্যদের রাজ্য জয় করেন। অতঃপর সিংহল অভিমুখে তিনি অগ্রসর হন এবং সিংহলরাজ পঞ্চম মহেন্দ্রকে পরাজিত করেন। অবশ্য সিংহলের উপর প্রভাব দীর্ঘকাল বজায় রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এরপর তিনি চোলদের প্রবল প্রতিপক্ষ পশ্চিমের চালুক্যদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং

চালুক্যরাজ জয়সিংহকে পরাজিত করেন। পরবর্তীকালে তিনি আবার অভিযান চালিয়ে চালুক্য রাজ্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন। রাজেন্দ্র পূর্বভারত অভিমুখেও তাঁর সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এবং কলিঙ্গ, বস্তার প্রভৃতি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে তাঁর বিজয়ী সেনাদল বঙ্গদেশে প্রবেশ করেছিল। রাজেন্দ্র তাঁর এই বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ 'গঙ্গইকোণ্ড' উপাধি ধারণ করেন। অবশ্য এই অভিযানের কোন স্থায়িত্ব ছিল না। রাজেন্দ্র অভিযান চালিয়ে শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মালয়, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি জয় করেন। ভারত মহাসাগরের উপর নিঃসন্দেহে চোল নৌবহরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রাজেন্দ্র শুধু চোল বংশেরই নয়, প্রাচীন ভারতের একজন অন্যতম শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি অনেক উপাধি ধারণ করেছিলেন। তাঁর আমলে চোল সাম্রাজ্য উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তিনি একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন যার নাম 'গঙ্গইকোণ্ড-চোলপুরম'।

রাজ্যপাল

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দী]

প্রতিহার বংশের একজন রাজা ছিলেন। দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্যপাল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন প্রতিহার বংশের সূর্য একরকম অস্তমিতই বলা চলে। এই সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ চলছে এবং হিন্দু শাহী বংশ এর প্রতিরোধের চেষ্টা চালাচ্ছে। রাজ্যপাল শাহীদের সাহায্যে বেশ কিছু সৈন্য প্রেরণ করেন বলে জানা যায়, যদিও এই সাহায্য খুব তেমন কার্যকরী হতে পারেনি। ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণে এসে রাজ্যপালের রাজধানী কনৌজ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। রাজ্যপাল উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন এবং শেষ পর্যন্ত অপমানজনক শর্তে মামুদের সাথে সন্ধিস্থাপন করেন। রাজ্যপালের ঘৃণ্য আত্মসমর্পণে ক্রুদ্ধ হয়ে চান্দেল্লরাজ আরও দু-একটি রাজ্যের সাথে সমবেতভাবে রাজ্যপালকে আক্রমণ ও নিহত করেন।

রাজ্যপাল

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী]

বাংলার পালবংশের একজন রাজা। ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববর্তী রাজা নারায়ণ পালের মৃত্যুর পর রাজ্যপাল তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল চরিত্রের মানুষ। সামরিক শক্তি কিংবা শাসনতান্ত্রিক দক্ষতা

এ দুয়ের কোনটিরই অধিকারী তিনি ছিলেন না। রাজ্যপাল যখন রাজা হন তখন পাল সাম্রাজ্যের গৌরবসূর্য অস্তাচলগামী। তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চান্দেল্ল, কলচুরী প্রভৃতি অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যগুলো পালসাম্রাজ্য আক্রমণ করে বেশ কিছু কিছু স্থান তাদের অধিকারভুক্ত করে নেয়। রাজ্যপাল সিংহাসনে বসার পূর্ব থেকেই পালসাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। এই ভাঙ্গন রোধ করার সাধ্য রাজ্যপালের ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী বংশধরদের অযোগ্যতার দরুণ প্রথম মহীপালের সিংহাসনারোহণের পূর্ব পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

রামপাল

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী]

বাংলার পাল বংশের একজন রাজা ছিলেন। রামপাল ছিলেন দ্বিতীয় মহীপালের পরবর্তী পাল শাসক। দ্বিতীয় মহীপালের সময় কৈবর্ত নেতা দিব্য কিছু-কালের জন্য উত্তরবঙ্গে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রামপাল সিংহাসনে বসেই ঘরের শত্রু বিনাশ করতে সচেষ্ট হন এবং দিব্যর উত্তরাধিকারী ভীমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। তিনি রাষ্ট্রকূটদের সহায়তায় ভীমকে পরাজিত ও নিহত ক'রে উত্তরবঙ্গ পুনরায় পাল শাসনের অধীনে আনেন। এই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে তিনি এক নতুন রাজধানী স্থাপন করে তার নাম 'রামাবতী' রাখেন। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত' গ্রন্থ রামপালকে কেন্দ্র করেই রচনা করেন। রামপালের সময় পালবংশের সৌভাগ্যসূর্য ছিল অস্তাচলগামী। সেই পতনোন্মুখ অবস্থা প্রতিরোধ করার সাধ্য রামপালের ছিলনা। তাই ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর কয়েক দশকের মধ্যেই বাংলায় পাল শাসনের অবসান ঘনিয়ে আসে।



রিচার্ড প্রথম

[শাসনকাল ১১৮৯-১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ]

ইংলণ্ডের একজন রাজা। দ্বিতীয় হেনরীর মৃত্যু হলে তিনি সিংহাসনে বসেন এবং দশ বছর রাজত্ব করার পর ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রথম রিচার্ড ছিলেন একজন সাহসী ও উদারচেতা রাজা। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর বীরত্ব প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। জনগণের কাছে তিনি রিচার্ড 'দি লায়ন-হার্টেড' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথমে

ফ্রান্সের রাজপরিবারের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন ; পরে এই বৈবাহিক সম্পর্ক বাতিল করে স্পেনের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। ফলে ফ্রান্সের সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। রিচার্ডের রাজত্বকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল তৃতীয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্বপদ গ্রহণ। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।



রিচার্ড দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৩৭৭-১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দ]

এডোয়ার্ড প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ বা ব্ল্যাক প্রিন্স এর দ্বিতীয় পুত্র রিচার্ড ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় এডোয়ার্ডের মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন দুর্বলচিত্ত ও অযোগ্য। তিনি ছিলেন অমিতব্যয়ী এবং তাঁর ব্যক্তিগত খরচ অত্যন্ত বেশী ছিল। পার্লামেণ্টের সাথে এই নিয়ে রিচার্ড এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পার্লামেণ্ট এই সময় খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং নানা অভিযোগে রাজার সমর্থকদের অনেককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। ফ্রান্সের সাথে রিচার্ড এক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ১৩৯৬ খ্রীষ্টাব্দে উভয় দেশের মধ্যে এক চুক্তির মাধ্যমে বিরোধের অবসান ঘটে। কিন্তু দ্বিতীয় রিচার্ডের স্বেচ্ছাচারী অপশাসনে শীঘ্রই দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। অবশেষে পার্লামেণ্টের চাপে পড়ে রিচার্ড ল্যাঙ্কাশায়ারের ডিউক জনের পুত্র হেনরীর পক্ষে সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হন (১৩৯৯)।

রিচার্ড তৃতীয়

[শাসনকাল ১৪৮৩-১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ]

তৃতীয় রিচার্ড ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি ইয়র্ক পরিবারভুক্ত ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর তিনজন ভ্রাতুষ্পুত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। তৃতীয় রিচার্ড অত্যাচারী শাসক ছিলেন এবং সামান্যতম বিরোধিতাও সহ্য করতে পারতেন না। বাকিংহামের ডিউক ছিলেন তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত

অনুচর। তাঁর অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করায় ডিউককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তৃতীয় রিচার্ডের কুশাসনে ইংলণ্ডবাসী অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই সুযোগে ল্যাংকাস্টারের আর্ল অব্ রিচমণ্ড (পরবর্তীকালে সপ্তম হেনরী) রাজসিংহাসন দখলের জন্য এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তৃতীয় রিচার্ডের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বসওয়ার্থের যুদ্ধক্ষেত্রে তৃতীয় রিচার্ডকে পরাজিত ও নিহত করে তিনি সপ্তম হেনরী নামধারণ করে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইভাবে তৃতীয় রিচার্ডের স্বল্পস্থায়ী অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটে।



রিজিয়া

[শাসনকাল ১২৩৬-১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ]

ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর দিল্লির সিংহাসনের অধিকার নিয়ে সমস্যা ও আভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দেয়। পুত্রদের অযোগ্যতার কথা বিবেচনা করে ইলতুৎমিস মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কন্যা রিজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করে যান। দিল্লীর দরবারের আমীর-ওমরাহগণ কোনো স্ত্রীলোকের অধীনে থাকতে রাজী না হওয়ায় রীতিমত গোলযোগ শুরু হয়ে যায়। ফলে সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে রিজিয়াকে দরবারের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু রিজিয়া যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্না ছিলেন। তিনি শীঘ্রই কূটনৈতিক দক্ষতার সাহায্যে বিরোধীপক্ষকে বশীভূত করে ফেলেন। তাঁর কর্তৃত্ব দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ, পঞ্জাব, সুদূর বাংলা ও সিন্ধুদেশে বিস্তৃত হয়েছিল। মিনহাজ-উস্-সিরাজের লেখা থেকে জানা যায় লক্ষ্মৌতি থেকে দেবল পর্যন্ত সব মালিক ও আমীর রিজিয়ার কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। কিন্তু স্বস্তিতে রাজত্ব চালানোর ভাগ্য রিজিয়ার ছিলনা। শীঘ্রই জালালউদ্দিন ইয়াকুব নামক এক আবিসিনিও ক্রীতদাসকে উচ্চপদে স্থাপন করাকে কেন্দ্র করে তুর্কী অভিজাতরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সর্বপ্রথম বিদ্রোহী হন সরহিন্দের শাসক ইখ্তিয়ারউদ্দিন আলতুনিয়া। তিনি গোপনে রাজদরবারের কয়েকজন ক্ষমতাশালী অভিজাতের সঙ্গে হাত মিলান। রিজিয়া এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আলতুনিয়ার বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি বিদ্রোহীদের হস্তে বন্দী হন। বুদ্ধিমতী রিজিয়া আল-

তুনিয়াকে বিবাহ করে এই সংকটময় পরিস্থিতির হাত থেকে উদ্ধার লাভের চেষ্টা করেন এবং স্বামী সহযোগে দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু তাঁর ভাই মুইজউদ্দিন বহরমের (যাঁকে সুলতান বলে বিদ্রোহীরা ঘোষণা করেছিল) সৈন্যবাহিনীর হাতে তিনি আলতুনিয়াসহ ধৃত ও নিহত হন (১২৪০)। এইভাবে মাত্র চার বছর রাজত্ব করার পর মর্মান্তিকভাবে সুলতানা রিজিয়ার জীবনাবসান ঘটে। বহুগুণসমন্বিতা হয়েও ভাগ্যদোষে তিনি মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হন এবং ঐতিহাসিক মিনহাজ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন যে শাসক হবার সবরকম যোগ্যতা তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন এবং রাজদরবারে সবসময় পুরুষের বেশে চলাফেরা করতেন। কিন্তু নারী হিসাবে জন্মগ্রহণ করার জন্য তাঁকে দেশের অধিকাংশ প্রভাবশালী অভিজাতের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। রিজিয়া হলেন ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা শাসক।



রিপন

[শাসনকাল ১৮৮০-১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ]

ব্রিটিশ ভারতের একজন ভাইসরয় ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসক লর্ড লিটনের পরবর্তী শাসক হিসাবে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত উদারনৈতিক নেতা গ্ল্যাডস্টোনের শিষ্য রিপন নিজেও উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। ভারতীয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল এবং তাদের মঙ্গলের জন্য তিনি নানা শাসন সংস্কারের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে রিপন তাঁর পূর্ববর্তী শাসক লিটনের মত জঙ্গী মনোভাব প্রদর্শন না করে শান্তিপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় রাখেন। তিনি আফগান জাতীর স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন এবং আমীর আবদুর রহমানের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেন। তিনি মহীশুরের হিন্দু রাজবংশের হাতে রাজ্যটির শাসনভার পুনরায় অর্পণ করেন। রিপনের চার বছর

স্থায়ী শাসনকাল আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারের জন্যই ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি আদমসুমারী বা লোক গণনার ব্যবস্থা করেন এবং লবণ ও অন্যান্য বাণিজ্যদ্রব্যের উপর থেকে শুল্ক তুলে দেন। লর্ড লিটন 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' এর মাধ্যমে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিলেন। রিপন এই কুখ্যাত আইন তুলে নেন। শিশু-শ্রমিকদের অমানুষিক কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি কারখানা আইন চালু করেন। তাঁর আমলেই ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিখ্যাত 'হান্টার কমিশন' গঠন করা হয়েছিল। তিনি কৃষি ও রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যও বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

লর্ড রিপনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হল স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থার প্রচলনের উদ্দেশ্যে নানাবিধ আইন প্রণয়ন। তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট' স্থাপনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে সর্বপ্রথম স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার প্রচলন ঘটান। বিচার ব্যবস্থায় ভারতীয় ও ইউরোপীয় জনগণের মধ্যে আইনের দৃষ্টিতে বৈষম্য হ্রাসের উদ্দেশ্যে রিপন তাঁর আইনমন্ত্রী ইলবার্টের সাহায্যে এক আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন (যা ইতিহাসে ইলবার্ট বিল নামে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে)। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে এর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেওয়ায় রিপন শেষ পর্যন্ত এই আইন সম্পূর্ণ কার্যকরী করতে পারেননি। প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন (১৮৮৪)। ভারতবাসীর কাছে তিনি খুব প্রিয় ছিলেন। ভারতীয় জনগণ তাঁকে 'ভারতবন্ধু' আখ্যা দেয় এবং বিপুল গণ সম্বর্দ্ধনা লাভ করে তিনি স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

রীডিং

[শাসনকাল ১৯২১-১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ]

রুফুস ড্যানিয়েল আইজ্যাক, প্রথম মারকুইস অব রীডিং ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় ছিলেন। একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ রীডিং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আইনজীবী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। এই কাজে তিনি খুবই সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একজন উদারপন্থী হিসাবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। তিনি ১৯১০ সালে এ্যাটর্নী জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯১২ সালে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে একটি আসন লাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রীডিং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেন। তিনি একাধিকবার ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ দূত হিসাবেও কার্য করেন। ১৯২১ সালে তাঁকে ভারতের ভাইসরয় পদে নিযুক্ত করা হয়। এই সময়টা ছিল এদেশে ব্রিটিশ

শাসনের পক্ষে খুবই সংকটজনক সময়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জালিনওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর প্রধানতঃ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিক্ষোভ রীতিমত পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে এবং রীডিং ভারতবর্ষে তাঁর শাসন পরিচালনার ব্যাপারে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। ১৯২৬ সালে তিনি বিলাতীয় কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুসারে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে তিনি মার্কুইস উপাধি লাভ করেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭৫ বছর বয়সে রীডিং মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রুকনউদ্দিন বরবক

[শাসনকাল ১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ]

ইলিয়াস শাহী বংশের রাজা ছিলেন। রুকনউদ্দিন ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পিতা নাসির-উদ্দিনের মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে বসেন। পিতার রাজত্বকালে তিনি সোনারগাঁর শাসক হিসাবে নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর সিংহাসনারোহণ শান্তিপূর্ণ হয়েছিল। সমসাময়িক লেখকগণ তাঁকে বিচক্ষণ, আইন-মান্যকারী সুলতান হিসাবে অভিহিত করেছেন। এই সময় দেশের সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবন-যাপন করত। বরবকের সামরিক অভিযানের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় শাহ ইসমাইল গাজীর লেখা জীবনীগ্রন্থ 'রিসালাৎ-উস্-সুহদ্' থেকে। তিনি উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি অভিমুখে সমরাভিযান প্রেরণ করেছিলেন। বরবক বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের লেখক মালাধর বসু গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে যে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন কৃতজ্ঞচিত্তে তার উল্লেখ করেছেন। বরবক কবিকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। পনের বছর রাজত্ব করার পর বরবকের মৃত্যু হয় (১৪৭৪)।



রুজভেল্ট

[শাসনকাল ১৯৩২-৩৬, ১৯৩৯-৪০, ১৯৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ ফ্রাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্ট ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আঠাশ বছর বয়সে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হবার আগে তিনি নিউইয়র্কের গভর্ণর পদে কয়েক বছর কাজ করেন (১৯২৯-৩২)। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হন এবং নির্বাচনে জয়লাভ ক'রে সরকার গঠন করেন। তিনি মোট তিনবার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন যে সম্মানলাভ তাঁর পূর্বে আর কোনো রাষ্ট্রপতির ভাগ্যে ঘটেনি। প্রথমবার তিনি ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে আসীন থাকেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেও ১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয়বার ঐপদ লাভ করেন। পুনরায় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচনে জয়লাভ ক'রে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন রুজভেল্ট একাধিকবার রাষ্ট্রপতির পদ লাভ করেছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রুদ্রদামন

[শাসনকাল ১৩০-১৫০ খ্রীষ্টাব্দ]

রুদ্রদামন ছিলেন শক-ক্ষত্রপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাসক। সম্ভবতঃ ১৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ক্ষত্রপ সিংহাসনে তিনি আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালের এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় জুনাগড়ে প্রাপ্ত গিরিনগর শিলালেখ থেকে। এই শিলালেখতে তিনি সাতবাহন রাজা সাতকর্ণীকে একাধিকবার পরাজিত করেন এবং সাতবাহন রাজ্যের অনেকগুলো স্থান তাঁর হস্তগত হয় বলে দাবি করেন। এছাড়া তিনি দক্ষিণ পাঞ্জাব অঞ্চলে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন। শুধুমাত্র সামরিক দিক দিয়ে নয়, একজন প্রজাদরদী সুশাসক হিসাবেও রুদ্রদামনের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। বহু সদ্‌গুণের অধিকারী দ্রুরদানম। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন এবং এই ভাষায় নিজে কবিতা রচনাও করেছেন। তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর আমলে উজ্জয়িনী শহর জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল।



রোবসপীয়ের

[শাসনকাল ১৭৯৩-১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের মধ্যে বিপ্লব চলাকালীন সময়ে ফ্রান্সের রাষ্ট্র-নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ম্যাক্সিমিলিয়েন রোবসপীয়রের ১৭৯৩থেকে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জ্যাকবিন দলের একজন নেতা ছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে জানুয়ারী রাজা ষোড়শ লুইয়ের শিরশ্ছেদের পর রাজতন্ত্রের সমর্থনে ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে নবগঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইউরোপের রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোও ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পতনে আশঙ্কিত বোধ করে এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ফলে ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় প্রকার বিপদ থেকে ফরাসী প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে রক্ষার উদ্দেশ্যে যে কঠোর দমনমূলক শাসন চালানো হয় তা ইতিহাসে 'সন্ত্রাসের শাসন' নামে পরিচিত। 'কমিটি অব্ পাবলিক সেফটি' ও 'রিভলুশনারী ট্রাইবুনাল' নামক দুই সমিতির মাধ্যমে সন্ত্রাসের শাসনকে পরিচালিত করা হয়। ম্যাক্সি-মিলিয়েন রোবসপীয়ের ও দাঁতো ছিলেন এই শাসকগোষ্ঠীর দুই প্রধান নেতা। রাজতন্ত্রের সমর্থক ও বিপ্লবের শত্রু সন্দেহে এই শাসনপর্বে দেড় বছরের মধ্যে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। সন্ত্রাসের শাসনে অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে দাঁতো এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলে তাঁকে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দাঁতোর মৃত্যুর পর রোবসপীয়ের সন্ত্রাসের শাসনের অবিসংবাদী নেতা এবং ফ্রান্সের সর্বময় প্রভু হয়ে ওঠেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই জাতীয় প্রতিনিধিসভার অধিকাংশ সদস্য তাঁর বিপক্ষে যাওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে রোবসপীয়েরকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই গিলোটিনে তাঁর শিরশ্ছেদ করার সাথে সাথে সন্ত্রাসের শাসনের অবসান ঘটে। ফরাসী বিপ্লব এরপর ভিন্নপথে অগ্রসর হতে থাকে।

লক্ষ্মণ সেন

[শাসনকাল ১১৭৯-১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ]

সেন বংশের শেষ বড় রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। সম্ভবতঃ ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেন পিতা বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময়

তাঁর বয়স ছিল ষাট বছর। শিলালিপি ও সাহিত্যিক উপাদান থেকে জানা যায় লক্ষণ সেন গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ ও কাশীর রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। লক্ষণ সেনের একটি বড় সাফল্য হল গাড়ওয়ালদের বিরুদ্ধে জয়লাভ। তিনি গাড়ওয়ালরাজ জয়চন্দ্রকে মগধ থেকে বিতাড়িত করেন এবং বারাণসী ও এলাহাবাদ পর্যন্ত তাঁর বিজয়ী সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হয়। লক্ষণ সেন পশ্চিমের কলচুরিরাজের সাথেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। লক্ষণ সেনের রাজত্বকালের মহিমা অনেকাংশে ম্লান হয়ে যায় বাংলাদেশে মুসলমান অভিযানের পর। মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন সিরাজ লিখিত 'তবকৎ-ই-নাসিরী' থেকে জানা যায় বক্তিয়ার খিলজী নামক একজন মুসলমান সেনাপতি মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে লক্ষণ সেনের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন। তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী বক্তিয়ার বেশ কিছুটা দূরে রেখেছিলেন। লক্ষণ সেন তখন মধ্যাহ্নকালীন আহারে বসেছিলেন। তিনি এই খবর পেয়ে প্রাসাদের পিছন দিকের দরজা দিয়ে পলায়ন করেন এবং পূর্ববঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হন। বাংলাদেশ বক্তিয়ারের দখলে আসে। মিনহাজের বিবরণ আধুনিক কালের ঐতিহাসিকরা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন না। যাই হোক, এই পরাজয়ের পরও লক্ষণ সেন পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের কিছু স্থানের স্বাধীন রাজা হিসাবে রাজত্ব চালাতে থাকেন এবং সম্ভবতঃ ১২০৫ সাল নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়।

এই পরাজয় সত্ত্বেও বলা যায় লক্ষণ সেন ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী রাজা। তাঁকে বাংলার শেষ বড় হিন্দু শাসক বলা চলে।

শাসনকার্য পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষণ সেন কাব্যচর্চা করতেন। গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব, পবনদূত কাব্য রচয়িতা ধোয়ী এবং হলায়ুধ, শ্রীধরদাস প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন। লক্ষণ সেন বৈষ্ণব ধর্মের একজন রীতিমত অনুরাগী ছিলেন।



লক্ষ্মীবাঈ

[শাসনকাল উনবিংশ শতাব্দী]

ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ ইতিহাসের এক স্মরণীয় নারী। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি ঝাসীর রানী ছিলেন। ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদের মৃত্যুবরণ তাঁকে ভারতের ইতিহাসে অমরতা দান করেছে। মাত্র আট বছর বয়সে ঝাঁসীর যুবরাজের সাথে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অল্প বয়সেই তিনি অশ্বারোহণ এবং অসি চালনায় পারদর্শিতা লাভ করেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর উনিশ বছর বয়সে রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রানী লক্ষ্মীবাঈ জনহিতকর ফাজকর্মের মাধ্যমে ঝাঁসীর মানুষের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ঝাঁসী অল্পকালের মধ্যেই এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। লক্ষ্মীবাঈয়ের কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ শাসক লর্ড ডালহৌসী স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে ঝাঁসী রাজ্যটিকে কোম্পানীর অধীনস্থ রাজ্যে পরিণত করতে অগ্রসর হন। কিন্তু বীরাঙ্গনা রমণী লক্ষ্মীবাঈ এই অন্যায় দাবী মানতে অস্বীকৃত হন। ১৮৫৭ খ্রীঃ সমগ্র ভারতব্যাপী সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলে লক্ষ্মীবাঈ ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তিনি দশহাজার সুদক্ষ সৈন্য নিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে এক মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তীব্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর অবশেষে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মৃত্যুবরণ করেন। লক্ষ্মীবাঈয়ের অসাধারণ বীরত্ব, সাহস, রণদক্ষতা ও যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনার ক্ষমতা তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ স্যার হিউ রোজকে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল। লক্ষ্মীবাঈয়ের মৃত্যুর সাথে সাথে ঝাঁসী ইংরেজ কোম্পানীর করতলগত হয়।

লরেন্স

[শাসনকাল ১৮৬৪-১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ]

ব্রিটিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। স্যার জন লরেন্স পূর্ববর্তী শাসক লর্ড এলগিনের পর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শাসনভার গ্রহণ করেন এবং পাঁচ বছর এই পদে

আসীন থাকেন। তিনি মাত্র সতের বছর বয়সে ভারতে আসেন এবং এদেশে থেকে যথেষ্ট সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। কোম্পানীর একজন সামান্য কেরানী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে তিনি নিজ অধ্যবসায় ও যোগ্যতাবলে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। লরেন্সের শাসনকালে উড়িষ্যা, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ লেগে বহু মানুষ মা। যায়। দুর্ভিক্ষ নিবারণের উদ্দেশ্যে তিনি একটি সেচ বিভাগ স্থাপন করেন এবং কৃষি-কাজের স্বার্থে একাধিক প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করেন। রুরকীর বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তাঁর আমলেই নির্মিত হয়েছিল। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে লরেন্স সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি বজায় রেখে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। আফগানিস্থানে আমীর দোস্ত মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে এক গৃহযুদ্ধ শুরু হলে লরেন্স সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত থাকেন। শেষ পর্যন্ত শের আলী জয়ী হলে লরেন্স আমীর হিসাবে তাঁকে স্বীকৃতি জানান। কিন্তু ভুটানের ক্ষেত্রে লরেন্স নিরপেক্ষতা নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজ্যটির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং ডুয়ার্স অঞ্চল অধিকার করে নেন। জন লরেন্স ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

লিও

[**শাসনকাল** ৭১৭-৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ]

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের একজন বিশিষ্ট সম্রাট। তিনি ৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মোট ২৩ বছর রাজত্ব করেন। লিও ছিলেন একজন পরিশ্রমী, দক্ষ ও সাহসী সম্রাট। তাঁর রাজত্বকালের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল স্যারাসেনদের আক্রমণ থেকে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা। সিংহাসনে বসার কয়েক মাসের মধ্যেই স্যারাসেনরা এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর নিয়ে লিওর বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চালায়। তিনি বুলগার রাজা টারবেলের সঙ্গে যৌথভাবে আরব মুসলিমদের আক্রমণের মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসেন এবং যুদ্ধে অসাধারণ সাহস ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করে শত্রু-বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দেন। এটাই ছিল সেই যুগে খলিফা প্রেরিত সবচেয়ে প্রবল মুসলিম সমরাভিযান যা এমনকি চার্লস মার্টেলের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানকে ম্লান করে দিয়েছিল। সেইসময় স্যারাসেনদের বিজয়াভিযানে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো হয়ে পড়েছিল নিতান্তই অসহায়। লিও সফলভাবে আরবদের প্রতিহত করে ইউরোপকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব অপর বিখ্যাত বাইজানটাইন শাসক চার্লস মার্টেলের চেয়েও বেশি বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রেও লিও স্বীয় প্রতিভার প্রমাণ রাখেন। শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগেই তিনি সংস্কার সাধনের প্রয়াস চালান। তিনি প্রচলিত

আইনের সংস্কার করেন এবং 'ইক্লোগা' নামে আইনের নতুন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। লিওর প্রবর্তিত নানা সংস্কারের জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তাঁর কাছে ঋণী। তাঁর আমলে ক্রীতদাসের সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তবে তাঁর আমলের একটা অন্ধকার দিক হল, এই সময় নানাপ্রকার কুসংস্কার সমাজজীবনে বাসা বাধে যার প্রভাব সমসাময়িক সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম প্রভৃতির মধ্যে পড়তে দেখা যায়। ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে লিওর গৌরবময় রাজত্বের অবসান ঘটে। মূর্তিপূজাকে কেন্দ্র করে আইকনোক্লাস্টিক বিবাদ-বিতর্ক তাঁর আমলের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

লিও চতুর্থ

[শাসনকাল ৭৭৫-৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ]

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের একজন রাজা। কনস্টানটাইন কপরোনিমাসের পরবর্তী সম্রাট হিসাবে ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। চতুর্থ লিওর রাজত্বকাল মাত্র পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি পিতার নীতি অনুসরণ করেন। তাঁর পিতার আমলে মূর্তিপূজাকে কেন্দ্র করে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং মূর্তিপূজার সমর্থকদের তাঁর পিতা নির্মমভাবে দমন করার প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। তবে পিতার মত অতখানি নিষ্ঠুরতা তিনি প্রদর্শন করেননি। তিনি বহু 'আইকনো ডিউলি'কে শারীরিক শাস্তি দেন এবং অত্যন্ত অবাধ্য ও উগ্র ব্যক্তিদের নির্বাসিত করেন। কিন্তু মঠবাসী সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে তিনি কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করেননি এবং পিতার আমলে ক্ষতিগ্রস্ত মঠগুলোর পুনর্গঠনেরও অনুমতি প্রদান করেন। ৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তাঁর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। এই ষড়যন্ত্রের সাথে মূর্তিউপাসকরা বিজড়িত আছে জানতে পেরে তিনি তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালান। তবে তিনি নরহত্যার বিরোধী ছিলেন এবং রক্তপাত এড়িয়ে চলতেন। মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর চতুর্থ লিও তাঁর নাবালক পুত্র ষষ্ঠ কনস্টানটাইনের হস্তে শাসনভার অর্পণ করেন (৭৮০ খ্রীঃ)।

লিওনিডাস

[শাসনকাল খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দী]

লিওনিডাস খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে স্পার্টার রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পারস্যরাজ জারাক্সেস এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে গ্রীস দেশ আক্রমণ করেন। জারাক্সেসের অগ্রগতি প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে রাজা লিওনিডাস মাত্র কয়েকশো সৈন্য নিয়ে জারাক্সেসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। স্বল্প সংখ্যক স্পার্টান সৈন্য অপূর্ব বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করে দুই দিন থার্মোপাইলির গিরিপথে বিপুল সংখ্যক

পারসীকবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তৃতীয় দিন এফিয়ালটিস নামক একজন গ্রীকের বিশ্বাসঘাতকতায় জারাক্সেস লিওনিডাসের বাহিনীকে আক্রমণ করার এক উপযুক্ত স্থানের সন্ধান জেনে ফেলেন। এফিয়ালটিসের বিশ্বাসঘাতকতার খবর শুনে লিওনিডাস তাঁর বাহিনীর পতন আসন্ন জেনে এক মরণপণ সংগ্রাম শুরু করেন এবং সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন (৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। লিওনিডাসের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও অবশেষে আত্মোৎসর্গের মহান কাহিনী সমগ্র গ্রীসকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। লিওনিডাস তাঁর এই বীরত্ব ও মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

৩



লিওপোল্ড

[শাসনকাল উনবিংশ শতাব্দী]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বেলজিয়ামের রাজা ছিলেন। তিনি 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' আফ্রিকা মহাদেশকে ভালভাবে জানার জন্য এক আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সংস্থা স্থাপনে প্রয়াসী হন। লিওপোল্ডের এই সংস্থা গঠনের পশ্চাতে যে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব কাজ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সংস্থার সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ক্রমশঃ স্বার্থের সংঘাত দেখা দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত সংস্থাটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। বেলজিয়াম ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র এক রাষ্ট্র। বেলজিয়ামের আয়তন ও প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্রাট লিওপোল্ড আফ্রিকার বিশাল এলাকা নিয়ে গঠিত কঙ্গো রাজ্য দখল করে নেন। লিওপোল্ডের দেখাদেখি ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোও আফ্রিকার নানাস্থান নিজেদের অধিকারে আনতে অগ্রসর হয়।

লিঙ্কন



[শাসনকাল ১৮৬১-১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেসিডেণ্ট এবং বিশ্ব ইতিহাসের একজন স্মরণীয় মানুষ আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কেণ্টাকীর এক সামান্য পরিবারে কাঠের কুটিরে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সামান্য অবস্থা থেকে বহুগুণসমন্বিত এই মানুষটি স্বীয় ক্ষমতা ও যোগ্যতাবলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদ পর্যন্ত লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন পরিশ্রমী, কর্মনিপুণ, সহিষ্ণু, চিন্তাশীল, দয়ালু, নির্ভীক এবং দৃঢ়চেতা। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন বিচক্ষণ তেমনি অপরদিকে ছিলেন প্রচণ্ড শারীরিক শক্তির অধিকারী। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৫২ বছর বয়সে লিঙ্কন রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হন। তারপর থেকে আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার বিলোপসাধন এবং আমেরিকার আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখাই ছিল তার জীবনের প্রধান দুটি লক্ষ্য। লিঙ্কন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত হবার সময় আমেরিকা শিল্প-প্রধান উত্তরাঞ্চল ও কৃষিপ্রধান দক্ষিণাঞ্চলে বিভক্ত ছিল। উত্তরাঞ্চলের উপনিবেশগুলো থেকে ইতিমধ্যেই দাসপ্রথা উঠে গিয়েছিল। কিন্তু কৃষিনির্ভর দক্ষিণাঞ্চলে ক্রীতদাসদের সাহায্যে জমি চাষ করানো হ'ত বলে সেখানে তাদের চাহিদা ছিল খুবই বেশি। এইসব ক্রীতদাসের প্রতি চরম অমানবিক ব্যবহার করা হ'ত। দাসদের শোচনীয় জীবনযাত্রা-প্রণালী লিঙ্কনকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল। দেশের সর্বোচ্চপদে আসীন হবার পরই তিনি এই কুপ্রথা দূর করতে সচেষ্ট হন। ফলে তাঁকে দক্ষিণাঞ্চলের উপনিবেশগুলোর প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।

লিঙ্কন রাষ্ট্রপতি পদগ্রহণের বছরেই দক্ষিণের ছয়টি রাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ ক'রে আলাদা আর এক স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল। কিছুদিন বাদে আরও চারটি রাজ্য নবগঠিত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যোগ দেওয়ায় আমেরিকার স্বাধীন অখণ্ড সত্তা বিপন্ন হবার উপক্রম হ'ল। এই পরিস্থিতিতে শুরু হ'ল উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ। আব্রাহাম লিঙ্কন অদম্য মনোবল ও অসাধারণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাত্র তিনটি উপনিবেশের

সাহায্যে যুদ্ধ পরিচালনা ক'রে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়লাভ করলেন। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা বজায় রাখা সম্ভব হ'ল। এই গৃহযুদ্ধে লিংকনের সাফল্য অর্জন করা ছিল আমেরিকার ইতিহাসে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধে লিংকন পরাজিত হ'লে একদিকে যেমন ক্রীতদাস প্রথার অবসান ঘটতনা, তেমনি অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বও বিপন্ন হত। সুতরাং বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মূলে আব্রাহাম লিংকনের অবদান কম নয়। এই গৃহ-যুদ্ধের ভগ্নস্তূপের ভিতর থেকে জন্ম নেয় নতুন এক আমেরিকা যা উত্তরোত্তর দৃঢ় পদক্ষেপে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করে অব্যাহত গতিতে। মার্কিন গৃহযুদ্ধের সময় আলাবামা নামে এক ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ দক্ষিণের সাহায্য করায় ইংলণ্ডের সাথে লিংকনের বিরোধ উপস্থিত হয়। এই ঘটনা জেনেভার আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উত্থাপিত হলে ইংলণ্ড আমেরিকাকে ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হয়। গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটার সাথে সাথে লিংকনের জীবনেরও অবসান ঘনিয়ে আসছিল। গৃহযুদ্ধ শেষ হবার মাত্র পাঁচদিন পর থিয়েটার দেখবার সময় জন উইল্কিস্ বুথ্ নামক দক্ষিণী সমর্থক এক অভিনেতার গুলিতে লিংকনের মহান জীবনের অবসান ঘটে (১৮৬৫)।

লিংকন মাত্র কয়েক বছর রাষ্ট্রপতি থাকার সুযোগ পান। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমেরিকা তথা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর কার্যাবলীর স্থায়ী প্রভাব রেখে যান। আমেরিকার ষোড়শ রাষ্ট্রপতি লিংকন ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একজন মস্ত বড় মানবতাবাদী। তিনি বলেছেন, 'ক্রীতদাস প্রথা যদি অন্যায় না হয়, তবে পৃথিবীতে অন্যায় বলে কিছুই নেই।' তিনি আরও বলেছেন, 'কারও প্রতি বিদ্বেষভাব নয়, সকলের প্রতিই দেখাতে হবে বদান্যতা।' 'গভর্ণমেণ্ট অব্ দি পিপ্‌ল্, ফর দি পিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড বাই দি পিপ্‌ল্'…গণতন্ত্রের এই অত্যন্ত জনপ্রিয় সংজ্ঞা তো তাঁরই প্রদত্ত।



লিটন

[শাসনকাল ১৮৭৬-১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ]

ব্রিটিশ ভারতের একজন সাম্রাজ্যবাদী ভাইসরয় ছিলেন। এদেশে লর্ড লিটনের শাসনকাল ১৮৭৬ থেকে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। লর্ড লিটন ছিলেন

ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী এবং রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন। ভারতবাসীর প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল বিদ্বেষপূর্ণ। তিনি ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের সমর্থক এবং বিশিষ্ট রক্ষণশীল নেতা ডিজরেলীর ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। লিটন শাসনভার গ্রহণ করার কিছুকাল পর পার্লামেণ্টের আইনবলে মহারানী ভিক্টোরিয়া 'ভারতসম্রাজ্ঞী' উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দরবারে ভারতীয় রাজগণ আইনের চোখে ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীন হয়ে পড়েন। ঠিক এই সময় দক্ষিণ ভারতে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লর্ড লিটন দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে একটি 'ফেমিন কমিশন' গঠন করেন। তাঁর ভারত-বিরোধী বাণিজ্য নীতির ফলে স্বদেশের কুটির শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ম্যাঞ্চেস্টারের কলগুলোতে নির্মিত দ্রব্যে ভারতের বাজার ছেয়ে যায়। তিনি ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোর সরকারী সমালোচনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কুখ্যাত 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' প্রণয়ন করলে ভারতবাসী রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়। নতুন আইনের আওতা থেকে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে এইসময় থেকে অমৃতবাজার পত্রিকা বাংলাভাষার পরিবর্তে ইংরেজীতে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এছাড়া লিটন 'আর্মস অ্যাক্ট' প্রবর্তন করে ভারতবাসীর সরকারী অনুমতি ছাড়া অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করে দেন। এইসব আইন প্রবর্তন করে লিটন ভারতবাসীর মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করেন।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে লিটন সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরিচয় দেন এবং দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন। যুদ্ধে আফগানরা পরাজিত হলে ইয়াকুব খানের সাথে তিনি গণ্ডামাকের সন্ধিস্থাপন করেন। আফগানিস্থানে রুশ প্রভাব বিনষ্ট করাই এই যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল। কাবুলে স্থায়ীভাবে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট নিয়োগের ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু লিটনের আফগান নীতি সফল হয়নি কারণ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দুর্ধর্ষ আফগান জাতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ও বেশ কিছু ইংরাজকে হত্যা করে। লিটন পুনরায় আফগানিস্থান আক্রমণ করেন কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার আগেই ইংলণ্ডের নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটলে পদত্যাগে বাধ্য হন (১৮৮০ খ্রী)।



লিনলিথগো

[শাসনকাল ১৯৩৬-১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ]

বিংশ শতাব্দীর একজন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্। লিনলিথগো ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় ছিলেন। ১৯২৬-২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি কৃষি-সংক্রান্ত বিষয়ে রয়াল কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে ভারতবর্ষের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষের ভাইসরয় পদে লর্ড উইলিংডনের স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর ভারত শাসনকালেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ভাইসরয় হিসাবে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা না করেই ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে ভারতবাসী তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমস্ত দেশে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন ('ভারত ছাড় আন্দোলন') শুরু হয়। লিনলিথগো এই আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে বহু রাজনৈতিক নেতাকে জেলে বন্দী করেন এবং বলপ্রয়োগ ও অত্যাচারের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করার চেষ্টা চালান। পরের বছরই ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এই পর্বের এক স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লর্ড লিনলিথগো'র জীবনাবসান হয়।

লুই ষষ্ঠ

[শাসনকাল ১১০৮-১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দ]

ফ্রান্সের ক্যাপেসীয় বংশের একজন রাজা ছিলেন। ষষ্ঠ লুই ১১০৮ খৃষ্টাব্দে পিতা প্রথম ফিলিপের পরবর্তী শাসক হিসাবে সিংহাসনে বসেন এবং ১১৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব চালান। তাঁর পিতার রাজত্বকালের শেষ দিকে সামন্ত প্রভুদের বিদ্রোহের ফলে সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। প্রথম ফিলিপ এই অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত

হওয়ায় এক সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে ষষ্ঠ লুইকে সিংহাসনে আরোহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি দৃঢ় মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই বিদ্রোহী ব্যারণদের দমন করে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। কঠোর হস্তে শাসনকার্য পরিচালনা করে তিনি সম্রাটের শক্তি ও পদমর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করেন। অতঃপর তিনি সামরিক অভিযান পরিচালনা করে ফ্রান্সের রাজ্যসীমা আরও বিস্তৃত করেন। উনত্রিশ বছর রাজত্ব করার পর ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ লুইয়ের জীবনাবসান হয়।

লুই সপ্তম

[শাসনকাল ১১৩৭-১১৮০ খ্রীষ্টাব্দ]

ফ্রান্সের ক্যাপেসীয় বংশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন পূর্ববর্তী শাসক ষষ্ঠ লুইয়ের পুত্র। সপ্তম লুই ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সুদীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। শাসক হিসাবে তিনি যে খুব যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন তা বলা যায়না। সপ্তম লুই ছিলেন অতিরিক্ত মাত্রায় ধর্মপ্রাণ ও খেয়ালী। তিনি রাজকর্ম পরিত্যাগ করে ক্রুসেডে যোগদান করেন এবং এইভাবে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তাঁর অনুপস্থিতির ফলে সরকারী প্রশাসন শিথিল হয়ে পড়ে ও সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তিনি তাঁর রাণী অ্যাকুই-টেইনের ইলিনরের সাথে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে আর এক কূটনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন এবং এর ফলস্বরূপ তাঁকে সমগ্র অ্যাকুইটেইন প্রদেশটি হারাতে হয়। তাঁর রাজত্বকালে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরী ফ্রান্স আক্রমণ করেন এবং ফ্রান্সের অনেকগুলি অঞ্চল জয় করে নেন। তিনি হৃত এলাকাগুলি ফিরে পাবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় হেনরীকে এক গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সিংহাসনচ্যুত করার পরিকল্পনা চালান। কিন্তু তাঁর এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম লুই মারা যান।

লুই অষ্টম

[শাসনকাল ১২২৩-১২২৬ খ্রীষ্টাব্দ]

ফ্রান্সের ক্যাপেসীয় বংশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাসের পরবর্তী শাসক হিসাবে সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র তিন বছর রাজত্ব করেন। তাঁর স্বল্পকাল স্থায়ী রাজত্বের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি। পিতা ফিলিপের সুযোগ্যপুত্র কোনোমতেই তাঁকে বলা চলে না। অষ্টম লুই একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আমলে

'হেরেটিক'গণ (প্রচলিত ধর্মমতে অবিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ প্রচণ্ডরকম বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠলে অষ্টম লুই কঠোর হস্তে সে বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি সাম্রাজ্য পরিচালনায় তাঁর পিতাকে অনুসরণের চেষ্টা করতেন। কিন্তু পিতার প্রতিভার অধিকারী তিনি ছিলেন না। তিনি তাঁর সাম্রাজ্য পুত্রদের মধ্যে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এক এক অংশের উপর এক একজনকে শাসনভার অর্পণ করেন। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটা ছিল এক ভ্রান্ত পদক্ষেপ। সেইসময় তাঁর উচিৎ ছিল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ও আভ্যন্তরীণ ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করা কিন্তু তা না করে সাম্রাজ্য বিভাগের মাধ্যমে তিনি একে দুর্বল করে ফেলেন। মাত্র তিন বছর রাজত্ব করার পর ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম লুইয়ের বৈচিত্র্যহীন শাসনের অবসান ঘটে।



লুই চতুর্দ্দশ

[শাসনকাল ১৬৪৩-১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ]

ফ্রান্সের বুর্বোঁ বংশের একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নাবালক অবস্থায় তিনি ফরাসী রাজসিংহাসনে বসেন। এই সময় কার্ডিনাল ম্যাজারিন তাঁর হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে কার্ডিনালের মৃত্যু হলে লুই স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় আসীন থাকেন। বহুগুণের অধিকারী চতুর্দশ লুই ছিলেন একজন ব্যক্তিত্ববান, দৃঢ়চেতা ও প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট। তাঁর সময়ে রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতা চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছিল। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও দক্ষ শাসক। শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতি জীবনের বিভিন্নদিকের প্রতি তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। চতুর্দশ লুইয়ের আভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর স্মরণীয় উক্তি 'আমিই রাষ্ট্র' কথাটি মনে পড়ে যায়। তিনি শাসনব্যবস্থার সর্ববিভাগকে স্বীয় হস্তগত করে এক চরম কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি তাঁর শাসন কর্তৃত্ব যাতে কোনো ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী মন্ত্রী কিংবা আইনগত বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সংকুচিত না হয় সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন। তিনি তাঁর মন্ত্রিদের সামান্য কর্মচারীর মত বিবেচনা করতেন যাদের একমাত্র কাজ ছিল তাঁর হুকুম তামিল

করা। লর্ড অ্যাক্টন তাঁকে আধুনিক বিশ্বের একজন অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন সম্রাট বলে অভিহিত করেছেন। সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজনীতিতে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। চতুর্দশ লুইয়ের বহুমুখী প্রতিভা, অসাধারণ কর্মক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি 'গ্র্যান্ড মনার্ক' আখ্যালাভ করেন। তাঁর আমলে ফ্রান্স সামরিক দিক থেকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং প্যারিস হয়ে উঠেছিল ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। চতুর্দশ লুইয়ের আমলে স্টেটস জেনারেল বা জাতীয় সভার অস্তিত্ব ছিলনা এবং রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন। প্রজাসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করে এবং ক্রমাগত বৈদেশিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে রাজকোষ শূন্য করে ফেলে চতুর্দশ লুই তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্য এক অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থা রেখে যান। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের জন্য তাই চতুর্দশ লুইয়ের দায়িত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না।

লুই পঞ্চদশ

[শাসনকাল ১৭১৫-১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের বুর্বোঁ বংশীয় সম্রাট ছিলেন। তিনি চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যুর পর ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পঞ্চদশ লুই ছিলেন অলস, উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়পরায়ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অকর্মণ্য। তাঁর পূর্ববর্তী রাজা চতুর্দশ লুইয়ের আমলে ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকার ফলে ফ্রান্সের রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে এসেছিল এবং ফরাসী রাজতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছিল। জনসাধারণের মধ্যেও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। পঞ্চদশ লুই ফরাসী রাজতন্ত্রের দুর্বলতা উপলব্ধি করেও এর প্রতিকারের কোনো প্রচেষ্টা চালাননি। বরং তিনি রাজকার্যে অত্যন্ত অবহেলা দেখাতেন। ফলস্বরূপ অভিজাতশ্রেণী এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং তারাই দেশের প্রকৃত শাসক হয়ে বসে। পররাষ্ট্রনীতির পরিচালনায়ও চতুর্দশ লুই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন। তিনি অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষের যুদ্ধে চিরশত্রু ইংলন্ডের নিকট পরাজয় বরণ করে দেশবাসীর চোখে নিজের মর্যাদাহানি ঘটান। ফরাসী অধিকৃত বহু স্থানও ইংরেজদের হাতে চলে যায়। দেশের পরিস্থিতি যে দিন দিন চরম অবনতির দিকে যাচ্ছে একথা দুর্বল পঞ্চদশ লুই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরে মন্তব্য করেন যে তাঁর মৃত্যুর পরই মহাপ্রলয় ঘটবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। সুদীর্ঘকাল সিংহাসনে আসীন থাকার পর ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে পঞ্চদশ লুই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।



লুই ষোড়শ

[শাসনকাল ১৭৭৪-১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ]

ফ্রান্সের বুর্বোঁ বংশীয় সম্রাট ছিলেন। পঞ্চদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর তিনি ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন (১৭৭৪) এবং পনের বছর রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার কয়েক বছর পর গিলোটিনে প্রাণ বিসর্জন দেন (১৭৯৩)। সম্পর্কে ষোড়শ লুই ছিলেন পঞ্চদশ লুইয়ের পৌত্র। ষোড়শ লুই কুড়ি বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, অমায়িক, দয়ালু এবং নির্বিরোধী ভাল মানুষ। শাসনকার্য পরিচালনা করার মত মানসিক দৃঢ়তা বা ব্যক্তিত্বের প্রাখর্য তাঁর ছিল না। উপরন্তু তিনি ছিলেন রাজ্যশাসন বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও উৎসাহহীন। ষোড়শ লুইয়ের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হল তিনি ফ্রান্সের ইতিহাসের এক চরম সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে রাজা হন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে একজন বিপ্লবপন্থী তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, "রাজার নিজের কোনো স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি না থাকার দরুণ কেউ তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করতে পারে না।" ফ্রান্সের এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে এমন একজন অপদার্থ রাজা দেশের কর্ণধার হলে যা পরিণতি ঘটার কথা ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে তাই ঘটল। প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ লুই রাজকার্য পরিচালনা অপেক্ষা সাধারণ ছোটখাটো কাজকর্ম করতেই বেশি ভালবাসতেন। ষোড়শ লুই স্বাধীনভাবে রাজকার্য পরিচালনায় অক্ষম হওয়ায় তাঁর রানী মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন। রানী বিলাস-ব্যসনে অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। এদিকে ষোড়শ লুই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে রাজকোষ প্রায় শূন্য করে ফেলেন। প্রায় দেউলিয়া অবস্থা নিয়ে রাজ্যশাসন অসম্ভব হয়ে পড়ায় ষোড়শ লুই টুর্গো নামক এক ব্যক্তিকে তাঁর রাজস্বমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। টুর্গোর পরিকল্পনাগুলো অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থবিরোধী হওয়ায় তাদের চাপে পড়ে ষোড়শ লুই টুর্গোকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হন। এর পর একে একে নেকার ও ক্যালোনকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু অভিজাতদের বিরাগভাজন হওয়ায় উভয়কেই

স্বল্পকালের মধ্যে শাসনকার্য থেকে বিদায় নিতে হয়। এরপর ষোড়শ লুই ব্রিয়াঁকে অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ব্রিয়াঁর পরামর্শমত ষোড়শ লুই স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহবান করলে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। বিপ্লব চলাকালীন ষোড়শ লুই প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে সপরিবারে পলায়ন করতে গিয়ে ভেরেন্নে শহরে ধৃত হন। নতুন প্রজাতান্ত্রিক সরকার ষোড়শ লুই ও রানী আঁতোয়ানেতের বিচার করে প্রাণদণ্ড বিধান করে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী শান্তচিত্তে ষোড়শ লুই গিলোটিনে প্রাণ বিসর্জন দেন। ষোড়শ লুইয়ের পতনের সাথে সথে ফ্রান্সের ইতিহাসে সাময়িকভাবে রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষিত হয়।

লুই অষ্টাদশ

[শাসনকাল ১৮১৪-১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের বুর্বোঁ বংশীয় রাজা ছিলেন। তিনি নেপোলিয়নের পতনের পর 'ন্যায্য অধিকার নীতি' অনুযায়ী ১৮১৪ খ্রীঃ ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে বুর্বোঁ বংশের শাসনের অবসান ঘটেছিল। নেপোলিয়নের পতনের ফলে দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর পুনরায় বুর্বোঁ বংশ শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসে। অষ্টাদশ লুই ছিলেন ষোড়শ লুইয়ের ভ্রাতা। তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে উদার ভাবধারা বজায় রেখে রাজত্ব চালাবার পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য রাজত্বকালের শেষ দিকে ডিউক-ডি-বেরির হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হয়ে তিনি কিছুটা স্বৈরাচারী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। অষ্টাদশ লুই নিজের রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলার প্রয়াসী ছিলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের সময় তিনি দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে বহু দুঃখ ভোগ করেন। তিনি মন্তব্য করেন, 'সিংহাসনের চেয়ে সুখকর বস্তু আর কিছু নেই, একে হারিয়ে আবার নির্বাসিত হতে রাজী নই।' দশ বছর রাজত্ব করার পর ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাদশ লুই মৃত্যুমুখে পতিত হন।



লুই ফিলিপ্পি

[শাসনকাল ১৮৩০-১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ]

১৮৩০ খ্রীঃ জুলাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে বুর্বোঁ শাসনের অবসান ঘটায় অর্লিয়েন্স বংশের লুই ফিলিপ্পি ফরাসী সিংহাসন লাভ করেন। শাসক হিসাবে লুই ফিলিপ্পি বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি যে সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে ফরাসী রাষ্ট্রের কর্ণধার হন সেই পরিস্থিতি দৃঢ়হাতে সামাল দেবার মত যোগ্যতা তাঁর ছিল না। সেই সময় ফ্রান্সে কয়েকটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ছিল। প্রজাতন্ত্রবাদীদের লক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আর বোনাপার্টিস্ট দল তাঁর দুর্বল বৈদেশিক নীতির জন্য তাঁর পদত্যাগ দাবি করে। অন্যান্য দলগুলোও তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবি দাওয়া ও অভিযোগ তুলে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টা করে। সমাজতন্ত্রীদল শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে নতুন আইন প্রণয়নের দাবি জানায়। কিন্তু লুই ফিলিপ্পি শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সর্বত্র ভোটাধিকার সম্প্রসারণ করার দাবিতে এক ব্যাপক গণ আন্দোলন হয়। ফিলিপ্পি প্রধানমন্ত্রী গিজোর পরামর্শমত চলতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনেন। গিজো সকল প্রকার শাসন সংস্কারের বিরোধিতা করলে ফরাসী জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এক ব্যাপক গণ-বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে লুই ফিলিপ্পির শাসনের অবসান ঘটে।



লেনিন

[শাসনকাল ১৯১৭-১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ]

বর্তমান শতাব্দীর সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী নেতা, চিন্তানায়ক ও মানবতাবাদী এই অসাধারণ মানুষটি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার অন্তর্গত সিমবিরস্ক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত অল্পবয়সেই তাঁর মধ্যে বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত হয় এবং বিপ্লবী কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য ছাত্রাবস্থায়ই তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়। তাঁর আসল নাম ছিল ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ। বিপ্লবী কাজকর্মের সুবিধার জন্য তিনি পরবর্তীকালে 'লেনিন' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন এবং সমগ্র বিশ্বে ঐ নামেই পরিচিত হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবার অভিযোগে লেনিনের বড় ভাই আলেকজান্ডারকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দাদার মৃত্যু সতের বছর বয়স্ক লেনিনের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। পরে তিনি আইন নিয়ে অধ্যয়ন করেন এবং কার্ল মার্ক্সের লেখা গ্রন্থাদি পাঠ করতে শুরু করেন। ক্রমশঃ তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে একমাত্র মার্ক্স নির্দেশিত সাম্যবাদী রাষ্ট্র-গঠনের মধ্য দিয়েই নিপীড়িত রুশ জনগণের প্রকৃত মুক্তি আসতে পারে। সেণ্ট পিটার্সবার্গ নামক স্থানে লেনিনের বিপ্লবী কর্মতৎপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলে জার সরকারের রোষানলে পড়ে তাঁকে সুদূর সাইবেরিয়ায় তিন বছরের জন্য নির্বাসিত হতে হয়। সাইবেরিয়া থেকে মুক্তিলাভ করার পর লেনিন গোপনে বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরদার তোলার করে কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রুশ সোসালিস্ট ডেমোক্রেটিক দলের এক অধিবেশনে লেনিন প্রলেতারিয় জনগণের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কথা বলেন। এই সময় তিনি একটি মার্ক্সবাদী দল গঠনে সক্ষম হন যা 'বলশেভিক দল' নামে পরিচিত হয়। লেনিন উপলব্ধি করেন যে রাশিয়ায় বিপ্লব সফল ও সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে চাই সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব এবং তাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য প্রয়োজন এক সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের। এই উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কয়েকটি পুস্তকও রচনা করেন। দীর্ঘকাল প্রবাসে কাটিয়ে লেনিন রুশ বিপ্লবের পথ প্রস্তত

করেন ও এক নতুন সাম্যবাদী সমাজগঠনের জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেন। বিপ্লবের ফলে জারতন্ত্রের পতন হ'লে লেনিন রাশিয়ায় ফিরে আসেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জারতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং কেরেনস্কীর নেতৃত্বে এক অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। কিন্তু এই সরকার জনগণের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় ৭ই নভেম্বর লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল রুশ দেশের ভাগ্যনিয়ন্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ৭ই নভেম্বরের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকশ্রেণী লেনিনের নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। নতুন সরকারের প্রথম কাজ হ'ল ধণিকশ্রেণী পরিচালিত সৈন্যদলকে খারিজ ক'রে বিপ্লবী লাল ফৌজ গঠন। বিপ্লবী সরকার দেশের যাবতীয় ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ, কলকারখানাগুলোকে শ্রমিকশ্রেণীর অধীনে আনয়ন এবং জনগণের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের সুষম বণ্টন প্রভৃতি ব্যবস্থা করে। কেরেনস্কী সরকারের সময়ে গঠিত কন্‌স্টিট্যুয়েণ্ট এ্যাসেম্বলী ভেঙ্গে দিয়ে লেনিন রাশিয়ায় সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। রুশ বিপ্লবের সাফল্যে আতঙ্কিত হয়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো এই নব প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন ঘটাতে সচেষ্ট হয়। শুরু হয় রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ। জারের সমর্থকরাও এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগায়। ফলে দেশ এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয় যা ১৯১৮ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। একদিকে তীব্র খাদ্যাভাব আর একদিকে বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ শত্রুর সম্মিলিত আক্রমণে বলশেভিক সরকার চরম প্রতিকূলতার সামনে পড়ে। কিন্তু লেনিনের সুযোগ্য নেতৃত্ব, রুশ জনগণের অনমনীয় মনোভাব ও লাল ফৌজের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধে বিরোধী শক্তিগুলো শেষ পর্যন্ত মস্তক অবনত করতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা থেমে যাবার পর লেনিন নতুন অর্থনৈতিক নীতি বা 'নেপ' গ্রহণ করলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটল এবং এই সঙ্ঘের মাধ্যমে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদী ভাবধারার প্রসার এবং সাম্যবাদী দলের জয়লাভ সম্ভব হ'ল। মূলতঃ লেনিনের প্রয়াসের ফলস্বরূপ পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন সম্ভব হয়েছে। বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের কাছে রুশ বিপ্লব এক নতুন আশার বাণী বহন করে আনল। অপরপক্ষে পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো লেনিন প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক সরকারের সাফল্যে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৯২৩ সালে লেনিন সোভিয়েতের প্রথম সংবিধান রচনা করেন। এই সংবিধানে কৃষক ও শ্রমিকেরই ভোটাধিকার ছিল। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই লেনিন ব্রেস্ট্ লিটভস্ক-এর সন্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক যুদ্ধের অবসান

ঘটান। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের বহু রাষ্ট্রই সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতিদান করে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ৫৪ বছর বয়সে বিশ্বের সর্বকালের ইতিহাসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমী রাষ্ট্রনায়ক ভ্যাদিমির ইলিচ 'লেনিন'-এর জীবনাবসান হয়।

লোথার

[শাসনকাল ৯৫৪-৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ]

ফ্রান্সের একজন রাজা ছিলেন। ৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতা চতুর্থ লুইয়ের মৃত্যুর পর লোথার মাত্র আট বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। সাবালক হবার পর শাসক হিসাবে তিনি তাঁর যোগ্যতার পরিচয় রাখেন। লোথার একজন সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয় সম্রাট ছিলেন। কিন্তু তাঁর দূরদর্শিতার অভাব ছিল বলে মনে হয়। দেশের যাজক সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিলনা। জার্মানীর অন্তর্গত লোথারিঞ্জিয়া প্রদেশের অধিকারের দাবি নিয়ে তিনি জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ফ্রান্সের ক্যাপেসীয় বংশের হিউ ক্যার্পেটের ফরাসী রাজসিংহাসনের দিকে যথেষ্ট নজর ছিল। তিনি এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে জার্মানরাজ তৃতীয় অটোর সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সম্মিলিতভাবে লোথারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। লোথার এই সংকটময় মুহূর্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (৯৮৬ খ্রী:)।

ল্যান্সডাউন

[শাসনকাল ১৮৮৮-১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় ছিলেন। লর্ড ল্যান্সডাউন লর্ড ডাফরিনের পরবর্তী শাসক হিসাবে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কার্যভার গ্রহণ করেন। মার্কুইস অব্ ল্যান্সডাউন একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক ছিলেন এবং যে কোনো উপায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটানো তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাঁর সময়ে সিকিম, আসাম, মনিপুর, ব্রহ্মদেশ, কাশ্মীর, গিলগিট প্রভৃতি স্থানে ইংরাজ প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

লর্ড ল্যান্সডাউন মর্টিমার ডুরাণ্ডের সাহায্যে আফগানিস্থান ও ভারতের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করেন যা 'ডুরাণ্ড লাইন' নামে পরিচিত। তিনি 'ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ট্রুপস' নামে এক নতুন সেনাবাহিনীর সৃষ্টি করে ইংরেজের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করেন। তাঁর আমলে বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট' (১৮৯২) ও 'ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট' প্রণীত হয়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লর্ড ল্যান্সডাউনের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়।

শঙ্করবর্মন

[শাসনকাল সপ্তম শতাব্দী]

সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীরের উৎপল বংশীয় রাজা ছিলেন। শংকরবর্মন যুদ্ধের মাধ্যমে কাশ্মীর অঞ্চলে উৎপল সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন। কনৌজের রাজা প্রথম ভোজের সাথে এক যুদ্ধে তিনি লিপ্ত হন এবং গুর্জরদের কাছ থেকে পাঞ্জাবের অংশ-বিশেষ ছিনিয়ে নিয়ে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। শংকরবর্মন একজন অত্যাচারী শাসক ছিলেন এবং প্রজারা করভারে অত্যন্ত পীড়িত হত। উরসগণের বিরুদ্ধে এক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

শম্ভুজী

[শাসনকাল ১৬৮০-১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দ]

মারাঠাবীর ছত্রপতি শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী পিতার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রের রাজা হন (১৬৮০ খৃঃ)। তিনি ছিলেন পিতার অযোগ্য পুত্র। পিতার গুণাবলীর কোনোটিই তাঁর চরিত্রে লক্ষ্য করা যায় না। শম্ভুজী ছিলেন দুর্বল ও অদূরদর্শী শাসক। শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। ফলে তাঁর আমলে মহারাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে। শিবাজীর মৃত্যুর পর শম্ভুজীর রাজত্বকালে ঔরঙ্গজেব সসৈন্যে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে অভিযান চালান। তিনি প্রথমে দাক্ষিণাত্যের শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত দুই মুসলিম রাজ্য গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর জয় করেন। শম্ভুজী বিচক্ষণতার অভাববশত বিজাপুর-গোলকুণ্ডার বিপদ দেখেও কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তিনি আত্মরক্ষার জন্য কোনো উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা না করে মস্ত ভুল করেন। ফলে তাঁকে শেষ পর্যন্ত মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয় (১৬৮৯ । এইভাবে শম্ভুজীর নয় বছর স্থায়ী দুর্বল শাসনের অবসান ঘটে।

শশাঙ্ক

[শাসনকাল ৬০৬-৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে রাজা শশাঙ্ক অতি উচ্চস্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলা এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়েছিল এবং উত্তর ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

শশাঙ্কের প্রথম জীবন সম্পর্কে বেশী কিছু জানা যায় না। কি পরিস্থিতির মধ্যে তিনি গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন তা আজও অজ্ঞাত। হিউয়েন সাঙের বিবরণ,

বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত, বৌদ্ধগ্রন্থ আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প এবং কিছু কিছু মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে শশাঙ্কের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়।

শশাঙ্ক শুধুমাত্র বঙ্গাধিপতি হিসাবেই আত্মতুষ্ট থাকতে চাননি। তিনি দক্ষিণের রাজ্যগুলির দিকে দৃষ্টি দেন এবং প্রথমে উৎকল ও কঙ্গদা জয় করেন। দক্ষিণদিকে শশাঙ্কের সাম্রাজ্যসীমা চিল্কাহ্রদ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

শশাঙ্কের পশ্চিমাঞ্চল অভিমুখে অভিযানই সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমদিকে অভিযান চালিয়ে শশাঙ্ক প্রথমে মগধ জয় করেন এবং ক্রমশঃ বারানসী পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি মালবের রাজা দেবগুপ্তের সহায়তায় কনৌজ আক্রমণ করেন এবং মৌখারি রাজা গ্রহবর্মাকে পরাস্ত করে কনৌজ দখল করে নেন। শশাঙ্কের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলেন থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের রাজা হর্ষবর্ধন। কিন্তু এই দুই প্রতিপক্ষ কখনও সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়েছিলেন কিনা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। বৌদ্ধগ্রন্থে হর্ষকে শশাঙ্কবিজয়ী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থের বক্তব্য নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া কঠিন। যদি শশাঙ্ক হর্ষের কাছে পরাজয় স্বীকার করে থাকেন, তাহলেও এই পরাজয় তাঁর ক্ষমতা বা প্রভাবকে বিশেষ খর্ব করতে পারেনি। শশাঙ্ক আমৃত্যু তাঁর সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে রাজত্ব চালিয়ে গেছেন। শুধুমাত্র শশাঙ্কের মৃত্যুর পরেই হর্ষ বঙ্গের রাজধানী গৌড় জয় করতে সমর্থ হন।

শশাঙ্ক শৈবধর্মের অনুরাগী ছিলেন। শশাঙ্কের চরিত্র ও তাঁর রাজত্বের যথাযথ মূল্যায়ন করার মত পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায় নি। তবে তিনি যে খুব সামান্য অবস্থা থেকে নিজ যোগ্যতাবলে বঙ্গে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত। তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরবর্তীকালে বাংলার পাল রাজাদের পথ প্রদর্শন করেছিল। পালযুগে যে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার ভিত্তি-প্রস্তর শশাঙ্কের আমলেই রচিত হয়েছিল বলা চলে। শশাঙ্ক ৬০৬ থেকে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

শামসউদ্দিন আহমদ

[শাসনকাল ১৪৩১-১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দ]

জালালউদ্দিন মহম্মদের (যদু সেন) মৃত্যুর পর রাজা গণেশ প্রতিষ্ঠিত বংশের শেষ সুলতান শামসউদ্দিন আহমদ ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন চরিত্রহীন, অপদার্থ শাসক। তাঁর রাজত্বকাল ছিল বাংলার পক্ষে এক অন্ধকারময় পর্ব। জনসাধারণ তাঁর কুশাসনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং রাজদরবারে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত দানা বাঁধতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত একদল প্রভাবশালী অভিজাত

শামসউদ্দিনের দুই ঘনিষ্ঠ ক্রীতদাস সাদী খান ও নাসীর খানের সাহায্যে তাঁকে হত্যা করেন। তিনি মোট এগার বছর রাজত্ব করেন। ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে শামসউদ্দিন আহমদের মৃত্যুর সাথে সাথে বাংলায় গণেশ প্রতিষ্ঠিত বংশের শাসনের অবসান হয়।

শামসউদ্দিন ইউসুফ

[শাসনকাল ১৪৭৪-১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের একজন সুলতান শামসউদ্দিন ইউসুফ পিতা রুকনউদ্দিন বরবক শাহের মৃত্যুর পর ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরিস্তা এবং নিজামউদ্দিন তাঁকে অত্যন্ত পণ্ডিত, ধর্মপ্রাণ ও দক্ষ শাসক হিসাবে অভিহিত করেছেন। একজন ন্যায় বিচারক হিসাবে প্রজাসাধারণের নিকট তিনি খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন। সুলতান আলাউদ্দিনের মত তিনি মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেন এবং জটিল বিষয়গুলোর নিষ্পত্তিকরণে প্রায়শঃই বিচারকদের সাহায্য করতেন। পাণ্ডুয়ায় মসজিদগাত্রে প্রাপ্ত লিপি থেকে জানা যায় তিনি দক্ষিণ পশ্চিম দিকে (সম্ভবতঃ উড়িষ্যা) রাজ্যসীমা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সমরাভিযান প্রেরণ করেছিলেন। সাত বছর রাজত্ব করার পর সম্ভবতঃ ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে শামসউদ্দিন ইউসুফ পরলোকগমন করেন।

শামসউদ্দিন মুজফফর

[শাসনকাল ১৪৯১-১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে বাংলার একজন হাবসী শাসক ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী বালক-রাজা নাসিরউদ্দিন মামুদ দ্বিতীয়কে হত্যা করে ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মসনদ দখল করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি শামসউদ্দিন মুজফফর নাম ধারণ করেন এবং একটি স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করে তাঁর রাজত্বকালের সূচনা করেন। শামসউদ্দিনের রাজত্বকালে হাবসী শাসন কুখ্যাতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল। সিংহাসনে বসেই তিনি দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করে দেন। সব বিরোধী শক্তিকে চূর্ণ করার অভিপ্রায়ে তিনি রাজধানী থেকে অভিজাত সম্প্রদায় ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের নির্মমভাবে উচ্ছেদের প্রয়াস চালান। হিন্দু জমিদার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের প্রতিও নির্দয় আচরণ করা হয়। অতিরিক্ত অর্থলালসার বশবর্তী হয়ে তিনি খাজনার হার বাড়িয়ে দেন এবং বলপূর্বক দরিদ্র প্রজাদের কাছ থেকে তা আদায় করতে থাকেন। তিনি সৈনিকদের বেতনও কমিয়ে দেন। শামসউদ্দিনের স্বৈরাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এমনকি তাঁর বিশ্বস্ত উজীর সৈয়দ হুসেন পর্যন্ত বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দেন। ফলে

এইরকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁর পক্ষে অধিককাল রাজত্ব চালানো সম্ভব হয়নি। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শামসউদ্দিন মুজফফরের রাজত্ব স্থায়ী হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

শাহ আব্বাস

[শাসনকাল ১৫৮৭-১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ]

পারস্যের সাফাভী বংশের একজন বিখ্যাত সম্রাট শাহ আব্বাস ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুদীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর রাজকার্য পরিচালনা করেছিলেন। শাহ আব্বাস একজন ছিলেন শক্তিশালী সম্রাট। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। মোগলদের হাত থেকে কান্দাহার অধিকার তাঁর আমলের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কান্দাহারের ভৌগোলিক অবস্থান ও বাণিজ্যিক গুরুত্বের জন্য কান্দাহারের উপর শাহের নজর ছিল। তিনি কান্দাহার জয়ের জন্য কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি জাহাঙ্গীরের দরবারে চারবার প্রচুর উপঢৌকনসহ দূত প্রেরণ করেন। জাহাঙ্গীরের দূতও পারস্যে প্রেরিত হয়েছিল। শাহ আব্বাস দিল্লীর আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহার অধিকার করে নেন। শাহ আব্বাস ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

শাহ আলম প্রথম

[শাসনকাল ১৭০৭-১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ]

মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাট হিসাবে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম শাহ আলমের আসল নাম মুয়াজ্জম। তিনি ছিলেন ঔরঙ্গজেবের পুত্র। তিনি বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করে সম্রাট হন। প্রথম শাহ আলম নামেও তিনি ইতিহাসে পরিচিত। সিংহাসনে বসার সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় চৌষট্টি বছর। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে এক গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং এই গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়ে শাহ আলম সিংহাসন লাভ করেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ভাঙ্গনের সুযোগে রাজপুতরা যোধপুরের অজিত সিং এবং পাঞ্জাবে শিখরা বান্দার নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বাহাদুর শাহ ছিলেন পণ্ডিত, উদারহৃদয় ও নরম স্বভাবের মানুষ। শাসক হিসাবে তিনি বিশেষ দক্ষ বা শক্তিশালী ছিলেন না। তার উপর অত্যধিক বয়সে সিংহাসনে বসে বিশাল সাম্রাজ্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার মত সামর্থ তাঁর ছিল না। পাঁচ বছর রাজত্ব চালাবার পর ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে উনসত্তর বছর বয়সে শাহ আলম মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শাহ আলম দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৭৬০-১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বিতীয় আলমগীরের মৃত্যুর পর পরবর্তী মোগল সম্রাট হন দ্বিতীয় শাহ আলম। দ্বিতীয় আলমগীরের মৃত্যুর সময় তিনি বিহারে ছিলেন। দিল্লী তখন তাঁর শত্রু ইমদৎ-উল-মুলক এর নিয়ন্ত্রণে থাকায় এবং মারাঠাদের সাথে আহমদ শাহ আবদালীর দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চলার দরুণ বারো বছরেরও অধিককাল তাঁকে পিতৃপুরুষের সিংহাসন এবং রাজধানী ছেড়ে দূরে থাকতে হয়েছিল। সম্রাট শাহ আলম বিহারে থাকায় ১৭৬০ থেকে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসন প্রকৃতপক্ষে শূন্য পড়ে থাকে। এই সময় শাসনকার্য দেখাশোনা করতেন নাজিরউদ্দৌল্লা যিনি অনেকটা স্বৈরাচারী শাসকের মতই চলতেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ আলম বাংলার নবাব মীরকাশিম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সাথে মিলিত হয়ে ইংরেজ কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বকসারের প্রান্তরে এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁকে পরাজয় বরণ করে ইংরেজদের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্পণ করতে হয় (১৭৬৫)। অবশিষ্ট জীবন ইংরেজদের আশ্রিত ও তাদের বৃত্তিভোগী হিসাবে অতিবাহিত করার পর ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ আলম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শাহজাহান

[শাসনকাল ১৬২৮-১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ]

বিখ্যাত মোগল সম্রাট শাহজাহান পিতা জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ভারতে মোগলযুগের ইতিহাসের এক বিশেষ স্মরণীয় অধ্যায়। শাসনকালের প্রথমদিকে দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে খুব বড় আকারের দুর্ভিক্ষ এবং ঝুঝর সিং ও খাঁ জাহান লোদীর বিদ্রোহ ঘটা সত্ত্বেও শাহজাহানের রাজত্ব-কালের সার্বিক মূল্যায়ন করে ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ এই সময়টাকে মোগল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি ও সমৃদ্ধির কাল বলে অভিহিত করেছেন। মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, মোগল দরবারের আড়ম্বর-জাঁকজমক, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বিকাশ প্রভৃতি নানা দিক দিয়ে এই সময় মোগল যুগ সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এইসময় হিন্দুস্থানের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ প্রসারলাভ করেছিল এবং ভারতের পণ্যসামগ্রী রপ্তানীর মাধ্যমে রাজকোষ পরিপূর্ণ থাকত। এই সময় মোগল ভারত কোনো বৈদেশিক আক্রমণের শিকার হয়নি—শুধুমাত্র কান্দাহার মোগলদের হাতছাড়া হয়ে যায়। কান্দাহার ও মধ্য এশিয়ায়

মোগল সৈন্যের পরাজয় ঘটলেও সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে তার কোনো প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

শাহজাহান তাঁর পূর্বপুরুষের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় ক'রে দাক্ষিণাত্যে মোগল সামরিক বিজয় সম্পূর্ণ করেন। এ ছাড়াও তিনি বেশ কিছু স্থান জয় করে মোগল সাম্রাজ্যের সীমানা বর্দ্ধিত করেন। শাহজাহান পর্তুগীজদের অত্যাচারের হাত থেকে বাংলার জনসাধারণকে রক্ষা করেন। তিনি বাংলার সুবাদার কাশিম খাঁর নেতৃত্বে এক অভিযানপ্রেরণ করে চার হাজার পর্তুগীজ জলদস্যুকে বন্দী করেন। জলদস্যু দমন শাহজাহানের রাজত্বকালের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে আকবরের মত অতখানি উদার না হলেও ঔরঙ্গজেবের মত সংকীর্ণচিত্তও তিনি ছিলেন না এবং হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর জিজিয়া করও পুনরায় স্থাপন করেননি। শাহজাহান শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে উৎসাহী ছিলেন এবং সংস্কৃত ও হিন্দী কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পরাম্মুখ হননি। তাঁর আমলে হিন্দু রাজকর্মচারীর সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিলনা।

শাহজাহান আড়ম্বরপ্রিয় সম্রাট ছিলেন। তাঁর শাসনকালে মোগল স্থাপত্যশিল্পের চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এইসব শিল্পকলার মধ্যে পারসীক প্রভাব সুস্পষ্ট। শাহজাহানের নির্দেশে নির্মিত দিল্লী, আগ্রা, লাহোর, কাশ্মীর, আজমীর, আমেদাবাদ প্রভৃতি শহরের সুরম্য প্রাসাদ. দুর্গ, অট্টালিকা, মসজিদ ও উদ্যানগুলো আজও দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। সাহজাহান কর্তৃক নির্মিত আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরস্থিত খাসমহল শীশমহল, মোতি মহল,রঙমহল প্রভৃতি সৌধগুলি মোগল স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। এছাড়া দিল্লীর লালকেল্লার প্রাসাদ দুর্গের অভ্যন্তরস্থ দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, আগ্রার জাম-ই মসজিদ ও মতি মসজিদ শিল্পকলার অসাধারণ সাক্ষ্যবহন করছে। আর আগ্রায় যমুনার তীরে অবস্থিত তাজমহল হ'ল বিশ্বের এক অন্যতম আশ্চর্য সৃষ্টি। প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ বেগমের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করে তিনি এই বিশাল সমাধসৌধ নির্মাণ করেন। বিশ্বের দর্শনীয় বস্তুগুলোর মধ্যে তাজমহল নিঃসন্দেহে একটি। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ এই অসাধারণ স্মৃতিসৌধটি দর্শন করতে আসেন।

শাহজাহানের শেষ জীবন অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। পুত্র ঔরঙ্গজেব সিংহাসনলোভে তাঁকে দীর্ঘকাল আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে একটি কক্ষে বন্দী করে রাখেন এবং সেই অবস্থায় ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্ধসম্রাট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শাহজাহানের রাজত্বকালকে মোগল শাসনের মধ্যাহ্নকাল হিসাবে অভিহিত করা চলে।

শাহ মীজ।

[শাসনকাল ১৩২৯-১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দ]

চতুর্দশ শতকে কাশ্মীরের শাসক ছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি একজন ভাগ্যান্বেষী হিসাবে সোয়াট নামক স্থান থেকে ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরে আগমন করে সেখানকার হিন্দুরাজার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি ক্রমশঃ নিজ যোগ্যতাবলে ধাপে ধাপে ক্ষমতার উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করতে থাকেন। অতঃপর হিন্দু রাজার মৃত্যু হলে তিনি কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করে বসেন। তিনি শামসউদ্দিন শাহ নাম ধারণ করেন এবং স্বনামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করেন। তাঁর নামে খুতবা পাঠের নির্দেশও তিনি দেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন বেশ বিচক্ষণ ও সুচারুভাবেই রাজকার্য পরিচালনা করেছিলেন। সম্ভবত: ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহ মীর্জার মৃত্যু হয়।

শাহুজী

[শাসনকাল ১৭০৮-১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ]

শাহুজী ছিলেন শম্ভুজীর পুত্র। তিনি ছত্রপতি দ্বিতীয় শিবাজী নামধারণ করে ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। ঔরঙ্গজেবের আমলে শাহুজী মোগল কারাগারে বন্দী জীবন যাপন করেছিলেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আজম শাহ সম্রাট হয়ে শাহুজীকে কারামুক্ত করেন। এদিকে মহারাষ্ট্রের পূর্ববর্তী শাসক রাজারামের মৃত্যুর পর তারাবাঈ তাঁর নাবালক পুত্র তৃতীয় শিবাজীর রিজেন্ট হিসাবে রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। শাহু মোগল কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে মহারাষ্ট্রের সিংহাসন দাবি করলে মহারাষ্ট্রে এক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধের পরিণাম ভয়াবহ হত যদি না বালাজী বিশ্বনাথ নামক একজন শক্তিশালী ব্রাহ্মণ শাহুর পক্ষাবলম্বন করতেন। বালাজী বিশ্বনাথের সহায়তায় শাহু মহারাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতি হন। তবে শাহু ছিলেন দুর্বল ও অযোগ্য ব্যক্তি। ফলে শাসনকার্য পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথ গ্রহণ করেন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহুজী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।



শিবাজী

[শাসনকাল ১৬৭৪-১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ]

শাসক ও মানুষ হিসাবে ছত্রপতি শিবাজী ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুন্নারের কাছে শিবনের পার্বত্য দুর্গে এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, প্রতিভাবান ও বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষটির জন্ম হয়েছিল। শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে বিজাপুরের সুলতানের অধীনে চাকরী করতেন। বাল্যকালে জননী জিজাবাঈ ও দাদাজী খোন্দদেব নামক একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের কাছে ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যের বীরদের শৌর্যবীর্যের গল্প শুনে তিনি রীতিমত অনুপ্রাণিত বোধ করেন। বাস্তবিকই শিবাজীর চরিত্র ও ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে এই দুইজনের প্রভাব ছিল খুবই বেশি। ঊনিশ বছর বয়সের মধ্যেই শিবাজী এক সেনাদল গঠন ক'রে তোর্ণা নামক দুর্গ অধিকার ক'রে বসেন। তারপর একে একে অভিযান চালিয়ে তিনি বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত বেশ কয়েকটি স্থান অধিকার করে নেন। শিবাজী তাঁর নেতৃত্বে এক স্বাধীন, সার্বভৌম মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। বিজাপুরের বিখ্যাত সেনাপতি আফজল খাঁ শিবাজীকে দমন করতে গিয়ে নিজেই শিবাজীর হাতে প্রাণ দেন। তদানীন্তন মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবও শিবাজীকে দমনের উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শায়েস্তা খাঁকে প্রেরণ করেন। কিন্তু শিবাজীর সুকৌশলী অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত শায়েস্তা খাঁ কোনক্রমে প্রাণ হাতে ক'রে পলায়ন করেন। শিবাজী একের পর এক অভিয ন চালিয়ে দাক্ষিণাত্যের বহু এলাকা জয় করেন। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট বন্দর জয় ক'রে তিনি প্রচুর ধনদৌলতের অধিকারী হন। ঔরঙ্গজেব অতঃপর শিবাজীকে শায়েস্তা করার জন্য দিলির খাঁ ও জয়সিংহকে প্রেরণ করেন। মোগলরা পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করলে শিবাজী সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হন (১৬৬৫)। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী শিবাজীকে অনেকগুলি দুর্গ মোগলদের হস্তে সমর্পণ করতে হয়। ঔরঙ্গজেবের আমন্ত্রণে শিবাজী বাদশাহী দরবারে গমন করলে চতুর ঔরঙ্গজেব তাঁকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করে রাখেন। কিন্তু শিবাজী ফলের ঝুড়িতে আত্মগোপন ক'রে আগ্রা দুর্গের

বাইরে আসেন এবং ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শিবাজী পুনরায় মোগলদের শত্রুতাচরণ করতে থাকেন এবং মোঘল সেনাপতি দায়ুদ খাঁকে পরাজিত ক'রে দাক্ষিণাত্যের বহু স্থান জয় করেন। যে সব স্থান পুরন্দরের সন্ধি মারফৎ মোগলদের তিনি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন সেগুলোর অধিকাংশই তিনি পুনর্দখল করেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রায়গড় দুর্গে রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পর শিবাজী 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ করেন। এরপর তিনি কর্ণাট অঞ্চল জয় ক'রে দক্ষিণ ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়।

শিবাজীর কৃতিত্ব শুধুমাত্র তাঁর সামরিক ক্রিয়াকলাপ ও রাজ্যজয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, একটি দক্ষ ও উন্নত শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আটজন মন্ত্রীর ('অষ্ট প্রধান') সাহায্যে শিবাজীর শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হ'ত। শাসন কাঠামোর শীর্ষে ছিলেন শিবাজী স্বয়ং। তারপর ছিলেন প্রধানমন্ত্রী যাকে 'পেশোয়া' বলা হ'ত। শিবাজী ছিলেন মারাঠা জনগণের কাছে আদর্শ পুরুষ। তিনি তাঁর শৌর্য-বীর্য, শাসনক্ষমতা, চরিত্রবল প্রভৃতির দ্বারা একজন আদর্শ হিন্দু রাজা হিসাবে বহু মানুষের হৃদয়ে আজও বিরাজ করছেন। এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ভারতবাসী শিবাজীকে তাদের 'জাতীয় বীর'-এর মর্যাদা দিয়ে তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সংগ্রামী অনুপ্রেরণা লাভ করেছে।

শি হুয়াং তি

[শাসনকাল ২৫৯-২১০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন চীনের একজন প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট। ছিন্ বংশোদ্ভূত শি হুয়াং তি অল্পবয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং একে একে বহু রাজ্য জয় করে চীনের এক বিশাল অংশকে নিজ শাসনাধীনে এনে ঐক্যবদ্ধ করেন। এমনকি মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া অভিমুখে সমরাভিযান প্রেরণ করে তিনি আরও বেশ কিছু স্থান তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। অধিকন্তু শি হুয়াং তি একজন দক্ষ প্রশাসক ও শিল্পকলার অনুরাগী ছিলেন। সাম্রাজ্যকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য তিনি নানাবিধ আইন প্রণয়ন ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। শি হুয়াং তি একজন বড় নির্মাতা ছিলেন। তিনি রাজধানী শহরটিকে বহু প্রশস্ত পথঘাট, সুরম্য প্রাসাদ, অট্টালিকা, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণের মাধ্যমে সুশোভিত করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় চীনে স্থাপত্যশিল্প অভূতপূর্ব বিকাশ লাভ করে। বর্বর জাতিগুলোর আক্রমণের হাত থেকে স্বীয় সাম্রাজ্যকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে তিনি চীনের উত্তর সীমান্তে এক দীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন।

শি হুয়াং তি অত্যন্ত একরোখা ও খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি নিজেকে চীনের প্রথম সম্রাট হিসাবে দাবি করতেন এবং চাইতেন তাঁর রাজত্বকাল থেকেই

চীনের ইতিহাস রচনা শুরু হোক্। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরকাল রাজত্ব করার পর শি হুয়াং তি আনুমানিক ২১০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পরলোকগমন করেন। চীনের পরবর্তী হানবংশীয় রাজারা তাঁর কাছে বহু বিষয়ে ঋণী ছিলেন।

শের আলি

[শাসনকাল ১৮৬৩-১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ]

আফগানিস্থানের একজন আমীর ছিলেন। শের আলি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পূর্ববর্তী আমীর দোস্ত মহম্মদের পুত্র। দোস্ত মহম্মদের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে এক ব্যাপক গৃহযুদ্ধ শুরু হলে শেষ পর্যন্ত শের আলি সকল বিরোধী ভ্রাতাকে পরাস্ত ক'রে আফগান সিংহাসন দখল করেন। শের আলি সিংহাসনে আরোহণ করেই ইংলণ্ডের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাশিয়ার বন্ধুত্বলাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই সময় রাশিয়া মধ্য এশিয়ায় ক্রমশঃ তার আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হওয়ায় ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। সুতরাং শের আলির এই রুশ প্রীতি তাঁকে রাতারাতি ইংরেজদের শত্রুতে পরিণত করে ফেলল। ফলস্বরূপ ঘটল দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ (১৮৭৮)। এই সময় সাম্রাজ্যবাদী লর্ড লিটন ছিলেন ভারতের ভাইসরয়। শের আলি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্বদেশ ছেড়ে পলায়ন করতে বাধ্য হলেন এবং পলাতক অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হ'ল। ইংরেজরা নিজেদের পছন্দমত শের আলির ভাগিনেয় আবদুর রহমানকে আফগান সিংহাসনে বসিয়ে আফগানিস্থানে এক তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করল।



শের শাহ

[শাসনকাল ১৫৪০-১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে ভারতবর্ষের একজন প্রতিভাবান শাসক শের শাহ শূরবংশীয় আফগান ছিলেন। অত্যন্ত নিম্ন অবস্থা থেকে অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতার সাহায্যে তিনি ধাপে

ধাপে ক্ষমতার শীর্ষে ওঠেন এবং তামাম হিন্দুস্থানের সম্রাট হবার দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল ফরিদ খাঁ এবং তাঁর পিতা হাসান খাঁ বিহারের সাসারাম অঞ্চলের একজন সামান্য জায়গীরদার ছিলেন। ফরিদ খাঁর মধ্যে অল্পবয়স থেকেই বুদ্ধি, মেধা, জ্ঞানার্জনের স্পৃহা প্রভৃতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ফার্সী ভাষা-সাহিত্যে তিনি খুবই ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গুলিস্তান, বুস্তান, সিকান্দার নামা প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর মুখস্থ ছিল। কিন্তু ফরিদের প্রথম জীবন অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি ও ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। বিমাতার চক্রান্তে পড়ে তিনি দুবার গৃহত্যাগ করে ভবঘুরে জীবনযাপন করতে বাধ্য হন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে বীর্যবত্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি স্বহস্তে একবার একটি বাঘ মেরে শের খান উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ভাগ্যান্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে শের খান বাবরের মোগল শিবিরেও যোগদান করেছিলেন। সেখানে এক বছরের অধিককাল কাজ করার পর তিনি বিহারে ফিরে আসেন এবং নিজের অবস্থাকে ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর বাবরের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র হুমায়ুনের দুর্বলতার সুযোগে তিনি একে একে বিভিন্ন স্থান দখল করতে শুরু করেন। শের খান গৌড়, বারাণসী, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান অধিকার করলে হুমায়ুন তাঁকে দমন করার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু বকসারের কাছে চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯) এবং পরের বছর কনৌজের যুদ্ধে (১৫৪০) পরপর দুবার হুমায়ুন শের খানের হাতে পরাজিত হয়ে পলাতক জীবনযাপন করতে বাধ্য হন। শের খান শের শাহ' নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৫৪০)। শের শাহ হুমায়ুন ভ্রাতা কামরানকে পরাস্ত করে পঞ্জাব অধিকার করেন। তিনি গোয়ালিয়র, মালব, আজমীর, যোধপুর প্রভৃতি স্থানের উপরও নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডে কালঞ্জর নামক দুর্গ অবরোধকালে হঠাৎ বোমা বিস্ফোরণে তাঁর মৃত্যু হয় (১৫৪৫)।

আফগান বীর শের শাহের এখানেই কৃতিত্ব যে মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করার সুযোগে তিনি এমন এক উন্নত ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে যান যার জন্য পরবর্তীকালের শাসকেরা এমনকি স্বয়ং মোগল বাদশাহ আকবর পর্যন্ত তাঁর কাছে যথেষ্টরকম ঋণী। শের শাহ একজন বড় সমরনায়ক ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু মূলতঃ একজন প্রতিভাবান সংস্কারক ও উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থার স্রষ্টা হিসাবে তিনি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। যুদ্ধবিগ্রহে নিরন্তর ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও শের শাহ এক চমৎকার শাসনব্যবস্থার প্রচলন করেন। তাঁর পাঁচ বছরের স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালে বহু উল্লেখযোগ্য শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন তিনি ঘটান। অনেক ক্ষেত্রে তিনি দেশের প্রাচীন হিন্দু-মুসলিম শাসনপদ্ধতির পুনরুজ্জীবন ঘটান এবং সেগুলোকে পরিমার্জিত করে

তাঁর শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় স্থান দেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভারও পরিচয় তিনি রাখেন। তাঁর শাসনসংস্কারগুলো প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সেতুবন্ধন রচনা করেছে। ইংরাজ ঐতিহাসিক কীন্ মন্তব্য করেছেন যে আর কেউ এমনকি ব্রিটিশরাও এই পাঠানের মত এ ব্যাপারে অতখানি প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিতে সমর্থ হননি। একজন স্বৈরাচারী শাসক হলেও শের শাহের শাসন ছিল প্রজাকল্যাণকামী। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকারে বিভক্ত করেছিলেন। সরকারগুলো আবার অনেক পরগণায় বিভক্ত ছিল। এইসব পরগণায় তিনি আমীন, শিকদার প্রভৃতি কর্মচারী নিযুক্ত করেন ও পরগণার রাজকর্মচারীদের কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের জন্য শিকদার-ই-শিকদারান এবং মুনসিফ-ই-মুনসিফান নিযুক্ত করেন। শাসনব্যবস্থার প্রত্যেক দপ্তর সম্পর্কে শের শাহের ছিল সদাসতর্ক দৃষ্টি। শের শাহের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাও ছিল মধ্যযুগের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাঁর এই ব্যবস্থার ফলে একদিকে সাম্রাজ্যের রাজস্বলাভের পরিমাণ যেমন বেড়েছিল, তেমনি প্রজাদের উপরও কোনো প্রকার অতিরিক্ত করের বোঝা চাপত না। শের শাহ যে মুদ্রা ও শুল্ক ব্যবস্থার প্রচলন করেন তারও উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। শের শাহের আর একটা উল্লেখযোগ্য অবদান হ'ল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিবিধান। শের শাহ যে সমস্ত সড়ক বা রাজপথ নির্মাণ করেন সেগুলোর মধ্যে বাংলা দেশ থেকে সিন্ধু পর্যন্ত ১৫০০ মাইল দীর্ঘ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সবচেয়ে বিখ্যাত। এ ছাড়া আগ্রা থেকে বুরহানপুর, আগ্রা থেকে যোধপুর, লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত রাস্তাও তাঁর নির্দেশে নির্মিত হয়েছিল। শের শাহ রাস্তার দুপাশে বহু ছায়াময় বৃক্ষরোপণ এবং সরাইখানা স্থাপন করেন। এ ছাড়া তিনি ঘোড়ার ডাকেরও প্রচলন করেন। সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার জন্য এক সুদক্ষ গোয়েন্দা-বাহিনীও তাঁর ছিল। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশী ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছিল। অপরাধ করলে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হত। নিজামউদ্দিন লিখেছেন যে লোকে রাতে রাজপথের ধারে স্বর্ণমুদ্রার থলি নিয়ে নির্বিঘ্নে নিদ্রা যেতে পারত। শের শাহ একজন নিরপেক্ষ ও দৃঢ়চেতা বিচারক ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এ বিষয়ে কোনোপ্রকার ভেদাভেদ করতেন না। শের শাহ যোগ্যতাসম্পন্ন হিন্দুদেরও উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন। এমনকি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ব্রহ্মজিৎ গৌড় হিন্দু ছিলেন।

শের শাহ এক বিশাল ও সুদক্ষ সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি করেন। সৈন্যবাহিনীর মনোবল ও কর্মদক্ষতা বজায় রাখার জন্য তিনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ব্যবস্থা করেন। তিনি যে

মধ্যযুগে ভারত-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শোর

[শাসনকাল ১৭৯৫-১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে লর্ড কর্ণওয়ালিসের পরবর্তী শাসক হিসাবে স্যার জন শোর ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল হন। তিনি ছিলেন কলকাতা কাউন্সিলের একজন প্রবীণ সদস্য। তিনি ইতিমধ্যেই রাজস্ব বিভাগের কাজকর্ম পরিচালনায় বেশ যোগ্যতার পরিচয় রেখেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব তিনিই কর্ণওয়ালিসকে দিয়েছিলেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যাপক দুর্নীতির সেই যুগে জন শোর ছিলেন এক ব্যতিক্রম। দেশীয় রাজ্যগুলোর পারস্পরিক বিবাদে তিনি হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করেন। অবশ্য অযোধ্যার ক্ষেত্রে তিনি এই নীতি সম্পূর্ণ অনুসরণ করতে পারেননি। তিন বছর গভর্ণর জেনারেলের পদে আসীন থাকার পর ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন শোরের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয় এবং লর্ড ওয়েলেসলী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

সইফউদ্দিন ফিরুজ

[শাসনকাল ১৪৮৭-১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ]

সইফউদ্দিন ফিরুজ ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল মাত্র তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন হাবসী সেনাধ্যক্ষ। দরবারের আমীর-ওমরাহগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে তিনি বাংলার মসনদ লাভ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল আন্দিল। তিনি সইফউদ্দিন ফিরুজ নাম ধারণ করে বাংলার নবাব হন। বাংলার হাবসী বংশের অন্ধকার শাসনপর্বে সইফউদ্দিনের রাজত্বকাল ছিল ব্যতিক্রম। তিনি ন্যায়পরায়ণ ও দক্ষ শাসক ছিলেন। যোদ্ধা হিসাবেও তিনি সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি প্রজাহিতৈষী সুলতান ছিলেন এবং দরিদ্র প্রজাদের অবস্থার উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেন। তাঁর রাজত্বকালের বেশ কিছু মুদ্রা এবং শিলালেখ পাওয়া গেছে। তাঁর রাজত্বকালকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে গৌড়ের কাছে 'ফিরুজী মিনার' স্থাপন করা হয়েছিল, যা আজও বর্তমান। সমসাময়িক কাহিনীকার রিয়াজের লেখা থেকে জানা যায় শক্তিশালী পাইকদের হাতে (যারা তখন সুলতান মনোনয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল) সইফউদ্দিন ফিরুজের জীবনের অন্তিম পরিণতি ঘটে (১৪৯০)।

সইফউদ্দিন হামজা শাহ

[শাসনকাল ১৪০৯-১৪১০ খ্রীষ্টাব্দ]

ইলিয়াস শাহী বংশের শাসক ছিলেন সইফুদ্দিন হামজা শাহ। পিতা আজম শাহের মৃত্যুর পর তিনি বাংলার সিংহাসনে বসেন। আজমের সেনাবাহিনীর প্রধান ব্যক্তিরাই তাঁকে ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তিনি সুলতান উস-সালাতিন (মহা সুলতান) উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু রাজকার্য পরিচালনা করার বিশেষ যোগ্যতা তাঁর ছিল বলে মনে হয় না। হামজার রাজত্বকাল মোটে এক বছর স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায় সিংহাসনে বসার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এক ঘোরতর গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হন। দিনাজপুরের গণেশ নামক এক প্রভাবশালী হিন্দু জমিদার এই গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে দুর্বলচিত্ত হামজাকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজসিংহাসন দখল করে বসেন। হামজার স্বল্পস্থায়ী শাসনের অবসানের সাথে সাথে ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের উপরেও সাময়িক যবনিকা পতন হয়।

সংগ্রাম সিংহ

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী]

রাণা রায়মল্লের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাণা সংগ্রামসিংহ বা রাণা সঙ্গ মেবারের সিংহাসনে বসেন। রাণা সঙ্গের আমলে মেবার রাজপুতানার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং এই সময় এর সার্বিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সংগ্রামসিংহ খুব পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন এবং এক সুবিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন। মাড়বার ও অম্বরের রাজগণ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং গোয়ালিয়র, আজমীর, কাল্পি, চান্দেরী, বুন্দি, আবু প্রভৃতি অঞ্চলকে তিনি তাঁর আশ্রিত করদ রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি দিল্লী ও মালবের সুলতানদ্বয়ের একাধিক আক্রমণ থেকে চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হয়েছিলেন। দিল্লীতে রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা দেওয়ার সুযোগে তিনি উত্তর ভারতে হিন্দু আধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। এমন সময় মোগল নেতা বাবর দিল্লী আক্রমণ করে জয় করে নেন। সংগ্রামসিংহ অন্যান্য দেশীয় রাজাদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে এক বিপুল বাহিনী নিয়ে বাবরের বিরুদ্ধে খানুয়া নামক স্থানে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই যুদ্ধে (১৫২৭) তিনি পরাজয় বরণ করেন। ফলে ভারতবর্ষে হিন্দু আধিপত্য স্থাপনের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয় এবং ভারতে মোগল শাসনের ভিত্তি দৃঢ়তর হয়।

সবুক্তগীন

[শাসনকাল ৯৭৬-৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ]

সবুক্তগীন ছিলেন গজনীর শাসক। তিনি গজনীর স্বাধীন সুলতানীর প্রতিষ্ঠাতা আলপ্তগীণের ক্রীতদাস ছিলেন। আলপ্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁর পরবর্তী বংশধরদের অযোগ্যতার সুযোগে সবুক্তগীন গজনীর শাসক হয়ে বসেন (৯৭৬) এবং বিশ বছরের অধিককাল শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সবুক্তগীন ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা ও শক্তিশালী শাসক। তিনি খুবই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি গজনীর ক্ষুদ্র এলাকার অধিপতি থাকাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি তুর্ক-আফগানদের নিয়ে এক বিশাল সৈন্য-বাহিনী গঠন করে একে একে লামঘান, সিস্তান, খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চলের উপর-তাঁর কর্তৃত্ব বিস্তার করেন। এরপর তিনি হিন্দুস্থান অভিযানের পরিকল্পনা করেন যা ৯৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শুরু হয়। তাঁর সৈন্যবাহিনীর প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করতে শাহী রাজা জয়পাল ব্যর্থ হন। মুসলিম সৈন্যবাহিনী তাঁর রাজ্যে নির্বিচারে লুঠপাট চালায়। জয়পাল বহু অর্থ, মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন ও বেশ কয়েকটি স্থান প্রদান করে সবুক্তগীণের সাথে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হন। সবুক্তগীনও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এর কিছুদিন পর সবুক্তগীনের দুজন কর্মচারীকে জয়পাল কোনো কারণবশত; কারারুদ্ধ করে রাখলে সবুক্তগীন ক্রুদ্ধ হয়ে পুনর্বার জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন। জয়পাল বেগতিক দেখে দিল্লী, আজমীর, কালঞ্জর, কনৌজ প্রভৃতি স্থানের রাজাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে অগ্রসর হন। এক তীব্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর জয়পাল ও তাঁর মিত্রবাহিনী পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়। সবুক্তগীন বহু অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করেন। এইভাবে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পরবর্তী শাসক মামুদের সতেরবার হিন্দুস্থান অভিযানের পথ প্রস্তুত করে দেন। ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সবুক্তগীন পরলোকগমন করেন।



সমুদ্রগুপ্ত

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী]

গুপ্ত বংশের সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্বিগ্বিজয়ী সম্রাট। তাঁর রাজত্বকালের সঠিক সময় এখনও নির্ধারিত

হয়নি। সম্ভবতঃ তিনি ৩২০ খ্রীঃ নাগাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন একসময় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক গ্রন্থে তাঁর রাজত্বকালের উল্লেখ আছে। তবে তাঁর রাজত্বকালের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় প্রশস্তি আকারে তাঁর সভাকবি হরিষেণ রচিত এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি থেকে। এছাড়া সমুদ্রগুপ্তের আমলের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলো থেকেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের যেসব রাজাদের পরাস্ত করেছিলেন এই প্রশস্তি থেকে তাদের নামের তালিকা পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্ত একের পর এক সামরিক অভিযান চালিয়ে আর্যাবর্তের নয়জন এবং দক্ষিণাপথের বারো জন রাজাকে পরাজিত করেন। তবে দক্ষিণ ভারতের দূরবর্তী রাজ্যগুলোকে তিনি প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখেননি এবং তা হয়ত সম্ভবও ছিল না। এগুলো মূলতঃ ছিল তাঁর আশ্রিত করদ রাজ্য। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বেশ কিছু রাজ্যও সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেছিল।

সমুদ্রগুপ্ত শ্রীলঙ্কার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। সিংহলরাজ মেঘবর্ণ ভারতবর্ষে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একটি মঠ নির্মাণের অনুমতি চেয়ে সমুদ্রগুপ্তের কাছে একজন দূতকে প্রেরণ করেন। সমুদ্রগুপ্তের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিশাল আকার ধারণ করে এবং হরিষেণের প্রশস্তি (যাতে তাঁকে সমগ্র জগতের নিয়ন্তা বলে অভিহিত করা হয়েছে) সম্পূর্ণ অমূলক নয়। তাঁর সামরিক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁকে ভারতীয় নেপোলিয়ন আখ্যা দিয়েছেন।

সমুদ্রগুপ্তের প্রতিভা শুধু তাঁর সামরিক অভিযানগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন কবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় তাঁর বীণাবাদনরত প্রতিকৃতিই তাঁর সঙ্গীতানুরাগের বড় প্রমাণ। সমুদ্রগুপ্তের রাজসভা বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির দ্বারা অলঙ্কৃত থাকত।

সারগন

শাসনকাল ৭২২-৭০৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন অ্যাসিরিয় সাম্রাজ্যের একজন খ্যাতনামা শাসক। সারগণের রাজত্বকাল ছিল অ্যাসিরিয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। সারগন একজন সাম্রাজ্যবিজয়ী বীর ও দক্ষ প্রশাসক হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর নেতৃত্বে সমগ্র পশ্চিম এশিয়ার উপর আসিরিয়ার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল এবং নিনেভ সভ্যজগতের শাসনকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

সরফরাজ খান

[শাসনকাল ১৭৩৯-১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার শাসক ছিলেন। সরফরাজ খান পিতা সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। বাংলাদেশে স্বাধীন নবাবীর প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলি খান ছিলেন তাঁর মাতামহ। সরফরাজ ছিলেন বিলাসী, অকর্মণ্য ও ধর্মভীরু প্রকৃতির মানুষ। পিতা সুজাউদ্দিনের তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অযোগ্য পুত্র। ফলে তাঁর আমলে বাংলার আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা বেশ কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। সরফরাজ রাজকার্য পরিচালনায় ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়ায় রাজদরবারে স্বার্থপর ও প্রভাবশালী আমীর-গোষ্ঠীর হীন চক্রান্ত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। নবাবের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর অধীনস্থ বিহারের শাসনকর্তা মির্জা মহম্মদ আলি (আলিবর্দি খান) বাংলার মসনদ দখল করার জন্য সসৈন্যে রাজধানী মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। মুর্শিদাবাদের বাইশ মাইল দূরবর্তী গিরিয়া নামক স্থানে দুই পক্ষের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হলে তাঁর স্বল্পস্থায়ী নবাবীর অবসান ঘটে (১৭৪০)।

সলোমন

[শাসনকাল ৯৭০-৯৩৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন ইজরাইলের একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। সলোমন ছিলেন ডেভিড ও বাথশেবার দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ৯৭০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ডেভিডের উত্তরাধিকারী হিসাবে সিংহাসনে বসেন এবং দীর্ঘ ৩৭ বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন। পরবর্তী ইহুদী ও মুসলমান সাহিত্যে সলোমন একজন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী পুরুষ বলে বর্ণিত হয়েছেন। সলোমনকে নিয়ে অনেক গল্পও রচিত হয়েছে যার কিছু কিছু আজও প্রচলিত আছে। সলোমন একজন প্রজাদরদী সুশাসক ছিলেন। তাঁর ন্যায় বিচারের কাহিনী প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। সন্তানের অধিকার নিয়ে দুই রমণীর মধ্যে বিবাদকে কেন্দ্র করে এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হলে সলোমন তাঁর যে চমৎকার সমাধান করেছিলেন সে কাহিনী আমাদের সকলেরই জানা। ৯৩৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সলোমনের জীবনাবসান হয়।

সাইপসেলাস

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী]

খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে করিনথ নামক গ্রীক রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন। তিনি ৬৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে করিনথের রাজা হন। সাইপসেলাস একজন পরাক্রমশালী

শাসক ছিলেন। তিনি কর্সিরার বিদ্রোহভাবাপন্ন জনগণকে দমন করেন এবং গ্রীসের উত্তর-পশ্চিমাংশে বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে সেগুলোকে করিনথের অধীনস্থ উপনিবেশে পরিণত করেন। তিনি ছিলেন চূড়ান্ত স্বৈরাচারী শাসক। তিনি শাসনকার্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করলেও তাঁর শাসন ছিল দমনমূলক ও অত্যাচারী। তা সত্ত্বেও বলা যায় সাইপসেলাসের আমলে করিনথের সার্বিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে।



সাইরাস

[শাসনকাল ৫৫৮-৫৩০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন পারস্যের একজন পরাক্রমশালী সম্রাট ও বিখ্যাত অ্যাকামেনিড বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সাইরাস ৫৫৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দে পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং তাঁর রাজত্বকাল সর্বসমেত আঠাশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তিনি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে পারস্যের সামরিক শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি করেন। সাইরাস প্রথমেই মিডিয়ার শাসককে সিংহাসনচ্যুত করে রাজ্যটিকে পারস্যের সাথে যুক্ত করেন। এরপর তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এশিয়া মাইনর অভিমুখে তাঁর সমরাভিযান পরিচালনা করেন। সেই সময় লিডিয়ার রাজা ক্রোসাস ছিলেন ঐ অঞ্চলের প্রভু এবং সম্ভবতঃ বিশ্বের সবচেয়ে ঐশ্বর্যবান শাসক। সাইরাস যুদ্ধে ক্রোসাসকে পরাজিত করে বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হন এবং সমগ্র এশিয়া মাইনরের উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর তিনি একে একে অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলন, প্যালেস্টাইন, ফিনিসিয়া প্রভৃতি জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। সাইরাস তাঁর সৈন্যবাহিনীসহ ভারত সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

শুধুমাত্র সাম্রাজ্যজয়ী বীর হিসাবেই নয়, একজন দক্ষ ও প্রজাহিতৈষী শাসক হিসাবেও সাইরাস ইতিহাসে বিশেষ স্থান লাভের অধিকারী। বিজিত দেশের জনগণের প্রতি তাঁর উদার ও সহৃদয় আচরণ সে যুগের পটভূমিকায় বিচার করলে খুবই প্রশংসার দাবি রাখে। অন্যান্য জাতির রীতিনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রতি তিনি উদার মনোভাব প্রদর্শন করতেন। পরবর্তীকালে পারস্য সাম্রাজ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বের

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সক্ষম হয়েছিল যার ভিত্তিপ্রস্তর রচয়িতা ছিলেন সাইরাস। ইতিহাসে তিনি 'সাইরাস দি গ্রেট' নামে পরিচিত। সাইরাস যথার্থই একজন মহানুভব সম্রাট ছিলেন।

সাতকর্ণী

[শাসনকাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী]

গৌতমীপুত্র শ্রীসাতকর্ণী ছিলেন দক্ষিণভারতের অন্ধ্র বা সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর কীর্তিকলাপের বিবরণ নাসিক প্রশস্তি থেকে জানা যায়। এই প্রশস্তি গৌতমীপুত্রের মৃত্যুর ২৩বছর পর তাঁর মা দেবী গৌতমী বালাশ্রীর দ্বারা ক্ষোদিত হয়েছিল। নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্রকে শক, পহ্লব ও যবনদের উচ্ছেদকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি শকরাজ্য আক্রমণ করে ক্ষত্রপ নাহাপনাকে হত্যা করেন এবং একে একে গুজরাট, সৌরাষ্ট্র, মালব, বেরার ও উত্তর কোংকনের শকরাজ্যগুলো জয় করেন। শকদের উচ্ছেদ করে তিনি সাতবাহনদের দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। নাসিক প্রশস্তি থেকে জানা যায় শকদের রাজ্যগুলো জয় করা ছাড়াও গৌতমীপুত্র আরও অনেক এলাকা জয় করেন। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য কৃষ্ণা থেকে কাথিওয়াড় এবং বেরার থেকে কোংকন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি যথার্থভাবেই 'রাজরাজ' উপাধি ধারণ করেন।

শাসক হিসাবেও গৌতমীপুত্র দক্ষতার পরিচয় রাখেন। প্রজাকল্যাণের কথা মনে রেখে তিনি শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। গৌতমীপুত্র বর্ণাশ্রমধর্মের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন শাস্ত্রবিদ্ এবং অতিশয় ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। নাসিকে তিনি একটি সুন্দর শহরও স্থাপন করেছিলেন।

গৌতমীপুত্র ১৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।



সান-ইয়াৎ-সেন

[শাসনকাল ১৯১১-১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ]

আধুনিক চীনের ইতিহাসে সান-ইয়াৎ-সেন এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের চীন বিপ্লবের সময় সান প্রকৃতই জাতির জনকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সান যে চীনের সর্বকালের ইতিহাসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী

নেতা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত সফল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অপদার্থ ও অত্যাচারী মাঞ্চুরাজবংশের পতন হয়। তিনি চীনে এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত ক'রে আধুনিক চীনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তাঁকে যথার্থই চীনা জনগণের মুক্তিদাতা হিসাবে অভিহিত করা যায়। তিনি চীনা জনগণের জীবনের সুদীর্ঘকালীন অন্ধকার দূর করেন এবং অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মৃতপ্রায় একটি জাতিকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তোলেন। চীনা জনগণ তাঁরই নেতৃত্বে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনের শিয়াং-শান প্রদেশে এক সম্পন্ন কৃষক পরিবারে সানের জন্ম হয়। তাঁর কাকা তাইপিং বিদ্রোহের একজন অন্যতম নেতা ছিলেন। সান প্রথমে হনলুলুর ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন এবং তারপর রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য হংকং এর মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময় পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। ক্লাইড্ ও বিয়ার্স এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'বাইরে থেকে এই কয়েক বছরে সান মূলতঃ যে জ্ঞান আহরণ করেন তা চিকিৎসাশাস্ত্র নয় ; বরং দুই বিপরীত জগতের স্বরূপ তাঁর চোখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে : পশ্চিমের শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র এবং অপরপক্ষে কনফুসিয়াসের 'বিশ্বজনীন ভাবাদর্শে' বিশ্বাসী মৃতপ্রায় চীন। স্বদেশের দুর্দশা দেখে তিনি বিচলিত বোধ করেন এবং দেশবাসীকে জাগাবার জন্য সচেষ্ট হন। তিনি বুঝেছিলেন যে চীনের উন্নতিবিধানের জন্য প্রাচীনপন্থী মাঞ্চু সরকারের উচ্ছেদসাধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তিনি বেশ কয়েকবার সরকারের পতন ঘটাবার জন্য বিদ্রোহের চেষ্টা চালান। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে জাপানে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তিনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে একটি দল গঠন করেন পরবর্তী কালে যা 'কুয়োমিংটাং' বা জাতীয়তাবাদী দল হিসাবে সমগ্র চীনে বিস্তারলাভ করে। তিনি অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। তিনি জাপানে বসবাসকারী চীনাদের নিয়ে 'টুং-মেং-হুই' নামে এক দল গঠন করেন। ডাঃ সান প্রচারিত 'সান-মিন-চু-আই' বা তিনটি মূলনীতি চীনা জনগণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই তিনটি নীতি হ'ল -(ক জনগণের জীবিকার ব্যবস্থা (খ) গণ জাতীয়তাবাদ এবং (গ) জনগণতন্ত্র। বিপ্লবীরা নানকিং শহরে একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করলে ডাঃ সান অস্থায়ীভাবে এর সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবের মাধ্যমে মাঞ্চু সরকারের পতন ঘটলে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্লোভ, আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক সান রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ ক'রে য়ুয়ান-শি-কাইকে সেই পদ অর্পণ করেন। কিন্তু য়ুয়ান ক্রমশঃ সব ক্ষমতা নিজের হস্তগত করার চেষ্টা করলে সান প্রতিষ্ঠিত কুয়োমিংটাং দল দক্ষিণ চীনে একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করে। এরপর সান বিদেশী শক্তিগুলো

চীনের উপর যে অন্যায় পীড়ণমূলক সন্ধি চাপিয়ে দিয়েছিল সেগুলো বাতিল করার চেষ্টা করেন। এই কার্যে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণে দ্বিধা করেননি। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মহান দেশপ্রেমিকের কর্মময় জীবনের অবসান হয়।

সালাজার

[শাসনকাল ১৯৩২-১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ]

সালাজার অ্যান্টোনিও ওলিভেরা ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। তারপর থেকে প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তিনিই ছিলেন পর্তুগালের সর্বময় প্রভু ও রাষ্ট্রনায়ক। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তেতাল্লিশ বছর বয়সে পর্তুগালের রাজনীতির প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃত হন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পর্তুগালের সংবিধান রচনা করেন। ভারতবর্ষের গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি স্থান বিগত কয়েকশো বছর ধরে পর্তুগীজদের অধীন ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর নেহরু সরকার ঐ তিনটি স্থান ফিরে পাবার দাবি জানালে সালাজার অত্যন্ত কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেন এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আপোষ মীমাংসায় আসার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন। ভারতের রাজনৈতিক নেতাও স্বদেশপ্রেমিকগণ গোয়ায় প্রবেশের চেষ্টা করায় তাঁদেরকে কুখ্যাত সালাজার জেলে বন্দী করে তাঁদের উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। লোকসভার প্রাক্তন সদস্য ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ্ ত্রিদিব চৌধুরী দেড় বছরেরও অধিককাল সালাজার জেলে বন্দী অবস্থায় অতিবাহিত করেন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনের পর সালাজার পুনরায় পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তিনি বিশ্বের বিভিন্নস্থানে পর্তুগীজ অধিকৃত উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতার দাবিকে উপেক্ষা করেন এবং ঐসব অঞ্চলে তীব্র দমননীতি চালিয়ে যান। ইউনাইটেড নেশনস্-এ তিনি তাঁর আচরণের জন্য কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জেনারেল কারিয়াপ্পার নেতৃত্বে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বলপূর্বক গোয়া, দমন, দিউ পর্তুগীজদের হাত থেকে মুক্ত করে। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর সালাজার মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সিংহবিষ্ণু

[শাসনকাল ৫৭৫-৬০০ খ্রীষ্টাব্দ]

পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণু ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্বে রাজত্ব করতেন। তিনি মোট ছাব্বিশ বছর রাজত্ব করেন। তিনি কাবেরী পর্যন্ত অঞ্চল নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। সিংহলের

শাসক ও পাণ্ড্যরাজের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা ছিল। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং তিনি 'অবনী সিংহ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। মামল্লপুরম বা মহাবলীপুরম বরাহ গুহার গায়ে সিংহবিষ্ণুর প্রতিকৃতি খোদিত আছে।

সিকান্দার লোদী

[শাসনকাল ১৪৮৯-১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ]

লোদী বংশের সুলতান সিকান্দার লোদী বাহলুল লোদীর মৃত্যুর পর ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সিকান্দার শাহ নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন বাহলুলের দ্বিতীয় পুত্র এবং তাঁর আসল নাম ছিল নিজাম খান। সিকান্দার শাহ নি সন্দেহে ছিলেন লোদী বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি ছিলেন সাহসী, পরিশ্রমী ও দৃঢ়চেতা। তিনি শক্তহাতে শাসনকার্য পরিচালনা করে অল্পকালের মধ্যেই সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। তিনি অবাধ্য ও স্বাধীনতা প্রিয় প্রাদেশিক শাসক ও জমিদারদের দমন করেন এবং সামরিক অভিযান চালিয়ে একে একে ত্রিহুত ও বিহার জয় করেন। বাংলাদেশ পর্যন্ত তাঁর বিজয়ী বাহিনী অগ্রসর হয়েছিল। তিনি দরিয়া খানকে বিহারের শাসক নিযুক্ত করেন ও বাংলার হুসেন শাহের সাথে একটি সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে স্থির হয় উভয় নেতাই একে অপরের রাজ্য আক্রমণ থেকে বিরত থাকবেন। তিনি ত্রিহুতের রাজাকে করপ্রদানে বাধ্য করেন। ধোলপুর, চান্দেরি প্রভৃতি অঞ্চলের নেতারাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। এটাওয়া, বিয়ানা, কোলি, গোয়ালিয়র, ধোলপুর প্রভৃতি স্থানের উপর ভালভাবে নজর রাখবার জন্য তিনি ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে এক নতুন শহরের আগ্রা প্রতিষ্ঠা করেন। আগ্রা শহরের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও সিকান্দার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সিকান্দারের চারিত্রিক নানা গুণের জন্য তিনি সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের অনেক লেখকের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছেন। তিনি হৃদয়বান, প্রজাদরদী শাসক ছিলেন এবং দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হন। তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন এবং নিজে ফার্সী ভাষায় বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। তিনি ন্যায় বিচারক ছিলেন এবং তাঁর সুশাসনে দেশে একদিকে যেমন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল তেমনি অপর দিকে নিত্যব্যবহার্য জিনিস পত্রের দামও অনেক হ্রাস পেয়েছিল। তবে সিকান্দারের একটা মস্ত ত্রুটি হল তাঁর ধর্মীয় অনুদারতা যার জন্য তিনি বেশ কিছু নীতিবিগর্হিত কাজও করেছেন। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় সিকান্দার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সিকান্দার শাহ

[শাসনকাল ১৩৫৭-১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দ]

সুলতান ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র সিকান্দার শাহ ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মসনদে বসেন। পিতার মত তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী ও দক্ষ প্রশাসক। তিনি তিন দশকের বেশী সময় তাঁর রাজত্ব পরিচালনা করেন এবং দিল্লীর আক্রমণ থেকে বাংলার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হন। ফিরুজ শাহ তুঘলক এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিকান্দারের রাজ্য আক্রমণ করেন। বিচক্ষণ সিকান্দার সম্মুখ সমরে অগ্রসর না হয়ে সুরক্ষিত একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। ফিরুজের আক্রমণ বাংলার সেনাদল বীরত্বের সঙ্গে প্রতিহত করে। ফিরুজ শেষ পর্যন্ত একডালা দুর্গ অধিকার করতে ব্যর্থ হয়ে দিল্লী ফিরে যান। অবশেষে পারস্পরিক উপহার বিনিময়ের মধ্য দিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ফিরুজ দিল্লী ফিরে যাবার পর বহুদিন পর্যন্ত বাংলার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় থাকে। বাকী জীবনের অধিকাংশ সময় সিকান্দার শান্তিতে রাজত্ব চালান এবং তাঁর রাজধানীকে বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, ইমারৎ, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত করেন। তাঁর রাজত্বকাল বাংলার স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে এবং পাণ্ডুয়ার নিকটস্থ আদিনা মসজিদ অতীত কীর্তির নীরব সাক্ষী হিসাবে আজও বর্তমান। ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সিকান্দার মৃত্যুমুখে পতিত হন।



সিরাজউদ্দৌলা

[শাসনকাল ১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাসের শেষ স্বাধীন নবাব। মীর্জা মুহম্মদ সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন বাংলার পূর্ববর্তী শাসক আলীবর্দি খানের কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র।

তিনি অপুত্রক আলিবর্দি খানের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং আলিবর্দি খানের ইচ্ছানুসারে তাঁর মৃত্যুর পর ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। সিংহাসনে বসার পরই সিরাজকে এক তীব্র গৃহবিবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আলিবর্দির জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগম সিরাজের সিংহাসনলাভকে সুনজরে দেখেননি। তিনি আলিবর্দির মধ্যমা কন্যার পুত্র পূর্নিয়ার শাসক সৌকত জঙ্গকে সিংহাসনলাভে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি নানাভাবে সিরাজের শত্রুতাচরণ শুরু করায় সিরাজ একদিন ঘসেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদ অভিমুখে অভিযান করে ঘসেটি বেগমকে বন্দী করেন। ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভও ঘসেটি বেগমের সাথে সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। ধুরন্ধর ইংরেজরা এই সুবর্ণ সুযোগ সহজেই গ্রহণ করে এবং রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় সপরিবারে আশ্রয় দান করে। নবাব রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে বার বার কৃষ্ণদাসকে তাঁর হস্তে সমর্পণ করতে বললে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করেনি। সিরাজের রাজত্বকালের সূচনা হতেই ইংরেজরা নানাভাবে তাঁর কর্তৃত্ব উপেক্ষা করতে থাকে। তারা সিরাজের অনুমতি ছাড়াই দুর্গ নির্মাণ করে। সিরাজ তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং দুর্গ নির্মাণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানী এই আদেশ অমান্য করে। সিরাজ এরপর বিষয়টি নিয়ে পারস্পরিক আলোচনার উদ্দেশ্যে তাঁর বিশেষ দূত নারায়ণ দাসকে প্রেরণ করলে কলকাতার ইংরেজ কুঠির গভর্ণর ড্রেক তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগ এনে তাঁকে বিতাড়িত করেন। কোম্পানীর কর্মচারীরা যথেচ্ছভাবে দস্তকের অপব্যবহার শুরু করলে নবাব এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। কিন্তু কোম্পানী এই প্রতিবাদকেও উপেক্ষা করে। অগত্যা ক্রুদ্ধ নবাব কলকাতার ইংরেজ কুঠি ও দুর্গ আক্রমণ করে জয় করে নেন (জুন, ১৭৫৬)। ইংরেজরা ফলতায় পালিয়ে যায়। এই সময় নাকি ১৪৬ জন ইংরেজকে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ করে রাখা হয় যার ফলস্বরূপ অনেকেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। ঘটনাটি হলওয়েল নামক ইংরেজ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়। ইতিহাসে এই ঘটনা 'ব্ল্যাক হোল ট্রাজেডী' বা 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত। আধুনিক অনেক ঐতিহাসিকই অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীকে মনগড়া ও অতিরঞ্জিত বলে মনে করেন।

কলকাতা অধিকারের পর সিরাজ তাঁর অপর শত্রু সৌকত জঙ্গকে মনিহারীর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করেন। কলকাতা পতনের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছলে কর্ণেল ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসন বাংলাদেশে সৈন্যসহ উপস্থিত হন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁরা কলকাতা পুনর্দখল করেন ও অল্প-কালের মধ্যে নবাবকে আলিনগরের সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করেন। ইতিমধ্যে রাজদরবারে সিরাজবিরোধী ষড়যন্ত্র বেশ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর

এবং রায়দুর্লভ, ইয়ারলতিফ খাঁ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ প্রভৃতি দেশের বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এই চক্রান্তে লিপ্ত হন। ক্লাইভ গোপনে এদের সাথে যোগ দেন। এক চুক্তির মাধ্যমে স্থির হয় চক্রান্ত সফল হলে মীরজাফর বাংলার নবাব হবেন এবং ক্লাইভ ও ইংরাজ কোম্পানী বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। এরপর ক্লাইভ আলিনগরের সন্ধিভঙ্গের মিথ্যা অজুহাত এনে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভ যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং ২৮শে জুন মীরজাফর বাংলার নবাব হন। সিরাজ পলাতক অবস্থায় ধৃত হন এবং তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সিরাজের মৃত্যুর সাথে সাথে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্ত যায় এবং বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এরপর থেকে বাংলাদেশকে কেন্দ্র ক'রে ইংরেজ কোম্পানী ক্রমশঃ সমগ্র ভারতে তাদের ক্ষমতা ও একাধিপত্য বিস্তার করে। পলাশীর যুদ্ধ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সর্বদিক দিয়েই বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার পলাশীর যুদ্ধের দিনটিকে ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনাকাল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

সিরাজউদ্দৌলার শাসনকাল এক বছর কয়েক মাস স্থায়ী হয়েছিল। সিংহাসনে আরোহণকালে তিনি ছিলেন ২৩ বছরের যুবক। মাত্র ২৪ বছর বয়সেই তাঁর জীবনের করুণ পরিণতি ঘটে।



সীজার

[শাসনকাল ৪৯-৪৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন রোমের একজন বিখ্যাত জেনারেল ও শাসক। জুলিয়াস কেইয়াস সীজার ১০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিউনিক যুদ্ধে জয়লাভের ফলে রোম অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কার্থেজ, স্পেন, সিসিলি প্রভৃতি জয়ের পর দক্ষিণ গল অভিমুখে

রোমান বাহিনী অভিযান চালায়। রোমানরা গ্রীস ও এশিয়া মাইনর অভিমুখেও অগ্রসর হয় এবং এশিয়া মহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। বিজয়ী জেনারেলরা রোমে ফিরে এসে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই সময় রোমে কোনো রাজপদের অস্তিত্ব না থাকায় রোমান সিনেটই ছিল সকল ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত এবং অভিজাত বংশোদ্ভূত সিনেটরদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ও অকর্মণ্য পরিচালনায় সিনেটের শাসনে শৈথিল্য দেখা দেয়। এইসব জেনারেলের মধ্যে ক্র্যাসাস, পম্পে ও জুলিয়াস সীজারই ছিলেন প্রধান। তরুণ বয়সে সীজার রোমের সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন এবং নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে স্পেনের শাসক নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত সুচারুভাবে স্পেনের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। জনসমর্থন পেয়ে অতঃপর তিনি কনসাল পদে অধিষ্ঠিত হন। সীজার এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অভিযান চালিয়ে সমগ্র গলদেশ (ফ্রান্স) জয় করেন। তিনি দীর্ঘ দশ বছর সেখানে অবস্থান ক'রে পিরানিজ থেকে রাইন পর্যন্ত সমগ্র এলাকা জয় করে নেন। তিনি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম ক'রে ব্রিটেন জয়ের চেষ্টাও চালিয়েছিলেন (৫৫-৫৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)। কিন্তু শীঘ্রই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ায় তাঁকে এই পরিকল্পনা অসমাপ্ত রেখে রোমে ফিরে আসতে হয়।

রোমে অরাজক পরিস্থিতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলে এই অন্তর্দ্বন্দ্বে কেউ কেউ অভিজাত ও সেনেটরদের পক্ষাবলম্বন করে আবার কেউ বা জনসমর্থনপুষ্ট হয়ে ক্ষমতা-লাভের প্রয়াস চালায়। পম্পে, ক্র্যাসাস ও জুলিয়াস সীজার এক পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। কিন্তু এই তিনজনের মধ্যে একচ্ছত্র অধিপতি হবার জন্য শীঘ্রই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। ক্র্যাসাসের মৃত্যুর পর পম্পে ও সীজারের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে সীজার বিজয়ী হয়ে ৪৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে রোম সাম্রাজ্যের সর্বময় প্রভু হয়ে বসেন। সীজার নেতা হয়ে পূর্বেকার সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বহিরাঙ্গিক রূপটি আপাতদৃষ্টিতে বজায় রাখলেও সকল ক্ষমতা স্বীয় কুক্ষিগত করেন। সীজার রোমে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেও তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি ও প্রজাদরদী শাসক। প্রজাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি বহু শাসন সংস্কার প্রবর্তন করেন এবং তাঁর আমলে রোমের সর্বাঙ্গীন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। বাস্তবিকই জুলিয়াস সীজার ছিলেন রোমের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি তাঁর অধীনস্থ দেশের জনসাধারণকেও রোমান নাগরিকদের সমান সুযোগ-সুবিধা দিতেন এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, রাজপথ, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন।

সীজার মিশরেও বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়া অভিযানের

সময় তিনি ক্লিওপেট্রার সংস্পর্শে আসেন এবং মিশরের এই রূপসী রাণী ও তাঁর ভ্রাতার মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটান। তিনি ক্লিওপেট্রাকে বিবাহ ক'রে রোমে নিয়ে আসেন। রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে এশিয়ায় গমন করে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই রোমান সেনেটকে এক পত্রে লেখেন "ভিডি ভিনি ভিসি" (অর্থাৎ এলাম, দেখলাম. জয় করলাম)—এই উক্তিটি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তারপর তিনি স্পেন অভিমুখে অভিযান চালিয়ে তাঁর শত্রু পম্পিয়াসের পুত্রদের দমন ক'রে রোমে ফিরে আসেন। তাঁর সময় রোম সাম্রাজ্য বিশালাকার ধারণ করে এবং তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন অত্যন্ত দক্ষভাবে এই সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

কিন্তু জুলিয়াস সীজার রোমের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ায় রোমের প্রভাবশালী অভিজাতগোষ্ঠীর অনেকেই ঈর্ষান্বিতবোধ করতে থাকেন। সীজারের ক্ষমতাবৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর শত্রুর সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের নেতৃত্বে তাঁকে হত্যা করার এক গোপন ষড়যন্ত্র করা হয়। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ব্রুটাসের মত সীজারের ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত অনুচরেরা অনেকেই লিপ্ত ছিলেন।

একদিন সীজার জনগণের অভিযোগ শোনার উদ্দেশ্যে সেনেটে আগমন করলে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে একটি দরখাস্ত নিয়ে আসেন। সীজার ঐ দরখাস্তটি পড়তে শুরু করলে ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে তাঁর উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে থাকে। এইসময় সীজার বিস্ময়বিমূঢ়চিত্তে লক্ষ্য করেন হত্যাকারীদের মধ্যে তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রিয় সঙ্গী ব্রুটাসও রয়েছেন। 'ব্রুটাস, তুমিও!'—এই কথা বলে ক্ষতবিক্ষত দেহে সীজার তাঁর পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী পম্পের স্ট্যাচুর সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শেষ শয্যা গ্রহণ করেন।

জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর সাথে সাথে প্রাচীন রোমের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগের অবসান হয়। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার জন্য তাঁকে আলেকজান্ডার শার্লেমান, নেপোলিয়ন প্রভৃতি বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শাসকদের সাথে একাসনে স্থান দেওয়া হয়ে থাকে।

সুজাউদ্দিন

[শাসনকাল ১৭২৭-১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলায় স্বাধীন নবাবীর প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদকুলি অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মসনদ লাভ করেন। সুজাউদ্দিন উদার হৃদয়, বন্ধুবৎসল, বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শাসক। তাঁর আমলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা অটুট ছিল। তিনি পূর্ববর্তী শাসক মুর্শিদকুলি খানের

আমলের সৈন্যবিভাগে বেশকিছু সংস্কার সাধন করেন এবং পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। বহু জাতের মানুষের সমন্বয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী গঠিত ছিল। আড়ম্বরপ্রিয় ও সৌন্দর্যবিলাসী নবাব সুজাউদ্দিন বহু নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর আমলে বাংলার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার লক্ষ্য করা যায়। দিল্লীর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুজাউদ্দিন তাঁর পূর্বসূরী মুর্শিদকুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন। বাংলার সাথে দিল্লীর সৌহার্দ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সুজাউদ্দিন প্রতি বছর এক কোটিরও বেশি পরিমাণ অর্থ বাদশাহের কাছে পাঠাতেন। উড়িষ্যা পূর্বেই বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুজাউদ্দিনের সময়ে বিহারও বাংলার অধীনে আসে। শাসনকার্যের সুবিধার্থে নবাব বৃহৎ সুবা বাংলাকে চার অংশে বিভক্ত করেন। সুজাউদ্দিনের সময় বাংলাদেশে বিদেশী কোম্পানীগুলোর বাণিজ্যিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে ইংরেজদের ছিল অগ্রণী ভূমিকা। সুজাউদ্দিন ইংরেজ বণিকদের বিশেষ মাথাচাড়া দেবার সুযোগ দেননি। তিনি প্রয়োজন-বোধে তাদের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতেন। তারা নবাবের আক্রোশের শিকার হবার ভয়ে বহু অর্থ নজরানা দিত। সুজাউদ্দিনের রাজত্বকালের সামগ্রিক পর্যালোচনা করে বলা চলে তিনি ছিলেন মোটামুটিভাবে একজন সফল শাসক। তাঁর রাজত্বকালে গৃহযুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ প্রভৃতির মত কোনো বড় ধরনের অশান্তি ঘটেনি। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁর রাজত্বকালকে বাংলার শান্তি ও সমৃদ্ধির কাল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বারো বছর রাজত্ব করার পর ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্দিনের মৃত্যু হয়।

সুজাউদ্দৌলা

[শাসনকাল ১৭৫৩-১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অযোধ্যার নবাব ছিলেন। সুজাউদ্দৌলার আসল নাম ছিল জালালউদ্দিন হায়দর। তিনি ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতা মনসুর আলি খান সফদর জঙ্গ-এর মৃত্যুর পর ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব হন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে (যা আহমদ শাহ আবদালি ও মারাঠাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল) তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। মোগল বাদশাহ সাহ আলম সুজাউদ্দৌলাকে তাঁর উজীর নিযুক্ত করেন। তিনি শাহ আলম ও বাংলার নবাব মীরকাশিমের সাথে সম্মিলিতভাবে ইংরাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর বক্সারের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং পরাজিত হয়ে কোম্পানীকে বহু অর্থ ক্ষতিপূরণ ও কিছু স্থান প্রদানে বাধ্য হন।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ফৈজাবাদ নামক স্থানে সুজাউদ্দৌলা পরলোক-গমন করেন।

সুয়াঙ সুঙ

[শাসনকাল ৭১২-৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ]

চীনের তাঙ বংশের একজন রাজা ছিলেন। তাঙ বংশের নবম রাজা সুয়াঙ সুঙ ৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল প্রাচীন চীনের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সুয়াঙ সুঙের সুযোগ্য নেতৃত্বে তাঙ বংশ ক্ষমতা ও মর্যাদার শীর্ষে আরোহণ করে। তাঙ সৈন্যবাহিনী এই সময় মধ্য এশিয়ায় চীনের আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়। অবশ্য ৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঙ নেতৃত্বাধীন চীনা সামরিক বাহিনী আরবদের কাছে পরাজয় বরণ করেছিল।

সুয়াঙ এক সুশৃঙ্খল ও উন্নত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখেন এবং পরিবহণ ব্যবস্থারও বেশ কিছু উন্নতিসাধন করেন। কিন্তু রাজত্বকালের শেষ দিকে এক বিদ্রোহ ঘটায় ৭৫৬ সালে সুয়াঙ সুঙ সিংহাসন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। তা সত্ত্বেও বলা যায় তিনি চীনে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উপপত্নী ইয়াং কুয়ে ফেই-এর প্রতি রাজা সুয়াঙ-এর অত্যধিক মোহই তাঙ রাজপ্রাসাদের পরিবেশকে দূষিত করে এবং সুয়াঙের পতনের পথ প্রস্তুত করে বলে মনে করা হয়ে থাকে।

সুলেমান

[শাসনকাল ১৫২০-১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দ]

অটোমান তুরস্ক সাম্রাজ্যের একজন খ্যাতনামা শাসক ছিলেন। ইতিহাসে তিনি সুলেমান 'দি ম্যাগনিফিসেণ্ট' নামে পরিচিত। যখন রিফর্মেশনের ফলে পশ্চিম ইউরোপ নানা সমস্যায় জর্জরিত এবং পঞ্চম চার্লস ও প্রথম ফ্রান্সিসের মধ্যে ইতালী অধিকারের জন্য সুদীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে বিব্রত ঠিক সেই সময় পূর্ব ইউরোপে অটোমান তুর্কীরা অতি দ্রুত তাদের আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে একজন অসাধারণ দক্ষ শাসকের নেতৃত্বে যাঁর নাম সুলেমান। সুলেমান ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের নেতা হন। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান সেনানায়ক। তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকাল জুড়ে তিনি তাঁর রাজ্যজয় ও সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি অব্যাহত রাখেন। সুলেমানের আমলে তুরস্কের সীমানা আফ্রিকার উত্তর উপকূল বরাবর বিস্তার লাভ করে এবং ইউরোপে ডানিয়ুব বরাবর হাঙ্গেরী পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সেণ্ট জনের নাইটদের কাছ থেকে তিনি প্রথমে রোডস অধিকার করেন এবং তারপর হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান চালিয়ে বেলগ্রেড জয় করেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মডেয়ারদের আর একটি যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে

পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে হাঙ্গেরীর রাজা নিহত হন। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাঙ্গেরীর অনেকখানি অংশ জয় করে নেন এবং অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা পর্যন্ত তাঁর বিজয়ী বাহিনী অগ্রসর হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি ভিয়েনা জয় করতে পারেননি। আজীবন তিনি অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশের রাজাদের কাছে ভীতিপ্রদ বলে বিবেচিত হয়েছেন। নৌশক্তির দিক দিয়েও সুলেমান কিছুমাত্র কম ছিলেন না। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় তাঁর নৌবাহিনী ইউরোপীয় রাজনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং স্পেন, ইতালী প্রভৃতি শক্তিশালী খ্রীষ্টান দেশগুলোর পক্ষে ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমান এক নৌঅভিযান চালিয়ে ভেনিসিয়দের বিতাড়িত করেন এবং গ্রীস অধিকার করে নেন। ইজিও উপদ্বীপের অধিকাংশ ভেনিসিয় জনগণকেও তিনি উৎখাত করেন। তাঁর শক্তির পরিচয় পেয়ে পঞ্চম চার্লসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রথম ফ্রান্সিস তাঁর বন্ধুত্ব ও সাহায্য চান। ফরাসী বাহিনীর সাথে তুর্কী নৌবহর যুক্ত হয়ে নিস্ অবরোধ করে এবং সমগ্র খ্রীষ্টান জগতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। হাঙ্গেরীতে একটি দুর্গ অবরোধ করার সময় সুলেমান মারা যান (১৫৬৬)। সুলেমানের নেতৃত্বাধীন তুর্কী সাম্রাজ্য শুধু যে সামরিক দিক দিয়েই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তাই নয়, তুরস্কের জনগণের মধ্যে এই সময় এক অদ্ভুত মানসিক জাগরণও লক্ষ্য করা যায়। সুলেমান শাসক হিসাবেও রীতিমত সুনামের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর শাসন পদ্ধতি সমসাময়িক বহু খ্রীষ্টান রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। সুলেমান মোট ৪৬ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

সেন্নাচেরিব

[শাসনকাল ৭০৫-৬৮১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

অ্যাসিরিয় সাম্রাজ্যের একজন শক্তিমান রাজা। সেন্নাচেরিব ছিলেন সুযোগ্য পিতা সারগণের উপযুক্ত পুত্র। তিনি পিতার মৃত্যুর পর এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন এবং শক্ত হাতে শাসনকার্য পরিচালনা করে অ্যাসিরিয় সাম্রাজ্যের গৌরব ও প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সমর্থ হন। সেন্নাচেরিব বিশেষভাবে নির্মিত নৌবহরের সাহায্যে ক্যালডেয়া জয় করেন এবং নিজের মনোনীত এক ব্যক্তিকে ব্যাবিলনের সিংহাসনে স্থাপন করেন।

সেলুকাস

[শাসনকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী]

বিশ্ববিজয়ী গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের একজন সেনাপতি ছিলেন সেলুকাস নিকেটর। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকায় তাঁর

সুবিশাল সাম্রাজ্য তাঁর সেনাপতিরা নিজেদের মধ্যে ভাগভাগি করে নেন। সেলুকাস ব্যাবিলনের অধীশ্বর হন এবং ক্রমশঃ তাঁর সাম্রাজ্যসীমা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। আলেকজান্ডার যে সমস্ত ভারতীয় এলাকা জয় করেছিলেন অতঃপর সেগুলো পুনরধিকার করার উদ্দেশ্যে সেলুকাস সিন্ধুনদ অতিক্রম করে পূর্বদিক অভিমুখে অগ্রসর হন। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সাথে এইসময় সেলুকাসের এক তীব্র যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সেলুকাস পরাজিত হন এবং কাবুল, হীরাট কান্দাহার, বালুচিস্তান প্রভৃতি স্থান চন্দ্রগুপ্তকে প্রদান করেন বলে জানা যায়। সেলুকাসের সাথে চন্দ্রগুপ্তের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গ্রীকবীর নিজ কন্যাকে মৌর্য সম্রাটের সঙ্গে বিবাহ পর্যন্ত দেন। চন্দ্রগুপ্ত প্রতিদানে সেলুকাসকে ৫০০ হাতী উপহার হিসাবে প্রদান করেন। সেলুকাস আর একটি স্মরণীয় কাজ করেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় দূত হিসাবে মেগাস্থিনিসকে প্রেরণ করেন যাঁর বিবরণ থেকে সমসাময়িক কালের ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে।

সোবিয়েস্কি তৃতীয়

[শাসনকাল ১৬৭৪-১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে পোল্যান্ডের একজন রাজা ছিলেন। তৃতীয় সোবিয়েস্কি ১৬২৪ খৃীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং পঞ্চাশ বছর বয়সে পোল্যান্ডের রাজা হন। জন সোবিয়েস্কির শাসনকাল মোট বাইশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তিনি একজন পরাক্রমশালী সম্রাট ছিলেন এবং সামরিক শক্তির পরকাষ্ঠা দেখিয়ে কসাক, তাতার, তুর্ক প্রভৃতি দুর্ধর্ষ বিদেশী অভিযানকারীদের আক্রমণ থেকে পোল্যান্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমর্থ হন। ১৬৯৬ খৃীষ্টাব্দে বাহাত্তর বছর বয়সে জন সোবিয়েস্কি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সোলোন

[শাসনকাল ৫৯৪-৫৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ]

সোলোন এথেন্সের রাজা কোড্রাসের বংশোদ্ভূত একজন অভিজাত ছিলেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রভূত অর্থোপার্জন করেন। তিনি একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন এবং কবিতা রচনা করতেন। মেগারার হাত থেকে স্যালামিস দখল করার সময় তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। ৫৯৪ খৃীষ্ট পূর্বাব্দে তিনি আর্কনের পদলাভ করেন এবং এথেন্সের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধনের জন্য তাঁকে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। মূলতঃ তাঁর শাসন সংস্কারের জন্যই সোলোন ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর শাসন সংস্কারগুলোর মাধ্যমে তিনি এথেনীয়

গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। স্বীয় কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে সোলোন বিদেশ ভ্রমণে যান। ইতিমধ্যে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে পিসিট্রেটাস নিজেকে এথেন্সের শাসক হিসাবে ঘোষণা করেন। সোলোন এথেন্সে ফিরে আসেন। কিন্তু পুনরায় ক্ষমতাধিকার করতে না পারায় তিনি সাইপ্রাসে গমন করেন এবং সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

স্কন্দগুপ্ত

[শাসনকাল ৪৫৫-৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ]

গুপ্তবংশের শেষ বড় রাজা হলেন স্কন্দগুপ্ত। সম্ভবতঃ ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। পিতা কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং এই গৃহযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে স্কন্দগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। স্কন্দগুপ্ত যে একজন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। রাজত্বকালের অনেকটা সময়ই তাঁকে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। সিংহাসনে বসার অল্পকাল পরেই তাঁকে শ্বেত হুণদের আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়। বহিরাগত হুণেরা এইসময় ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং প্রবলবেগে আক্রমণ চালিয়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে। স্কন্দগুপ্ত অত্যন্ত বীরত্বের সাথে সংগ্রাম করে এই ম্লেচ্ছ আক্রমণকারীদের চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। ফলে পরবর্তী পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্য এই বিদেশী হানাদারদের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন যে ভারতবর্ষের রক্ষাকর্তা হিসাবে স্কন্দগুপ্তের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়া স্কন্দগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের বাকাটক আক্রমণ প্রতিহত করেন। স্কন্দগুপ্ত সুবিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যকে সফলভাবে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে সমর্থ হন যা বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে আরব-সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রজাদরদী সুশাসক হিসাবেও তিনি বেশ দক্ষতার পরিচয় রেখেছিলেন।

স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্ত শাসকেরা তাঁর মত যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা যায় ও ক্রমশঃ এটা পতনের পথে যাত্রা করে।

স্ট্যানিসলাস পোনিটৌস্কি

[শাসনকাল ১৭৬৪-১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পোল্যান্ডের রাজা ছিলেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোল রাজা তৃতীয় অগাস্টাসের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে এক গৃহবিবাদ শুরু হলে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো এই সুযোগ গ্রহণ করে। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে এক চুক্তির মাধ্যমে স্ট্যানিসলাস পোনিটৌস্কি এই দুই রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট হয়ে পোলিশ সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্ট্যানিসলাস ছিলেন পোল্যান্ডের অভিজাত বংশের সন্তান। রুশ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিণের সাথে তাঁর পূর্ব প্রণয় ছিল বলে শোনা যায়। মূলতঃ রুশ সামরিক শক্তির সাহায্যেই স্ট্যানিসলাস রাজসিংহাসন অধিকারের সুযোগ পান। স্বভাবতঃই এই কার্যের পশ্চাতে ক্যাথারিনের উদ্দেশ্য ছিল পোল্যান্ডকে রাশিয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল একটি তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করা। কিন্তু স্ট্যানিসলাস রাজসিংহাসনে বসার পর সংবিধান সংশোধন, কুখ্যাত লিবেরাম ভিটোর উচ্ছেদসাধন প্রভৃতি নানাবিধ আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারে সচেষ্ট হ'লে দ্বিতীয় ক্যাথারিন উদ্বিগ্ন বোধ করেন। হতভাগ্য স্ট্যানিসলাস বেশিদিন শান্তিতে রাজকার্য পরিচালনা করতে পারেননি। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া সেণ্ট পিটার্সবার্গের চুক্তির মাধ্যমে পোল্যান্ডের ব্যবচ্ছেদ ঘটায় এবং পোল্যান্ডের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। ফলে স্ট্যানিসলাসেরও স্বাধীন রাজত্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘনিয়ে আসে।



স্ট্যালিন:

[শাসনকাল ১৯২৪-১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ]

বিংশ শতাব্দীর সোভিয়েত রাশিয়ার একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ ও নেতা। যোসেফ ভিসারিওনোভিচ স্ট্যালিন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এক অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নবংশোদ্ভূত হয়েও স্ট্যালিন অপরিসীম আত্মবিশ্বাস ও অসাধারণ

যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সুদীর্ঘ প্রায় তিনদশক ধরে সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বপদে আসীন থাকার গৌরব অর্জন করেন। অত্যন্ত নির্ভীক প্রকৃতির লৌহ-কঠিন এই মানুষটি মাত্র সতের বছর বয়সেই একজন সক্রিয় বিপ্লবপন্থী হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেন এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের সময় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে সাম্যবাদী আদর্শের জন্য সরকারী রোষানলে পড়ে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যু হলে স্ট্যালিন রাশিয়ার নেতা হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯২৮-৩৩ এর এই পরিকল্পনায় কৃষি, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতির অগ্রগতির দিকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। স্ট্যালিনের বলিষ্ঠ ও সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য রুশ জীবনধারায় এক বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করে। এরপর ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ঘটানোর দিকে তিনি দৃষ্টি দেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর থেকে রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম প্রধান শিল্পোন্নত দেশের মর্যাদালাভ করে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী উন্নয়নের দিক দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান শ্রেষ্ঠত্বের মূলে স্ট্যালিনের অবদান অনস্বীকার্য। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পূর্ণতা লাভ করার পূর্বেই সোভিয়েত রাশিয়াকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল।

বিশ্বের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো সোভিয়েতের মত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও ক্রমবিকাশকে ভীতির চক্ষে দেখতে থাকে এবং বহুদিন স্বীকৃতি দিতে নারাজ হয়। এমনকি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সোভিয়েত রাশিয়া জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ পর্যন্ত গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। ইউরোপে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকলে স্ট্যালিন জার্মানীর হিটলার ও ইতালীর মুসোলিনির অগ্রগতি রোধ করার জন্য উভয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিসঙ্ঘের অপরাপর সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালান। কিন্তু তাদের দিক থেকে বিশেষ সাড়া না পাওয়ায় আত্মরক্ষার তাগিদে তিনি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসী জার্মানীর সাথে দশ বছরের জন্য এক 'অনাক্রমণ চুক্তি' সম্পাদন করেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরের অল্পদিনের মধ্যেই হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা করেন। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির মাধ্যমে হিটলার ও স্ট্যালিন গোপনে পূর্ব ইউরোপকে দুই দেশের মধ্যে ভাগাভাগি করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার পূর্বচুক্তি ভঙ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ করলে স্ট্যালিন স্বভাবতঃই মিত্রশক্তির দিকে ঝুঁকে পড়েন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিতে এক উল্লেখযোগ্য

পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যখন স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোতে রুশ আধিপত্য বিস্তারের আগ্রাসী অভিযান শুরু হয়। বস্তুতপক্ষে, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের (স্ট্যালিনের মৃত্যু পর্যন্ত) মধ্যবর্তী তেরো-চৌদ্দ বছরের ইউরোপের ইতিহাস ছিল বহু পরিবর্তনের ইতিহাস যার অন্যতম নায়ক ছিলেন যোসেফ স্ট্যালিন। এইসময় স্ট্যালিন তাঁর 'দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হবার নীতি' অবলম্বন করে একের পর এক পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোকে রুশ প্রভাবাধীনে এনে তাদের সোভিয়েত রাশিয়ার তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করেন। ১৯৫১ সালের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে যুগোশ্লাভিয়া ছাড়া সমগ্র পূর্ব ইউরোপ স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীনে আসে। রুশ আগ্রাসী নীতির সূচনাপর্ব থেকেই পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলো সতর্ক হতে শুরু করে। কিন্তু নাৎসী জার্মানীর ভয়ে ভীত মিত্রশক্তি তীব্রভাবে রুশ সমর্থন ও সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করায় স্ট্যালিনের বিশেষ বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেনি। তাই দেখা যায় ইয়ালটা সম্মেলনে কূটনৈতিক দরকষাকষিতে স্ট্যালিনেরই জয় হয়েছিল।

ওয়াল্টার লিপম্যানের ভাষায় বলা যায় যে পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রকটভাবে রেড আর্মির শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল যা ইয়ালটা সম্মেলন আহবানের মূল পশ্চাৎপট রচনা করেছিল। ১৯৪৫ এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর স্ট্যালিন রুশ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ঘটানো এবং ইউরোপে অবস্থানকারী রেড আর্মি ও রাশিয়ার মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপনের কথা ভাবেন। তাঁর কাছে এইসব অর্থনৈতিক ও স্থানগত প্রশ্ন ছিল মুখ্য এবং মতাদর্শের প্রশ্ন ছিল গৌণ। 'লৌহ মানব' স্ট্যালিন ইউরোপে 'কমিনফর্ম' ও 'কমিকণ' গঠনের মাধ্যমে রুশ নিয়ন্ত্রণের যে ব্যাপক নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার বিষময় ফল ফলতে বেশি বিলম্ব হয়নি। কোরিয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এইসব অধীনস্থ দেশে তীব্রভাবে দেখা দেয় যখন রাশিয়া উত্তরোত্তর খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল সরবরাহের জন্য এইসব রাষ্ট্রের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। বিশেষতঃ চেকোশ্লোভাকিয়া ও পূর্ব জার্মানীতে রুশনীতির বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। এই অসন্তোষ দমনে অগ্রসর হবার পূর্বেই স্ট্যালিন মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৯৫৩)। স্ট্যালিনের মৃত্যুতে পূর্ব ইউরোপে রুশ একাধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস অনেকখানি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় আর সেই সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে একটি যুগের অবসান হয় যাকে অনেকাংশে 'স্ট্যালিন প্রভাবিত যুগ' বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

স্মাট্‌স্

[শাসনকাল ১৯১৯-২৪, ১৯৩৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ]

দক্ষিণ আফ্রিকার একজন রাজনীতিবিদ, প্রধানমন্ত্রী ও সেনানায়ক। তিনি বিখ্যাত বুয়র যুদ্ধের (যা গ্রেটব্রিটেন ও দক্ষিণ-আফ্রিকার ওলন্দাজ উপনিবেশকারীদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল) একজন অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য ব্রিটেনের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জ্যান ক্রিশ্চিয়ান স্মাট্‌স্ ১৮৭০ খৃীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং একজন আইনজীবী হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেছিলেন। বুয়র ও ব্রিটিশদের মধ্যে বিবাদ শুরু হলে তিনি তাঁর ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করে বুয়রদের পক্ষাবলম্বন করেন। বুয়র যুদ্ধে তিনি গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধে বুয়ররা পরাজিত হয়। স্মাট্‌স্ ও ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পারেন যে অস্ত্রবলের সাহায্যে সমস্যার সমাধান হবে না, বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাই তিনি ব্রিটেনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯১০ খৃীষ্টাব্দে ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা গঠনে তিনি এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় স্মাট্‌স্ বহু বুয়রের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ব্রিটেনকে তাঁর সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করেন। তিনি পূর্ব আফ্রিকায় জার্মানদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন।

১৯১৯ খৃীষ্টাব্দে স্মাট্‌স্ ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৯২৪ খৃীষ্টাব্দে পদচ্যুত হলেও ১৯৩৯ খৃীষ্টাব্দে পুনরায় ঐপদ লাভ করেন। ১৯৪১ খৃীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্মাট্‌স্ ফিল্ড মার্শাল মনোনীত হন। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে তিনি ইউ. এন. ও-র প্রতিষ্ঠায় বিশেষ প্রয়াস চালান। ১৯৫০ খৃীষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়।

হরিহর প্রথম

[শাসনকাল ১৩৩৬-১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দ]

চতুর্দশ শতাব্দীতে মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হরিহর ও বুক্কা নামক ভ্রাতৃদ্বয়। শোনা যায় দুই ভাই প্রথমে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে সুলতানের প্রতিনিধি হিসাবে মুসলিম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন। কিন্তু ধর্মগুরু মাধব বিদ্যারণ্যের প্রভাবে পড়ে তাঁরা পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। তাঁরা তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে নতুন স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের

রাজধানী মহাসমারোহ সহকারে প্রতিষ্ঠা করেন। বিরূপাক্ষের (শিব) পূজার মাধ্যমে হরিহরের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় (১৩৩৬)। সতের বছর রাজত্ব করার পর ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হরিহর পরলোকগমন করেন।

হরিহর দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১৩৭৯-১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দ]

বিজয়নগর রাজ্যের সঙ্গম বংশীয় একজন রাজা। বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম বুক্কার পুত্র দ্বিতীয় হরিহর পিতার মৃত্যুর পর ১৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্যের রাজা হন। তিনি মহারাজাধিরাজ, রাজা পরমেশ্বর প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক সিউয়েল দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকাল নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে ভরপুর ছিল বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু সমসাময়িক যুগের বেশ কিছু শিলালেখ থেকে বোঝা যায় যে তাঁর সময়ে বজয়নগর রাজ্যের সাথে প্রতিবেশী মুসলিমদের সংঘর্ষ হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ বিজয়নগরের সেনাবাহিনীকে মুসলিম প্রধান ফিরুজ শাহ বাহমনের হাতে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। সমসাময়িক শিলালেখ থেকে জানা যায় দ্বিতীয় হরিহরের আমলে বিজয়নগর রাজ্য দক্ষিণ ভারতের অনেকটা অংশ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল (মহীশূর, কানাড়া, চিংলেপুট, ত্রিচিনোপল্লী, কাঞ্জিভরম প্রভৃতি)। দ্বিতীয় হরিহর বিরূপাক্ষ শিবের উপাসক হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার মনোভাব প্রদর্শন করতেন। ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় হরিহর পরলোকগমন করেন।



হর্ষবর্ধন

[শাসনকাল ৬০৬-৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে হর্ষবর্ধন একজন স্মরণীয় রাজা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে বসেন (৬০৬ খ্রীঃ)। থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশোদ্ভূত হর্ষবর্ধনের পিতা ছিলেন প্রভাকরবর্ধন। কনৌজরাজ

গ্রহবর্মন ছিলেন তাঁর ভগ্নিপতি। গ্রহবর্মন মালবরাজ দেবগুপ্তের হাতে নিহত হওয়ায় কনৌজের সিংহাসন শূন্য হয়। হর্ষ রাজা হয়ে থানেশ্বর ও কনৌজেকে যুক্ত করলে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি হয়। তিনি কনৌজকে তাঁর রাজধানী করেন। একজন সাম্রাজ্যবিজয়ী বীর হিসাবে হর্ষবর্ধন ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। দেশের বিভিন্নস্থানে অভিযান চালিয়ে তিনি এক সুবিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন এবং এক দক্ষ সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখেন। তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর হন। এইজন্য তাঁকে 'সকলোত্তরাপথনাথ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্য অভিমুখে অভিযানে বার হয়ে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট তাঁকে জীবনের প্রথম এবং সম্ভবতঃ শেষ পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। ফলে দক্ষিণ ভারত জয়ের পরিকল্পনা তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়। বঙ্গের পরাক্রমশালী রাজা শশাঙ্ক ছিলেন হর্ষের সমসাময়িক ও প্রধান শত্রু। হর্ষবর্ধন বহু প্রয়াস চালিয়েও তাঁকে কোণঠাসা করতে পারেন নি। একমাত্র শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষ বঙ্গদেশ জয় করেন। হর্ষ চীন ও পারস্যের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। একজন বড় দাতা ও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে হর্ষের রাজত্বকালের অনেক ঘটনা ও সম্রাটের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানা যায়। ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন ইহলোক ত্যাগ করেন।

হাইলে সেলাসি

[শাসনকাল ১৯৩০-৩৫,১৯৪১-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ]

ইথিওপিয়ার সম্রাট ছিলেন। একজন বিশিষ্ট জেনারেলের পুত্র এবং সম্রাট দ্বিতীয় মেনেলিকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হাইলে সেলাসি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি খুবই মেধাবী ছিলেন। তিনি মেনেলিকের সুনজরে আসেন এবং প্রথমে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদলাভ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল তফারি ম্যাকোন্নেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাইলে সেলাসি উপাধি ধারণ ক'রে ইথিওপিয়ার সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারে মন দেন এবং দাসপ্রথার বিলোপসাধন করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালী কর্তৃক ইথিওপিয়া আক্রান্ত হ'লে তিনি সসৈন্যে শত্রুর মোকাবিলায় অগ্রসর হন। কিন্তু ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রতিকূল বিবেচনা ক'রে তিনি ব্রিটেনের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। তিনি ইতালীর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একাধিকবার লীগ

অব্ নেশনস্-এ আবেদন ক'রে ব্যর্থ হন। ইতালী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করার পর ১৯৪১ সাল নাগাদ তিনি ইথিওপিয়ায় প্রত্যাবর্তন ক'রে পুনরায় সিংহাসন দখল করেন। যুদ্ধোত্তরকালে তিনি দেশে বহু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ইথিওপিয়ায় একটি ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী প্রতিষ্ঠা করেন। ষাট ও সত্তরের দশকে তিনি সমগ্র আফ্রিকার ঐক্যের জন্য কাজ করেন। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর সামরিক বাহিনীর প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়।

হার্ডিঞ্জ

[শাসনকাল ১৮৪৪-১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ]

ব্রিটিশ ভারতের একজন গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। লর্ড হেনরী হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে উনষাট বছর বয়সে এই পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং একজন সাহসী ও দক্ষ সেনাধ্যক্ষ হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। লীগনীর যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর একটি হাত উড়ে যায় এবং তিনি স্পেনে ইতিহাসখ্যাত করুণার যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষে এসেই তিনি নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দেশের অভ্যন্তরে ধর্মের নামে নরবলি, শিশুহত্যা প্রভৃতি অনাচার বন্ধে উদ্যোগী হন। লর্ড ডালহৌসীর আমলে প্রথম রেলপথ নির্মিত হলেও তাঁর সময়েই প্রথম রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। সেচবিভাগের কাজও তিনি আরম্ভ করেন এবং বহু ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়কে সরকারী চাকরী দেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ বাধে (১৮৪৫-৪৬)। এই যুদ্ধে শিখ শক্তিকে পরাজিত করে তিনি শিখদের লাহোরের সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করেন। শিখ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে 'ভাইকাউণ্ট অব লাহোর' উপাধি প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শাসনকালের মেয়াদ শেষ হলে লর্ড হার্ডিঞ্জ ইংলণ্ডে ফিরে যান এবং আরও আট বছর জীবিত থাকার পর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।



হাড্রিয়ান

[শাসনকাল ১১৭-১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ]

প্রাচীন রোমের একজন শাসক। হাড্রিয়ান পূর্ববর্তী সম্রাট ট্রাজানের মৃত্যুর পর ১১৭ খ্রীষ্টাব্দে রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন পরিশ্রমী ও প্রজা হিতৈষী সম্রাট ছিলেন। রোমের উন্নতিকল্পে তিনি বহু কাজ করেছিলেন। তিনি কেলডোনিয়ানদের হাত থেকে ব্রিটেনকে রক্ষা করেন। তাঁর আমলে নির্মিত পরিখা দুর্গের অংশবিশেষ, রাস্তাঘাট, প্রাচীর প্রভৃতির নিদর্শন দেখে তাঁর রাজত্বকালে প্রাচীন রোমের উন্নত অবস্থা সম্পর্কে বেশ একটা ধারণা করা যায়। হাড্রিয়ান ১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট একুশ বছর রাজত্ব করেন।



হানিবল

[শাসনকাল ২১৮-১৮৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির যুগে আফ্রিকার উত্তর উপকূলে কার্থেজ নামক এলাকা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং রোমের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অবতীর্ণ হয়। কার্থেজিয়রা সিসিলি জয়ের চেষ্টা করলে রোমের সাথে যুদ্ধ বাধে (প্রথম পিউনিক যুদ্ধ, ২৬৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)। প্রথম যুদ্ধে রোমানরা জয়লাভ ক'রে সিসিলি দখল করে নেয়। হানিবল ছিলেন প্রাচীন ইতিহাসের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ। তিনি বড় হয়ে

কার্থেজের নেতা হন এবং স্বদেশের এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে তাঁর সেনাবাহিনীকে আরও সুদক্ষ ও উন্নত করে গড়ে তোলেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর পিতা জেনারেল হামিলকার তাঁকে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বলাভের উপযোগী করে গড়ে তোলেন। হানিবল খুবই কষ্টসহিষ্ণু ও প্রচণ্ড শারীরিক-মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি রোম আক্রমণের পরিকল্পনা করেন এবং সেই প্রাচীন যুগে অধিকৃত স্পেন থেকে ৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করে অবশেষে ইতালীতে উপস্থিত হন। তাঁর সৈন্যবাহিনীকে পথে বহু প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়, বড় বড় নদী ও দুর্গম অঞ্চলসমূহ অতিক্রম করতে এবং বহু উপজাতির শত্রুতাচরণের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু একজন অদম্য ও অক্লান্ত যোদ্ধা হানিবল তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে তুষারাচ্ছাদিত আল্‌পস পর্বতও অতিক্রম করে যান এবং অবশেষে রোমে এসে উপস্থিত হন। পথে খাদ্যাভাবে,প্রচণ্ড শীতে ও দুর্ধর্ষ পার্বত্য উপজাতিদের আক্রমণে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের মধ্যে বিশ হাজার মারা পড়ে। তিনি রোমানদের বিশাল বাহিনীকে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরাজিত করেন। আশী হাজার রোমান সৈন্যের মধ্যে মাত্র দশ হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেঁচে ফিরতে পারে। দীর্ঘদিন হানিবল ইতালীতে অবস্থান করে বহু এলাকা জয় করেন। ইতিমধ্যে রোমানরা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এবং সিপিও নামে একজন বড় সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে আফ্রিকা অভিযান করে। হানিবলকে বাধ্য হয়ে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। ২০২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জামা নামক স্থানে রোমানদের হাতে পরাজিত হয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়েন এবং শত্রুর হাতে লাঞ্ছনা সহ্য করার পরিবর্তে বিষপানে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীকালে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন হানিবলের এই দুঃসাহসিক অভিযানের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আল্‌পস পর্বত অতিক্রম করেছিলেন।

হানিবলকে বিশ্বের সর্বকালের ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও সেনাধ্যক্ষ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

হামুরাবি

[শাসনকাল ২১২৩-২০৮১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

প্রাচীন ব্যাবিলনের একজন বিশিষ্ট রাজা ছিলেন। হামুরাবির সুদীর্ঘ রাজত্বকাল নিঃসন্দেহে ব্যাবিলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। হামুরাবি অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল রাজত্ব করেন বলে জানা যায়। এই সময়ের মধ্যে তিনি একজন বীর যোদ্ধা, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ও দক্ষ প্রশাসক হিসাবে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি এলামাইট আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করেন এবং অনেক রাজ্য জয় করে উত্তর ও

দক্ষিণ ব্যাবিলনকে তাঁর শাসনাধীনে এনে এক ঐক্যবন্ধ, শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। হাম্মুরাবি প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল এবং তাঁকে প্রাচীন ব্যাবিলনিয় সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর রচয়িতা বললে অত্যুক্তি হয়না। হাম্মুরাবি শুধুমাত্র রাজ্যজয়ের মাধ্যমে সাম্রাজ্য স্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি, একে সংরক্ষণ ও অধীনস্থ প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। সাম্রাজ্যকে যথাযথভাবে শাসন করার জন্য তিনি যে সব আইন প্রণয়ন করেন (কোড অব্ হাম্মুরাবি) সেগুলি তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। এই 'কোড' থেকে সমসাময়িক কালের ব্যাবিলনিয় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। বিশ্বের প্রাচীনতম আইন-সংকলন হিসাবে এগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

হাম্মুরাবি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সাম্রাজ্য মধ্যে জল সরবরাহের সুষ্ঠ বন্দোবস্তের উদ্দেশ্যে 'নাহর-হাম্মুরাবি' নামে এক সুবিশাল খাল খনন করেন। এ ছাড়া তিনি বহু অট্টালিকা, দেবালয়, পথঘাট প্রভৃতিও নির্মাণ করেন। তাঁর আইনবিধি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সুসা নামক স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। হাম্মুরাবি সঠিক কতবছর রাজত্ব করেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে।



হায়দর আলি

[শাসনকাল ১৭৬৫-১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ]

হায়দর আলি ছিলেন মহীশূরের শাসক। তিনি অত্যন্ত সামান্য অবস্থা থেকে ধাপে ধাপে ক্ষমতার শীর্ষে ওঠেন। তিনি মহীশূরের হিন্দুরাজবংশের দুর্বল শাসক নঞ্জরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজ্যটির কর্ণধার হন। হায়দর নিরক্ষর হলেও প্রখর বাস্তববুদ্ধি ও কূটনৈতিকজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর সামরিক প্রতিভার জন্য শক্তিশালী ইংরাজপক্ষের কাছে তিনি ভীতির কারণ হয়ে ওঠেন। তিনি সেরা, বেদনোর,

গুটি প্রভৃতি স্থান দখল করলে দাক্ষিণাত্যের নিজাম ও মারাঠারা আতঙ্কিত হয়। তারা ইংরেজদের সাথে ত্রিশক্তিজোট গঠন করে মহীশূর আক্রমণ করে। হায়দর কূটনীতির সাহায্যে মারাঠা ও নিজামকে নিজ পক্ষে আনেন। অতঃপর তিনি সঙ্গীহীন ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ করে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ঘাঁটি মাদ্রাজ শহরের দ্বারদেশে উপস্থিত হন। মাদ্রাজের ইংরেজ গভর্ণর ভীত হয়ে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে হায়দরের সাথে মাদ্রাজের সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হন। কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষ এই সন্ধির শর্ত পালন না করায় আবার যুদ্ধ শুরু হয়। হায়দর এক বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে চেঙ্গামা গিরিবর্ত্ম দিয়ে কর্ণাটে প্রবেশ করেন। কিন্তু স্যার আয়ার কূটের হাতে পোর্টোনোভা ও ত্রিনোমালির যুদ্ধে (১৭৮১) হায়দরের পরাজয় হয়। তা সত্ত্বেও হায়দর বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যান। দুর্ভাগ্যক্রমে কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়ে শীঘ্রই হায়দর মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭৮২)।

পরাক্রমশালী ইংরেজশক্তির বিরুদ্ধে যে ক'জন দেশীয় শাসক বীরবিক্রমে সংগ্রাম চালিয়ে বীরের মৃত্যুবরণ করেছেন হায়দর আলি নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে একজন।

হারুণ-অল-রসিদ

[শাসনকাল ৭৮৬-৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ]

খলিফা হারুণ-অল রসিদ ছিলেন মুসলিম দুনিয়ার সবচেয়ে যশস্বী খলিফা। তিনি ৭৮৬ খৃষ্টাব্দে খলিফার পদে ভূষিত হন এবং মোট ২৩ বছর অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে তাঁর ক্ষমতা পরিচালনা করেন। হারুণ-অল-রসিদের রাজধানী ও কর্মকেন্দ্র ছিল বাগদাদ শহর। তিনি আব্বাস শাহী বংশোদ্ভূত ছিলেন। আব্বাস শাহী বংশের আমলে বাগদাদ তার সৌভাগ্য ও খ্যাতির শীর্ষদেশে আরোহণ করেছিল। বিশেষ করে খলিফা হারুণ-অল-রসিদের সময়কে ইসলামিক সভ্যতার সুবর্ণযুগ হিসাবে অভিহিত করা যায়। হারুণ-অল-রসিদ একজন প্রজাদরদী, দক্ষ, দূরদর্শী ও পরিশ্রমী শাসক ছিলেন। তিনি একজন মস্তবড় নির্মাতাও ছিলেন। তিনি ছিলেন নির্ভীক ও ন্যায়-পরায়ণ বিচারক। তাঁর রাজত্বকালের খ্যাতি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাঁর প্রচেষ্টায় বাগদাদ পরিণত হয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহরে।

হারুণ-অল-রসিদকে নিয়ে অনেক গল্প ও উপাখ্যান গড়ে উঠেছে যেগুলো থেকে তাঁর জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বিশ্ববিখ্যাত 'আরব্য রজনী'র গল্প-গুলো তাঁকে ইতিহাসে অমরতা দান করেছে। হারুণ-অল-রসিদ ছিলেন শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী এক মহানুভব সম্রাট। তাঁর প্রাসাদে বহু দূর দেশ থেকে জ্ঞানী-গুণীরা এসে সমবেত হতেন এবং খলিফা তাঁদেরকে বহুমূল্য উপহার প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের

গুণের যোগ্য সমাদর করতেন। তিনি লক্ষ লক্ষ দিরহাস (পারসিক মুদ্রা) ব্যয় করে প্রাসাদ, মসজিদ, সরাইখানা, রাস্তাঘাট, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণের সাহায্যে বাগদাদ শহরকে অত্যন্ত সুশোভিত করেন। তাঁর আমলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও রীতিমত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং মুসলিম বণিকেরা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে যাতায়াত করত। বাগদাদের সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি।

৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই কীর্তিমান শাসকের জীবনাবসান হয়।

হাল

[শাসনকাল ২০-২৪ খ্রীষ্টাব্দ]

সাতবাহন বংশের একজন রাজা। তিনি ২০ থেকে ২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট পাঁচ বছর রাজত্ব করেন। হালের রাজত্বকাল প্রধানতঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য স্মরণীয়। এই সময় প্রাকৃত ভাষায় বহু জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচিত হয়। হাল জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর রাজসভা এইসব ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পূর্ণ থাকত। শোনা যায় গাথা সপ্তসতি গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন হাল স্বয়ং। সম্ভবতঃ বৃহৎকথার রচয়িতা গুণাধ্যায় হালের রাজসভা অলংকৃত করতেন।

হিউ ক্যাপেট

[শাসনকাল ৯৮৭-৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ]

ফ্রান্সের ক্যাপেসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা। হিউ ক্যাপেট ছিলেন এই বংশের একজন বিশিষ্ট সম্রাট। ৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বছরটা ফ্রান্সের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই বছর ফ্রান্সের সিংহাসনে এমন এক নতুন রাজবংশের রাজত্বের শুভ সূচনা হয় যা পরবর্তী প্রায় সুদীর্ঘ সাড়ে তিনশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে ফ্রান্সের প্রভু হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। রাজা হিসাবে মনোনীত হবার পর হিউ ক্যাপেট এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রেইমের আর্চবিশপ কর্তৃক অভিষিক্ত হন। এই অনুষ্ঠানে চার্চের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন। হিউ ক্যাপেটের সাথে চার্চের সুসম্পর্ক তাঁর রাজত্বকালের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। তাঁর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার প্রতিশ্রুতিদানের মধ্যে চার্চের সংরক্ষণের জন্য রাজার বিশেষ দায়িত্বের কথাও ছিল। শাসক হিসাবে হিউ ক্যাপেট যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। সামন্ত রাজগণ তাঁর নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তিনি আজীবন গ্যালিকান চার্চের অনুগত সেবক ও রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করেন। হিউ ক্যাপেট প্রজাদরদী শাসক

ছিলেন। তাঁর আমল থেকেই ফ্রান্সের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে। নয় বছর রাজত্ব করার পর ৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হিউ ক্যাপেটের জীবনাবসান হয়।



হিটলার

[শাসনকাল ১৯৩২-১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ]

হিটলার জন্মসূত্রে ছিলেন অস্ট্রিয়ান। পরবর্তীকালে তিনি জার্মানীর নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। এ্যাডলফ্ হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী জার্মানীর উত্থান আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। হিটলারের নেতৃত্বাধীন নাৎসী দল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'লে জার্মানী তথা সমগ্র ইউরোপের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। জার্মান প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর হিটলার 'ফুরার' উপাধি গ্রহণ ক'রে জার্মানীর একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসেন। নাৎসী দল সাম্যবাদ ও ইহুদী জাতির ঘোর বিরোধী ছিল। নাৎসীদের উদ্দেশ্য ছিল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত ভার্সাই সন্ধিকে নাকচ করা ও এই সন্ধির ফলে জার্মানীর উপর যে সব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবিচার এবং শোষণ চলেছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ; 'আর্যবংশোদ্ভূত' জার্মান জাতিকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি ও ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা; ইহুদী জাতিকে পৃথিবী থেকে চিরতরে নির্মূল করা প্রভৃতি। হিটলারের আত্মজীবনী 'মেইন ক্যাম্ফ' থেকে নাৎসীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার কথা জানা যায়। ক্ষমতায় আসীন হবার পর থেকেই হিটলার জার্মানীর পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। তিনি জার্মানীকে দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। সকল প্রকার বিরোধী দলের অস্তিত্ব তিনি বিলুপ্ত করেন এবং সমগ্র জার্মানীতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রচলন করেন।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে হিটলারের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভার্সাই সন্ধির প্রতিশোধ

নেওয়া এবং ব্যাপক সমরাভিযান চালিয়ে ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বকে জার্মানীর পদানত করা। বাস্তবিকই হিটলারের এই জঙ্গী মনোভাব ও আগ্রাসী নীতি সমগ্র বিশ্বকে রীতিমত আতঙ্কিত করে তুলেছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ও ইতালীর সাথে ত্রিশক্তি চুক্তি সম্পাদন ক'রে হিটলার নিজের শক্তি আরও বৃদ্ধি করেন। তিনি রাশিয়ার সাথে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দশ বছরের জন্য একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। হিটলার একের পর এক রাষ্ট্র আক্রমণ ক'রে জার্মানীর পদানত করতে শুরু করলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিবর্গ শঙ্কিত হয়। অবশেষে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয় (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বাহিনী অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হয়ে ইউরোপের এক বিশাল অংশ জয় করে নেয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাবশতঃ হিটলার পূর্বের অনাক্রমণ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ ক'রে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করে বসেন। কিন্তু তিনি শেষ রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়া ও মিত্রশক্তির ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি) সম্মিলিত বাহিনীর কাছে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে বার্লিনের পতন ঘটায় হিটলার আত্মহত্যা করেন। ইতিপূর্বে তাঁর অন্যতম প্রধান মিত্র ফ্যাসিস্ট ইতালীর নেতা মুসোলিনিরও মৃত্যু হয়েছিল। হিটলারের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর যবনিকা পড়ে।

হিদেকি তোজো

[শাসনকাল ১৯৪১-১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ]

জাপানের একজন সমরবিশারদ, রাজনীতিবিদ, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রনায়ক। হিদেকি তোজো ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তরুণ বয়সে সামরিক বিভাগে যোগদান করে নিজ যোগ্যতাবলে জেনারেল পদে উন্নীত হন। তিনি দীর্ঘদিন রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তিন ও চারের দশকে জাপ রাজনৈতিক দুনিয়ার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। যুদ্ধপ্রিয় এই মানুষটি মনে প্রাণে ছিলেন একজন সৈনিক। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তোজো চীনে সৈনাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে কার্যভার পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন তিনি জাপানের প্রধানমন্ত্রী তথা প্রকৃত একনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন (১৯৪১-৪৪)। তাঁর আদেশেই জাপানী বোমারু বিমানগুলো আমেরিকার পার্ল হারবার আক্রমণ করে। আমেরিকা ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সাইপন অধিকার করলে তাঁকে

পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাবার পর তাঁকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিচারে দোষী প্রমাণিত হলে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তোজো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

হিদেয়োশি টয়োটোমি

[শাসনকাল ১৫৯০-১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ]

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে জাপানের একজন সামরিক শাসক ছিলেন। তিনি ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তরুণ বয়সে ব্যারণ নোবুনাগার সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। স্বীয় যোগ্যতাবলে তিনি উচ্চ সামরিক পদ লাভ করেন। নোবুনাগার মৃত্যুর পর তিনি নোবুনাগার জাতীয় ঐক্যবিধানের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্রাটের প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ক্রমশঃ শাসনব্যবস্থায় তাঁর প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুযোগ বুঝে সকল ক্ষমতা নিজ হস্তগত করেন। তিনি সম্রাটপদ তুলে দিয়ে তাঁর অধীনে জাপানে সামরিক একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬২ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

হিপ্পিয়াস

[শাসনকাল ৫২৭-৫১০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ]

বিশিষ্ট স্বৈরাচারী শাসক পিসিস্ট্রেটাসের পুত্র হিপ্পিয়াস পিতার মৃত্যুর পর ৫২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এথেন্সের রাজা হন। তিনি প্রথমে তাঁর ভাই হিপ্পারকাসের সাথে যুগ্মভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। উভয় ভ্রাতা পিতার পন্থা অনুসরণ করে প্রজাহিতৈষী নীতিসমূহের দ্বারা রাজকার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এক গোপন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে হিপ্পারকাস নিহত হন এবং হিপ্পিয়াস অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। ভ্রাতার মৃত্যু হিপ্পিয়াসকে নির্মম ও সন্দেহপ্রবণ করে তোলে। তিনি এই চক্রান্তের সাথে জড়িত সন্দেহে বেশ কিছু ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেন এবং সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রজাদের উপর নতুন খাজনা ধার্য করেন। হিপ্পিয়াসের কঠোর ও খেয়ালী শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ অবশেষে তাঁর হাত থেকে উদ্ধারের পথ অনুসন্ধান করতে থাকে এবং অ্যালক্যায়োনিড গোষ্ঠীপতি ক্লিসথিনিস সুকৌশলে স্পার্টার সাহায্য লাভ করেন। স্পার্টার রাজা ক্লিওমেনেস এক বাহিনী নিয়ে হিপ্পিয়াসের নগর-দুর্গ অবরোধ করে রাখলে হিপ্পিয়াস আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। তাঁকে এথেন্স ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। হিপ্পিয়াসের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ৫১০ খ্রীষ্টাব্দে এথেন্সে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘনিয়ে আসে।

হিরোবুমি ইটো

[শাসনকাল ১৮৮৫-১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ]

জাপানের একজন রাজনৈতিক নেতা এবং শাসন সংস্কারক। হিরোবুমি ইটো ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে শিমোনোসেকির নিকটবর্তী চোশু প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সামুরাই বংশোদ্ভূত। প্রথম যৌবনে ইটো রাজতন্ত্রের সমর্থক ও 'বিদেশী বিরোধী' ছিলেন। কিন্তু ইংলন্ড ঘুরে আসার পর তাঁর মানসিকতার বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। শোগানের শাসন থেকে জাপানকে মুক্ত করার ব্যাপারে ইটো এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে নবপ্রতিষ্ঠিত মেইজি সরকারের আমলে ইটো পূর্তদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তোশিমিচি ওকুবো আততায়ী হস্তে নিহত হলে ইটো মেইজি সরকারের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে সেইসব দেশের সংবিধান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে তিনি জাপানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবার গৌরব অর্জন করেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে যে নতুন সংবিধান প্রবর্তন করা হয়েছিল তার মূল অবদান ছিল ইটোর। চীন-জাপান যুদ্ধের পর ইটো ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সাথে শিমোনোসেকির সন্ধি স্থাপন করেন। ইটো চারবার প্রিভি কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়ায় আততায়ী হস্তে ইটো মৃত্যুবরণ করেন।

হুবিষ্ক

[শাসনকাল ১০৬-১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ]

হুবিষ্ক ১০৬ খ্রীষ্টাব্দে বষিষ্কের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কুষাণ বংশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১০৬ থেকে ১৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩২ বছর রাজত্ব করেন। হুবিষ্ক একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁর আমলে কুষাণ সামরিক শক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটে। হুবিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন এবং মথুরা, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে বহু বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। হুবিষ্কের আমলের অনেক স্বর্ণ ও তাম্র মুদ্রা পাওয়া গেছে যেগুলো থেকে তাঁর রাজত্বকালের সমৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। হুবিষ্ক অন্যান্য সব ধর্মের প্রতি উদার ও সহিষ্ণু ছিলেন।



হুমায়ুন

[শাসনকাল ১৫৩০-৪০, ১৫৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দ]

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ বছর বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসেই হুমায়ুনকে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। বাবর তাঁর ভারত সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করবার সময় পাননি। শাসক হিসাবে হুমায়ুন তেমন যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। তার ওপর লঘু আমোদপ্রমোদ ও আফিঙের নেশা তাঁকে আরও দুর্বল করে ফেলেছিল। তাঁর সময় গুজরাটের বাহাদুর শাহ ও বিহারের আফগান বীর শের শাহ ছিলেন তাঁর দুই প্রবল প্রতিপক্ষ। হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে পরাজিত করলেও শের শাহের বিরুদ্ধে বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে পরাজিত হন (১৫৩৯ খ্রীঃ)। হুমায়ুন কোনরকমে প্রাণরক্ষা করতে সমর্থ হন এবং আগ্রায় ফিরে এসে নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু কনৌজের যুদ্ধে পুনরায় পরাজিত হয়ে (১৫40 খ্রীঃ) তাঁকে ভারতবর্ষ ছেড়ে পারস্যে পলায়ন করতে হয়। শের শাহ দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। শের শাহের মৃত্যুর দশ বছর পর তাঁর বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন (১৫৫৫)। হুমায়ুন শব্দের অর্থ 'ভাগ্যবান'। কিন্তু তাঁর অদৃষ্ট ছিল মন্দ। দেশে ফিরে এসে তিনি বেশী দিন রাজত্ব করতে পারেননি। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী দিল্লীতে লাইব্রেরী ঘরের সিঁড়ি থেকে অবতরণের সময় পড়ে গিয়ে আকস্মিকভাবে তাঁর জীবনাবসান হয়।

হুসেন শাহ

[শাসনকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান হলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁর সময় থেকে বাংলায় এক নতুন গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। হুসেন শাহ ছিলেন আরবের সম্ভ্রান্ত সৈয়দবংশীয় মুসলমান। তিনি প্রথমে রাজস্ব বিভাগের একজন সামান্য কর্মচারী ছিলেন। স্বীয়

যোগ্যতাবলে ধাপে ধাপে তিনি ক্ষমতার শৃঙ্গে আরোহণ করেন এবং একসময় বাংলার অরাজক পরিস্থিতির সুযোগে রাজসিংহাসন অধিকার করে নেন। হুসেন শাহ উড়িষ্যা, উত্তরবিহার, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে সফলভাবে সমরাভিযান পরিচালনা করেন। শুধুমাত্র আসাম অভিযানেই তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। তাঁর রাজ্যসীমা উত্তর-পশ্চিম অংশে বিহার থেকে দক্ষিণ-পূর্বে শ্রীহট্ট, উত্তর পূর্বে হাজো থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে মান্দারণ ও চব্বিশ-পরগণা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এইভাবে এক বিশাল অংশ জয় করে তিনি বাংলার সামরিক গৌরব বৃদ্ধি করেন।

হুসেন শাহ ছিলেন একজন প্রজাদরদী শাসক। তাঁর সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল এবং হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষ নির্বিবাদে জীবনধারণ করত। হুসেন শাহ ছিলেন একজন নির্ভীক, নিরপেক্ষ বিচারক। তিনি গুণীজনের সমাদর করতেন এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চরাজপদ প্রদান করতেন। তাঁর আমলে বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত ভ্রাতৃদ্বয় রূপ ও সনাতন গোস্বামী, গোপীনাথ বসু, মুকুন্দ দাস, কেশব ছত্রী, অনুপ প্রভৃতি হিন্দুগণ উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। এমনকি হুসেন শাহের সেনাপতি গৌর মল্লিক পর্যন্ত হিন্দু ছিলেন। হুসেন শাহ শিল্পকলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর আমলে মালাধর বসু, বিপ্রদাস পিপলাই বিজয়গুপ্ত, যশোরাজ খাঁ প্রভৃতির সৃষ্টিকর্মের ফলস্বরূপ বাংলাভাষা ও সাহিত্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। এই সময় বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও ধর্মপ্রচার হুসেনশাহের রাজত্বকালের আর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'হিস্ট্রী অব বেঙ্গল' এর দ্বিতীয় খণ্ডে এ বি এম হবিবুল্লা লিখেছেন যে হুসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলার সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ঘটেছিল। হুসেন শাহের দুর্ভাগ্য তাঁর শাসনকালের ইতিহাস রচনা করার জন্য কোনো আবুল ফজল ছিল না। হবিবুল্লা হুসেন শাহকে মোগল সম্রাট আকবরের সাথে তুলনা দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ) গ্রন্থে সুখময় মুখোপাধ্যায় হুসেন শাহের রাজত্বকালের নবমূল্যায়ণ করেছেন। তিনি তাঁর লেখায় বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে হুসেন শাহের রাজত্বকাল সম্পর্কে এতাদিনকার প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাঁর ভাষায়, "অনেকের ধারণা, হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের—বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু এই ধারণার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নাই। হোসেন শাহ সম্পর্কে আর একটি প্রচলিত মত এই যে, তিনি ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত উদার ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন। কিন্তু এই ধারণাও কোন বিশিষ্ট তথ্য দ্বারা

সমর্থিত নহে।" (রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ '—সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'হোসেন শাহী বংশ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

হুসেন শাহ ছাব্বিশ বছর রাজত্ব করার পর ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হেনরী প্রথম

[শাসনকাল ১১০০-১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বিতীয় উইলিয়ামের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই হেনরী ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেন। তিনি ইতিহাসে প্রথম হেনরী নামে পরিচিত। সিংহাসনে বসেই প্রথম হেনরী জনগণের অবস্থার উন্নতিকল্পে ও দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রথম হেনরীর খুব বিদ্যানুরাগ ছিল। পুস্তকপাঠে তিনি অবসর যাপন করতেন। স্যাক্সন রাজপরিবারের কন্যা ম্যাটিল্ডাকে তিনি বিবাহ করেন। ধর্মের ব্যাপারে প্রথম হেনরী পিতার পদাঙ্কই অনুসরণ করেন বলা চলে। ইংলণ্ডের ধর্মাধিষ্ঠানের উপর পোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক্ এটা তিনি কখনই চাননি।

হেনরী দৃঢ়চেতা ও দক্ষ শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে ইংলণ্ড ও নর্মাণ্ডি দুই দেশেই শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য হেনরী বহু পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করে পৃথক পৃথক কাউন্সিলের উপর সেগুলো দেখাশোনার ভার অর্পণ করেন। একজন নির্ভীক, নিরপেক্ষ বিচারক হিসাবে হেনরী বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। জনসাধারণ তাঁকে 'লায়ন অব্ জাস্টিস' বলে অভিহিত করত। ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম হেনরী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হেনরী দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১১৫৪-১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দ]

ইংলণ্ডের ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট রাজা। দ্বিতীয় হেনরী ১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং সুদীর্ঘ ৪৫ বছর রাজকার্য পরিচালনা করার পর তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। সিংহাসনে বসেই তিনি কঠোর হস্তে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করেন এবং বহু প্রয়োজনীয় শাসনসংস্কার তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রথমেই তিনি নতুন রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করে রাজকোষকে পূর্বাপেক্ষা অনেক সমৃদ্ধ করেন। মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কারও তিনি করেন। তাঁর পূর্ববর্তী রাজা স্টিফেনের দুর্বলতার সুযোগে অভিজাতরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। হেনরী তাদের ক্ষমতা হ্রাস করেন এবং কিছু কিছু বিদ্রোহী অভিজাত ও সামন্তপ্রভুকে দমন করেন। যুদ্ধবিগ্রহের সময় যাতে সামন্তপ্রভুদের উপর নির্ভরশীল থাকতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে হেনরী এক

সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তিনি 'কিংস কোর্ট' নামে এক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করে জুরির সাহায্য গ্রহণের সুবন্দোবস্ত করেন। এমনকি ভ্রাম্যমান বিচারকদলও তিনি নিয়োগ করেন। শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করলেও ধর্মাধিষ্ঠানের সংস্কার সংক্রান্ত ব্যাপারে হেনরী বিশেষ সফল হতে পারেননি।

হেনরী স্কটল্যান্ডের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং আয়ারল্যান্ডে সামরিক অভিযান করে সেখানকার উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। বাস্তবিকই দ্বিতীয় হেনরীর রাজত্বকাল ইংলন্ডের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় অধ্যায়।



হেনরী দ্বিতীয়

[শাসনকাল ১০০২-১০২৪ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে জার্মানীর একজন রাজা ছিলেন। ১০০২ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় অটোর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় হেনরী সিংহাসনে বসেন। তৃতীয় অটোর রাজত্বকাল জার্মানীর পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর সময় জার্মানী একটি দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। তৃতীয় অটোর মৃত্যুর পর যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল তার মধ্য থেকে ব্যাভারিয়ার ডিউক দ্বিতীয় হেনরী রাজসিংহাসন লাভ করেন। সম্পর্কে তিনি ছিলেন জার্মান রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হেনরী দি ফাউলারের নাতি। ফ্রাঙ্ক ও স্যাক্সনগণ দ্বিতীয় হেনরীর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিলেও ইতালী তা মানতে অস্বীকৃত হয়। পোপের সমর্থনপুষ্ট হয়ে হেনরী ইতালী অভিমুখে অভিযান করেন এবং সহজেই ইতালীর সিংহাসেন দখল করে বসেন। ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে পোপ বেনিডিক্ট সেন্ট পিটার্স গির্জায় হেনরীকে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইতালীর প্রভু বলে স্বীকৃতি জানান। দ্বিতীয় হেনরী আজীবন পোপের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। হেনরী পুনরায় ইতালী অভিযান করে অবাধ্য লম্বার্ড প্রধানদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি গির্জাসমূহের সংস্কারসাধনের কাজে ব্রতী হন। হেনরী ছিলেন পরিশ্রমী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি জার্মানীর উন্নয়নেই বিশেষ যত্নবান হন। তিনি বিশপদের কাছে তাঁর প্রতি আনুগত্য দাবি করেন এবং বিশপদের অবস্থার উন্নতিকল্পে বহু জমি দান করেন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ অবাধ্য শক্তিগুলোকে দমন এবং তৃতীয় অটোর আমলের এলাকাগুলো পুনরুদ্ধার করে তিনি সম্রাটের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

কিন্তু হেনরীর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না। তিনি ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

হেনরী তৃতীয়

[শাসনকাল ১২১৬-১২৭২ খ্রীষ্টাব্দ]

দ্বিতীয় হেনরীর মৃত্যু হলে তৃতীয় হেনরী ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় তিনি ছিলেন নয় বছরের বালক। ফলে তার হয়ে প্রথমে আর্ল অব্ পেমব্রোক ও পরে হিউবার্ট ডি বার্গ শাসনকার্য চালান। তৃতীয় হেনরী সাবালক হয়ে ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। তৃতীয় হেনরী ছিলেন ধর্মভীরু, মার্জিত রুচিসম্পন্ন, শিল্পকলায় অনুরাগী ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর দুর্বল চিত্ত ও অদূরদর্শিতার দরুণ তাঁর রাজত্বকালে দেশের পরিস্থিতি ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা যথাযথভাবে রক্ষা করতে হেনরী ব্যর্থ হন। বিদেশী ব্যক্তিদের প্রতি পক্ষপাত তাঁকে দেশের মানুষের চোখে অপ্রিয় করে তুলেছিল। তিনি পিটার ডি রোশে নামক এক ফরাসী অভিজাতকে মন্ত্রীত্বপদ অর্পণ করেন। তাঁর রাজপ্রাসাদে বহু বিদেশী ব্যক্তি এসে ভীড় করে এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়। ধর্মভীরু হেনরীর আমলে ইংলণ্ডে পোপের আধিপত্য ও প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং ইংলণ্ড একরকম পোপের অধীনস্থ রাজ্যে পরিণত হয়। এরপর গ্রুফিড নামে এক ব্যক্তি নিজেকে ওয়েলসের রাজা হিসাবে ঘোষণা করায় হেনরী তাকে দমন করতে গিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। ওয়েলস থেকে ফিরে তিনি স্বদেশে এক বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। দেশের যাজক সম্প্রদায়, অভিজাতগণ সকলেই তাঁর অযোগ্য শাসনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সুযোগ বুঝে তারা বিদ্রোহ করে। এই বিক্ষুব্ধকর পরিস্থিতি সামাল দেবার মত ক্ষমতা তৃতীয় হেনরীর ছিলনা। ১২৭২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু এসে তাঁকে এই অবস্থার হাত থেকে উদ্ধার করে।

হেনরী তৃতীয়

[শাসনকাল ১০৩৯-১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দ]

মধ্যযুগে জার্মানীর ইতিহাসে সম্রাট তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকাল নিঃসন্দেহে এক স্মরণীয় অধ্যায়। তাঁকে জার্মান সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। পিতা দ্বিতীয় কনরাডের মৃত্যুর পর বাইশ বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সতের বছর বীরবিক্রমে রাজত্ব করার পর মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর গৌরবময় শাসনকালের আকস্মিক অবসান ঘটে। সিংহাসনে আরোহণ করে হেনরী

একটি নতুন পর্বের সূচনা করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সামরিক শক্তির কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যখন তিনি ঝটিকা অভিযান চালিয়ে পোল্যাণ্ড, বোহেমিয়া ও হাঙ্গেরীকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। সিংহাসনে বসার অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই হেনরী জার্মানীর পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই তাঁর রাজশক্তিকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি জার্মানীর অভ্যন্তরে তাঁর দৃষ্টিকে নিয়োজিত করেন। প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় হেনরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহুধা বিভক্ত জার্মানী সুদীর্ঘকাল পরে এক ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে গড়ে ওঠে। তাঁর নেতৃত্বাধীনে জার্মানী ও ইতালীতে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন জন্মলাভ করে। জার্মান রাজতন্ত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মান রীতিমত বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিবেশী শ্লাভ রাষ্ট্রগুলোর উপর এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়। রোমে যাজকদের এক বিশেষ সভায় হেনরীকে পোপ মনোনয়নের চরম ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। অধ্যাপক ব্রাইসের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা চলে, তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালে মধ্যযুগীয় জার্মান সাম্রাজ্য শ্রেষ্ঠত্বের চরম শিখরে আরোহণ করে। এই সময় শুধুমাত্র রাজনৈতিক দিক দিয়ে নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক জাগরণ লক্ষ্য করা যায়।

হেনরী চতুর্থ

[শাসনকাল ১৩৯৯-১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ]

চতুর্থ হেনরী ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে বসেই তিনি নানা বিরোধী পক্ষের সম্মুখীন হন। নিজের স্বীয় শক্তিবৃদ্ধিতে মন দেন এবং একে একে বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে দমন করতে সমর্থ হন। এরপর তিনি অর্লিয়েন্স ও বার্গাণ্ডীর শাসকদ্বয়ের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে ফ্রান্স অভিযান করেন। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ফ্রান্সের অভ্যন্তরস্থ বর্দো নামক স্থান পর্যন্ত দখল করে নেয়। কিন্তু এই সময় আকস্মিকভাবে ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ হেনরী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হেনরী পঞ্চম

[শাসনকাল ১৪১৩-১৪২২ খ্রীষ্টাব্দ]

চতুর্থ হেনরীর মৃত্যুর পর ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম হেনরী ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট নয় বছর রাজত্ব করেছিলেন। ফরাসী সিংহাসনের উপর প্রথম থেকেই পঞ্চম হেনরীর নজর ছিল। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্স আক্রমণ করলেন। আজিনকোর্টের যুদ্ধে তিনি ফরাসী বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। এরপর

তিনি নর্মাণ্ডি নামক স্থানও জয় করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পঞ্চম হেনরী দীর্ঘজীবী ছিলেন না। ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে অপরিণত বয়সে তাঁর আকস্মিক জীবনাবসান ঘটায় এক সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের আশা ধূলিসাৎ হয়।

হেনরী ষষ্ঠ

[শাসনকাল ১৪২২-১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দ]

পঞ্চম হেনরীর মৃত্যুর পর ষষ্ঠ হেনরী ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা হন। এই সময় ফরাসীরাজের মৃত্যু হলে ফ্রান্সের সিংহাসন শূন্য হয়েছিল। ষষ্ঠ হেনরী ফ্রান্সের সিংহাসনেরও দাবিদার হন। তাঁর রাজত্বকালেই জোন অব্ আর্ক নাম্নী ফ্রান্সের এক গ্রাম্য কৃষককন্যা ফ্রান্সকে ইংরেজ অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ফরাসী জনগণের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেননি। ইংরেজরা তাঁকে বন্দী করে এবং ডাইনী অপবাদ দিয়ে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে। কিন্তু ষষ্ঠ হেনরীর দুর্বল রাজ্যশাসনে ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রতিকূল আকার ধারণ করায় ফ্রান্সের সিংহাসন হেনরীর হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ হেনরীর মৃত্যু হয়।

হেনরী সপ্তম

[শাসনকাল ১৪৮৫-১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দ]

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বছর বলে অভিহিত হয়ে থাকে। ঐ বছর রিচমণ্ডের আর্ল হেনরী টিউটর বসওয়ার্থের যুদ্ধে তৃতীয় রিচার্ডকে পরাজিত করে ইংলণ্ডে একটি নতুন রাজবংশের (টিউটর বংশ) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সপ্তম হেনরী নাম ধারণ করে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে ইংলণ্ড তার মধ্যযুগীয় বন্ধনদশা কাটিয়ে ক্রমশঃ আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। সপ্তম হেনরীর রাজত্বকালের বৈশিষ্ট্য হল এটা বহু পরিবর্তনের সূচনা করে। পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক কুপ্রথাগুলো বিদায় নিতে শুরু করে এবং বসওয়ার্থের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী গোলাপের যুদ্ধের অবসান ঘটে।

সপ্তম হেনরীর আমলেই সর্বপ্রথম পার্লামেণ্টে রাজার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই সময় ইংলণ্ডের ইতিহাসে বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে—এমনকি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা। অভিজাতদের ক্ষমতা ও প্রভাব কমার সাথে সাথে রাজানুকূল্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই শ্রেণী টিউডর শাসনের স্তম্ভস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় চিন্তা ও ভাবের জগতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন

দেখা দেয় যার ফলে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের স্থলে দর্শন, বিজ্ঞান, মননশীল সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। রেনেসাঁ থেকে আসে রিফর্মেশন এবং জনগণ চার্চের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়ে সাধারণ মানুষ আত্মসচেতন হয় এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এক নতুন যুগে ইংলণ্ড প্রবেশ করে। ইংলণ্ডের সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব দেখা যায়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারলাভ করে, সমুদ্রযাত্রার আকর্ষণ বাড়ে এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপনের বাসনা ইংলণ্ডবাসীর মনকে আন্দোলিত করে। এই সময়েই সপ্তম হেনরী 'মার্চেণ্ট নেভি' বা 'ব্যবসায়িক নৌবহর' এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকেই বস্ত্র ব্যবসায়ের অভূতপূর্ব বিকাশলাভ ঘটে। শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই নয়, কূটনীতি ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও হেনরী নিজ দেশের সম্মান অনেক বৃদ্ধি করেন। সপ্তম হেনরী মোট ২৪ বছর রাজত্ব করার পর ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।



হেনরী অষ্টম

[শাসনকাল ১৫০৯-১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দ]

টিউডর বংশীয় অষ্টম হেনরী মোট ৩৮ বছর রাজত্ব করেন। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর। অষ্টম হেনরীর রাজত্বকাল ছিল ঘটনাবহুল এবং এই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের ইতিহাসে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। অষ্টম হেনরী সুদর্শন ও আকর্ষণীয় ছিলেন। নানা গুণেরও তিনি অধিকারী ছিলেন এবং খেলাধুলা, অশ্বারোহণ, আমোদ-প্রমোদ ভালবাসতেন। অপরপক্ষে তিনি ছিলেন দাম্ভিক, লঘুচিত্ত ও খামখেয়ালী। কখনও কখনও বদমেজাজী ও নিষ্ঠুর বলে তাঁকে মনে হত।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অষ্টম হেনরীর লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্র ও চার্চ সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। হেনরীর শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী। তিনি পার্লামেণ্টকে অনেকাংশে বশীভূত করে রেখেছিলেন এবং স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টের মাধ্যমে বহু আইন জারি করেন। রাণী ক্যাথারিণের সাথে বিবাহ-

বিচ্ছেদের প্রশ্ন নিয়ে শেষ পর্যন্ত রোমের পোপের সাথে অষ্টম হেনরীর চূড়ান্ত বিরোধ ঘটে এবং এর ফলস্বরূপ ইংলণ্ডে পোপের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। অষ্টম হেনরীর আমলে ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা হয় এবং এর কার্যকাল সুদীর্ঘ সাত বছর ধরে চলে (১৫২৯-৩৬)। ইতিহাসে এটা 'রিফমেশন পার্লামেন্ট' নামে সুপরিচিত। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অষ্টম হেনরীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সপ্তবর্ষ যুদ্ধের পর ইউরোপীয় রাজনীতিতে ইংলণ্ড যাতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায় সেদিকে সচেষ্ট হওয়া। সিংহাসনে বসার পর থেকেই তিনি ইংলণ্ডের চিরাচরিত 'ফ্রান্স বিরোধী' নীতি অনুসরণ করে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। এছাড়া তিনি ইউরোপের রাজাদের সাথে যুগপৎ শত্রুতা ও মিত্রতার নীতি অনুসরণ করে ইউরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন। অষ্টম হেনরী বৈদেশিক নীতির পরিচালনায় মূলতঃ তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রী কার্ডিনাল উলসের পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন। অষ্টম হেনরীর বৈদেশিক নীতি আংশিক সফল হয়েছিল। তাঁর সময়ে ওয়েলস ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ অধীনে আসে। আয়ারল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে অষ্টম হেনরী পিতা সপ্তম হেনরী অপেক্ষা অনেক বেশি আগ্রহ দেখান যদিও তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ তিনি করতে পারেননি। তবে ফ্রান্স ও স্পেনের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি যে ফলপ্রসূ হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউরোপীয় রাজনীতিতে অষ্টম হেনরী যে ইংলণ্ডের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মানমর্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা অনস্বীকার্য।

হেনরী দি ফাউলার

[শাসনকাল ৯১৯-৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ]

ক্যারোলিঞ্জিয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে জার্মানীকে পুনরায় দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন হেনরী দি ফাউলার। জার্মানীতে তিনি একটি শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজা হন। হেনরী ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্, আত্মবিশ্বাসী ও বাস্তববাদী শাসক। তিনি ছিলেন স্যাক্সনির ডিউক। হেনরী তাঁর চারটি ডাচি ব্যাভারিয়া, স্যাক্সনি, ফ্রাঙ্কোনিয়া ও থুরিঙ্গিয়া নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি লোথারিঞ্জিয়াকেও তাঁর অধীনস্থ এলাকায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক অভিযান চালিয়ে সেখানকার ডিউক গিলবার্টকে তাঁর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন (৯২৫) এবং এই ডাচি এরপর থেকে জার্মান সাম্রাজ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়। এছাড়া তিনি মডেয়ারদের আক্রমণ থেকে জার্মানীকে রক্ষা করেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করার জন্য তিনি

জার্মান শহরগুলোকে সুরক্ষিত করে তোলেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটান। তিনি নতুন অশ্বারোহী বাহিনীও গঠন করেন। তিনি উত্তরে ডেন এবং পূর্বে স্লাভদের কাছ থেকে কিছু কিছু অঞ্চল কেড়ে নেন। ৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হেনরী দি ফাউলার পরলোকগমন করেন।

হেরাক্লিয়াস

[শাসনকাল ৬১০-৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ]

বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের একজন শক্তিমান রাজা। পূর্ববর্তী শাসক ফোকাসের মৃত্যুর পর ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে হেরাক্লিয়াস সিংহাসনে বসেন এবং ৩১ বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন। হেরাক্লিয়াস সাম্রাজ্যের এক সংকটময় মুহূর্তে রাজা হন। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয়ক্ষেত্রেই বাইজানটাইন সাম্রাজ্য এক চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গোঁড়া খ্রীষ্টানদের সাথে মনোফিসাইটদের ধর্মীয় সংঘর্ষ চরমে উঠেছিল। সৈন্যবাহিনী ছিল বিধ্বস্ত এবং কোষাগার ছিল শূন্য। বৈদেশিক ক্ষেত্রে স্লাভগণ বলকান এলাকায় ঘন ঘন অভিযান চালাচ্ছিল ও পারস্যরাজ দ্বিতীয় কোসরোস দরায়ুসের হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য হেরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। হেরাক্লিয়াস পারসীক আক্রমণ রুখতে ব্যর্থ হওয়ায় কোসরোস সিরিয়া ও জেরুজালেম জয় করে নেন। সালিমের নেতৃত্বে পারসীক বাহিনী বসফরাস পর্যন্ত পেঁাছে যায়। এদিকে অভর জাতি হেরাক্লিয়াসের সাম্রাজ্য আক্রমণ করে বসল। অপর একজন পারসীক সেনাপতি মিশর জয় করে কনস্টান্টিনোপলে খাদ্য ও রসদ সরবরাহের পথ রুদ্ধ করে দিল। অর্থের প্রচণ্ড প্রয়োজন হওয়ায় চার্চ এর কাছ থেকে হেরাক্লিয়াস এক বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ করলেন। এরপর তিনি বীরবিক্রমে অভিযান চালিয়ে কোসরোসকে পরাজিত করলেন। অভরদের সাথে পারসীক সম্রাট যুক্তভাবে কনস্টান্টিনোপল অভিযানের পরিকল্পনা করলে হেরাক্লিয়াস অভরদের পরাজিত করে পারসীকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তিনি পারসীকদের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান চালিয়ে পারসীক সেনাপতিকে পরাজিত ও নিহত করেন। কিছুদিনের মধ্যে পারস্য সম্রাট কোসরোসের মৃত্যু হওয়ায় হেরাক্লিয়াস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। তিনি এক সুদক্ষ সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং একটি দক্ষ ও হিতকারী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। জীবনের শেষদিকে আরব আক্রমণ তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত নানা সমস্যার চাপে পড়ে ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে হেরাক্লিয়াস ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।



হেস্টিংস

[শাসনকাল ১৭৭২-১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ]

ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে চল্লিশ বছর বয়সে বাংলার গভর্ণর হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। দুবছর পর ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৩ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কোম্পানীর রীতিমত সংকটকালে হেস্টিংস এদেশে আসেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভের অপশাসন ও কোম্পানীর কর্মচারীদের উদ্দাম, দুর্নীতিগ্রস্ত জীবনযাপনে বিভিন্ন সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। কোম্পানীর কোষাগার শূন্য হয়ে পড়েছিল এবং সমগ্র দেশে একরকম অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। মহীশূর ও মারাঠা শক্তি এদেশে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে ইংরেজদের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হেস্টিংস প্রথমেই কোম্পানীর শাসনকার্যে নিয়ম-শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন এবং সর্বনাশা দ্বৈত শাসনব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করেন। তিনি দস্তকের অপব্যবহার বন্ধ করে দেন, রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব কোম্পানীর হাতে আনেন এবং রাজস্ব সংগ্রাহক রেজা খান ও সীতাব রায়কে পদচ্যুত করেন। তিনি সরকারী কোষাগারকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় সরিয়ে নিয়ে আসেন এবং রাজস্ব সংগ্রহার্থে এক 'ভ্রাম্যমান সমিতি' গঠন করেন। তিনি কলকাতায় একটি টাঁকশালও স্থাপন করেন (১৭৭৭)। হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে জমিদারদের সাথে প্রথমে পাঁচশালা ও পরে একশালা বন্দোবস্ত করেন। ইংরাজ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় তিনি নিষিদ্ধ করে দেন। তিনি প্রতি জেলায় 'কালেক্টর' বা রাজস্ব সংগ্রাহকও নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে হেস্টিংস ভ্রাম্যমান সমিতি উঠিয়ে দিয়ে রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। হেস্টিংস বাণিজ্য ও বিচার বিভাগেরও উন্নতি ঘটান। তিনি শুল্ক আদায়ের জন্য দেশের নানা স্থানে কয়েকটি 'চৌকী' স্থাপন করেন এবং দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে সব ব্যবসায়ীর দ্রব্যের উপর শতকরা আড়াই ভাগ শুল্ক ধার্য করেন। তিনি কোম্পানীর বাণিজ্যিক উন্নতিবিধানের জন্য স্যার জর্জ বোগলকে তিব্বতে প্রেরণ করেন। শাসনকার্যের সুবিধার্থে হেস্টিংস বাংলাকে ৩৫টি

জেলায় বিভক্ত করে প্রতি জেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তিনি নানা ব্যবস্থা নেন এবং কোম্পানীর শাসনব্যবস্থাকে একটি সুসংবদ্ধ রূপ দিতে চেষ্টা করেন। হেস্টিংসের আমলে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট'বা 'নিয়ামক বিধি'র প্রবর্তন করেন। লর্ড নর্থের আইনকে সংশোধিত করে কয়েক বছর পর ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার আইন প্রণীত হয় এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট ভারত শাসনের জন্য 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' প্রবর্তন করেন।

হেস্টিংসের আমলে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে সলবই-এর সন্ধির মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই সময় হায়দর আলির নেতৃত্বে মহীশূর রাজ্যটি রীতিমত শক্তিশালী হয়ে উঠে ইংরেজ কোম্পানীর আতঙ্কের কারণ হয়। হেস্টিংস শাসক হিসাবে নিযুক্ত হবার পূর্বেই ইংরেজদের সাথে হায়দরের এক সংঘর্ষ ঘটে গিয়েছিল। হেস্টিংসের আমলে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ শুরু হয়। হায়দর আলির মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র টিপু বীরবিক্রমে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধির মাধ্যমে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটে।

হেস্টিংসের তের বছরের শাসনকাল অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। ফলে কোম্পানীর অর্থসংকট দেখা দেয়। এই সংকটজনক পরিস্থিতি সামাল দেবার উদ্দেশ্যে হেস্টিংস এমন কতকগুলো নৈতিকতাবর্জিত হীন কাজ করেন যার জন্য তাঁকে বহু নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হেস্টিংসের বিরোধীপক্ষ ইংলণ্ডে তাঁর আচরণের জন্য তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করে। বিখ্যাত বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক, শেরিডন প্রভৃতি হেস্টিংসের কার্যাবলীর নিন্দা করে জ্বালামুখী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। সাত বছর ধরে এক ঐতিহাসিক বিচারপর্ব অনুষ্ঠিত হবার পর হেস্টিংস কোনোক্রমে অভিযোগগুলো থেকে অব্যাহতি পান। রোহিলা যুদ্ধ, মহারাজা নন্দকুমারকে ফাঁসিদান, বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহের রাজ্য দখল, অযোধ্যার বেগমদের ধনসম্পদ বলপূর্বক অধিকার প্রভৃতি কাজের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে 'দশ দফা' অভিযোগ আনা হয়েছিল।

হেস্টিংসের শাসনপর্বের সূচনা থেকেই তাঁর সাথে তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের নানা বিষয় নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়। কাউন্সিলের চারজন সদস্যের মধ্যে তিনজন সদস্যই (ক্লেভারিং, মনসন এবং ফ্রান্সিস) তাঁর ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র বারওয়েল ছিলেন হেস্টিংসের সমর্থক। হেস্টিংস জালিয়াতির অভিযোগে মহারাজা নন্দকুমারের বিচারের ব্যবস্থা করেন এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হেস্টিংসের স্কুলজীবনের বন্ধু এলিজা ইম্পের সহায়তায় তাঁকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেন। হেস্টিংস অন্যায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বহু রোহিলাকে হত্যা করেন এবং রোহিলখণ্ড জয় করে নেন।

হেস্টিংসের চরিত্রে নানা দোষত্রুটি ছিল এবং সম্পূর্ণ নীতিবিবর্জিত চিত্তে তিনি যে বহু ঘৃণ্য কাজ করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা চলে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শাসক এবং সেই পরিস্থিতিতে কোম্পানীর শাসনভার গ্রহণ করে এদেশে নবপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর শাসনকে তিনি নিশ্চিত ভরাডুবির হাত থেকে উদ্ধার করেন। ভারতবর্ষে কোম্পানীর শাসনের ভিত্তিপ্রস্তর তিনিই স্থাপন করেন যার উপর পরবর্তীকালে কর্ণওয়ালিশ, ওয়েলেসলি, ডালহৌসী প্রভৃতি গভর্ণর জেনারেল কোম্পানীর সাম্রাজ্যবিস্তার ঘটান। নানা গুণের অধিকারী হেস্টিংস প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি নিজে ফার্সী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন। তিনি হিন্দু আইনশাস্ত্র সংস্কৃত থেকে ফার্সীতে অনুবাদ করান এবং হলহেড তা আবার ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। কোলব্রুক, উইলকিন্স ও উইলিয়াম জোন্স প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণ হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তাঁরই উৎসাহে উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৪ সনে কলকাতায় প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলন ও গবেষণার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। চার্লস উইলকিন্সকে দিয়ে 'গীতা'র ইংরাজী অনুবাদও তিনি করান। ইসলামিক বিদ্যার অনুশীলনের জন্য হেস্টিংস 'কলকাতা মাদ্রাসা' স্থাপন করেছিলেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে রেনেলের 'বেঙ্গল এ্যাটলাস' প্রকাশিত হয়। হেস্টিংস শিল্পকলার প্রতিও যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন এবং দেশের প্রাচীন শিল্পকর্মগুলির সংরক্ষণে বিশেষ আগ্রহ দেখান।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৮৬ বছর বয়সে হেস্টিংস পরলোকগমন করেন।

হেস্টিংস

[শাসনকাল ১৮১৩-১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রিটিশ ভারতের একজন গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। লর্ড হেস্টিংস লর্ড মিন্টোর পর ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গভর্ণর-জেনরেল পদে অধিষ্ঠিত হন এবং দশ বছর এই পদে আসীন থাকেন। প্রথম জীবনে লর্ড হেস্টিংস আর্ল অব ময়রা নামে পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তী কালে তিনি মার্কুইস অব্ হেস্টিংস উপাধিতে ভূষিত হন। ভারতবর্ষের শাসক হিসাবে তিনি যখন এদেশে আসেন তখন তাঁর বয়স প্রায় ষাট বছর। হেস্টিংস ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের মানুষ এবং একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তাঁর কর্মদক্ষতা ছিল বিস্ময়কর এবং তিনি দৃঢ়চেতা ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। ভারতে কার্যভার গ্রহণ করার পূর্বে তিনি আমেরিকা ও ইউরোপে সেনাধ্যক্ষ হিসাবে বহু যুদ্ধ পরিচালনা করেন। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধেও তিনি ইংরেজপক্ষের সেনানায়ক

হিসাবে কাজ করেছিলেন। নেপাল যুদ্ধ পরিচালনা, পিণ্ডারী দস্যু ও সমুদ্রোপকূলে জলদস্যু দমন, পেশোয়া পদের বিলোপসাধন, মারাঠা শক্তি ও দিল্লীর বাদশাহের ক্ষমতা হ্রাস, সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপন প্রভৃতি হ'ল তাঁর শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি নেপাল জয় করে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল সরকারকে সগৌলির সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করেন। এই কৃতিত্বের জন্য ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে 'মার্কুইস অব্ হেস্টিংস' খেতাব দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস এক বিশাল সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে পিণ্ডারী দস্যু দমন করে ভারতীয় জনগণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করেন। তিনি মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হন (তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, ১৮১৮) এবং যুদ্ধে জয়ী হয়ে মারাঠা শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেন। এর ফলে একদিকে যেমন ইংরেজদের অন্যতম প্রধান বাধা অপসারিত হয়, তেমনি আবার ইংরেজদের রাজ্যসীমা আরও বিস্তারলাভ করে। হেস্টিংস কচ্ছ প্রদেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে ঐ অঞ্চলের উপর ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দিল্লীর মোগল বাদশাহকে বাৎসরিক নজরানা প্রদান প্রথা বন্ধ করে দেন। এইভাবে লর্ড হেস্টিংস তাঁর দশ বছরব্যাপী শাসনকালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির ক্ষমতা, প্রভাব ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর অবসর গ্রহণের সময় ভারতে ইংরেজের প্রবল প্রতিপক্ষ আর কোনো দেশীয় শক্তি ছিল না। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিংসের শাসনকালের মেয়াদ শেষ হয়।

যে সব বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে

১। প্রাচীন সভ্যতার ইতিবৃত্ত—কল্যাণ চৌধুরী
২। আধুনিক যুগের পৃথিবী—প্রতুলগুপ্ত ও অমলেন্দু দে
৩। সভ্যতার ইতিহাস—অশোককুমার সরকার
৪। মধ্যযুগের সভ্যতা—কৌশাম্বীনাথ মল্লিক
৫। ভারতের ইতিহাস—গোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী
৬। প্রাচীন রাজমালা—রামপ্রাণ গুপ্ত
৭। ইংলণ্ডের ইতিহাস—কিরণ চৌধুরী
৮। ভারতজনের ইতিহাস—বিনয় ঘোষ
৯। ভারতকোষ
১০। স্বদেশকথা ও পৃথিবীর ইতিহাস—কিরণচন্দ্র চৌধরী
১১। ইউরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস পরিক্রমা—প্রভাতাংশু মাইতি
১২। সভ্যতার ধারা—ধূর্যটিপ্রসাদ দে
১৩। ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়—মাখনলাল রায়চৌধুরী
১৪। আধুনিক বিশ্ব ইতিহাস—শান্তিময় রায়
১৫। আধুনিক বিশ্বকোষ—ভট্টাচার্য ও আইচ সম্পাদিত
১৬। আধুনিক বিশ্বের ইতিবৃত্ত—কল্যাণ চৌধুরী
১৭। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস—সুনীল চট্টোপাধ্যায়
১৮। ভারতের ইতিহাস—প্রভাতাংশু মাইতি
১৯। প্রগ্রেসিভ বুক অব নলেজ—প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোঃ প্রকাশিত
২০। বাংলাদেশের ইতিহাস—রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত

1. A History of India—Romila Thapar
2. History of India—D. N. Kundra
3. Studies in Ancient India—P. Maiti
4. An Advanced History of India—Majumdar, Roychaudhuri & Datta
5. A Short History of Muslim Rule in India—Iswariprasad.
6. The History of Bengal—Edited by J. N. Sarkar.
7. The Middle Ages—K. C. Choudhuri
8. A Study of European History—L. Mookherjee
9. Lands and Peoples—Sailendra Banerji and Sukumar Sen
10. A Short History of the world—H. G. Wells
11. A Study of Greek History—Prof. L. Mookherjee
12. The House of History—Desiree Edwards-Rees, 2 Vols.
13. Studies in Modern Indian History—B. L. Grover and R. R. Sethi

14. A History of Modern Times—D. M. Ketelbey
15. Collier's Encyclopaedia
16. Chambers's Encylopedia
17. Encyclopaedia Britannica
18. A History of Greece—J. B. Bury
19. An Introduction to Medieval Europe—Thomson and Johnson
20. A History of the Far East—Clyde & Beers
21. General Knowledge Digest—K. Mohan & M. Aggarwal
22. A History of Europe—P. Maiti
23. Pears' Cyclopaedia
24. Essentials of History of Bengal—Prof. S. Ghose
25. An Oriental Biographical Dictionary—T. W. Beale & H. G. Keene
26. The Ground work of British History—G. T. Warner & C. H. K. Marten
27. England under the Tudors—G. R. Elton
28 England in the Seventeenth Century—Maurice Ashley
29. Akbar—J. M. Shelat
30. Napoleon—Emil Ludwig
31. Religion, the Reformation & Social Change—H. R. Trevor-Roper
32. The Mughal Empire—A. L. Srivastav
33. The Encyclopedia Americanna—International Edition
34. The New Caxton Encyclopedia—New Revised Edition
35. New Century Cyclopedia of Names—Edited by C. L. Barnhart
36. The University Desk Encyclopedia.
37. The New Columbia Encyclopedia—Edited by W. H-Harris & J. S. Levey
38. Illustrated world Encyclopedia
39. A Treasury of the world's Great Letters (From Ancient Days to our own Time)
40. Cowles Volume Library
41. Ashoka—Romila Thapar
42. 1980 Britannica Book of the year
43. The New world Encyclopedia, vol 2
44. The Khaljis—K. S. Lal
45. Europe Since Napoleon—David Thomson

শব্দসূচি

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন	যা আছে	যা হবে
৫	৩	হর্যঙ্ক	হর্যঙ্ক
৮	১৬	আর কোনো রাজা	আর কোনো ভারতীয় রাজা
২৩	৫	টাইর‍্যান্ট বা স্বৈরাচারী	টাইর‍্যান্ট বা স্বৈরাচারী
৬	২৬	ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে	বিভারিজের মতে
৬৬		এথেলস্টোন	এথেলস্টোন
		শাসনকাল ২৫-৯৪০ খ্রীঃ	শাসনকাল ৯২৫-৯৪০ খ্রী:
৭০	১৮	প্রতিঃধর্ম	প্রতিধর্ম
৮০	৩	কণিষ্কের মধ্যস্থতায়	কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায়
৮১	১২	বিস কদফিস	বিম কদফিস
৯৮	৯	উৎকলে	ভৎকলে
১১৯	২৪	স্যাঙ্গে্রাকোর্টার্স	স্যাঙ্গে াকোট্রাস
১৪০	১৯	হিন্দী	হিন্দু
১৪২	১২	অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সূত্রে	অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে
১৫০	১৮	ওসার উইকের	ওয়ার উইকের
১৬১	১৫	বৃত্ত	বৃত্তি
১৭৯	২৩	নাসিরউদ্দিন মামুয	নাসিরউদ্দিন মামুদ
১৮২	১	দমি আটকানো	দম আটকানো
২০২	১৬	উঁটুদরের	উঁচুদরের
২০৮	৮	মন্ত্রীত্বের	মন্ত্রীদের
২৮৫	২০	দ্রুরদানম	রুদ্রদামন
২৮৮	৭	ফাজকর্মের	কাজকর্মের
২৯৫	৮	১১৩২	১৯৩২
৩০২	১৫	তোলার করে	করে তোলার
৩৩৯	১৯	কমিকণ	কমিকর্ণ
৩৪১	১৭	মৃত্যুর মাত্র	মৃত্যুর পর মাত্র
৩৪৫	১২	একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা	একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা
৩৪৮	১	দিরহাস	দিরহাম
৩৫৯	২	হেনরী টিউটর	হেনরী টিউডর
৩৫৯	৩	টিউটর বংশ	টিউডর বংশ